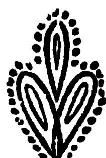
স্বর্গ যদি কোথাও থাকে

রূপদর্শী



প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১, কর্নওআলিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

উৎসর্গ

তুলু-কে

গোড়ার কথা

কোথায় দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, কোথায় দক্ষিণ সাগরের পলিনেসিয়া আর কোথায় দক্ষিণ কলকাতার হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট ?

এ তিনে ব্যবধান দুস্তর। তবুও একদিন এদের এক আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে গেল তাই, সেই সন্ধিকালে আবার অ .মিও হাজির ছিলাম তাই, এ কাহিনী লেখা হল। নচেৎ হত না।

হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ি। তাঁর ওখানে প্রায়ই মনোরম এক আড্ডা বসত তখন। বছর তিন-চার আগের কথা বলছি। সে আড্ডার গেট-পাস যুগিয়েছিলেন আমার 'সেজদা' (সন্তোষকুমার ঘোষ।)

এমনি এক আড্ডায় হঠাৎ প্রেমেন-দা বললেন, "কনটিকি ছবিটা দেখেছ। অদ্ভুত। এ যুগে এত বড অ্যাড্‌ভেঞ্চার আর হয় নি। আমি এটাকে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চাইতেও বড় কাজ বলে মনে করি।"

ছবিটি তাই দেখলাম। ছয় জন দুঃসাহসী পেরু থেকে কাঠের ভেলায় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পলিনেসিয়ার রারোইয়া দ্বীপে পৌচেছিলেন। এটা তারই এক ডকুমেণ্টারী ফিল্‌ম্‌।

"কন্‌টিকি" তাঁদের সেই কাঠের ভেলাটি। পলিনেসিয়ার দুরন্ত এক আদি পুরুষের নামেই।

ছবিটিতে যতটা না, তার চেয়ে বেশী আকৃষ্ট হলাম টিপ্পনীকারের বিবরণীতে। সত্যিই এ দুঃসাহসিকতাব তুলনা নেই। অবিস্মরণীয়। এই অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক তরুণ বৈজ্ঞানিক থব হেয়ারডাল আর তাঁর পাঁচ জন সঙ্গী শুধু একটা তত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্য যে রোমাঞ্চকর ঝুঁকি নিয়েছিলেন, ইতিহাসে বীরত্বের এ-রকম উদাহরণ ক্বচিৎ মেলে।

সিনেমার কমেণ্টারীতে মন ভরল না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভেলার মত অবিকল একটা ভেলায় চড়ে যাঁরা ৪৩০০ মাইল উন্মুক্ত সমুদ্রে একনাগাড়ে ১০১ দিন ভেসে রারোইয়া পৌছাতে পারেন, তাঁরা কী, তাঁরা কে, তা জানবার আগ্রহ বেড়ে গেল আমার। তাঁদের লেখা বইগুলো, যা পেলাম, পড়ে ফেললাম।

আর সেই সূত্রেই পলিনেসিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল। আমি রারোই-য়ার প্রেমে পড়লাম। সুন্দরী রারোইয়া, স্বর্গীয় রারোইয়া আমাকে গ্রাস করল।

পলিনেসিয়াকে জানবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। নানা লোকের লেখা নানা বিবরণ পড়লাম।

পাঠলব্ধ সেই অভিজ্ঞতা সম্বল করে এই কাহিনী লিখেছি।

"স্বর্গ যদি কোথাও থাকে" তবে, আমার বিশ্বাস, তা আছে লেগুনবেষ্টিত মোহিনী পলিনেসিয়ার নারিকেল-বীথি-শোভিত এই দ্বীপগুলিতে।

আছে রারোইয়াতে।

সেখানে দিগন্তবিহীন মহাসাগরে সূর্য ওঠে, ডোবে। বিস্তীর্ণ বালুচরে নিবিড় শান্তি ঘনিয়ে থাকে। বাণিজ্য-বায়ু পরম স্নেহে নারিকেল পাতায় হাত বুলিয়ে যায়। পলিনেসিয়ার অপ্সরী মেয়েরা অফুরন্ত যৌবন-সম্ভার অকৃপণ বিলিয়ে দেয়। দায়হীন, দায়িত্বহীন জীবন মুক্তির উল্লাসে আনন্দের গানে মুখর হয়ে ওঠে। ....

জানিনে, সে মুক্তি এখনও অমনি অবাধ আছে কি না।

ইওরোপীয় সভ্যতার কলুষ স্পর্শে পলিনেসিয়া ধর্ষিত হয়েছে। লালসাগ্রস্ত আগন্তুক নাবিক আর 'সভ্য' শাসকেরা অমৃত লুঠ করে বিনিময়ে যা দিয়েছে তা সুতীব্র গরল।

বিখ্যাত শিল্পী পল গোগ্যাঁ খুব খেদের সঙ্গেই বলে গেছেন, "ওরা আমাদের দিয়েছিল অনাবিল প্রেম আর বিনিময়ে আমরা ওদের দিয়েছি সিফিলিস।"

সন্দেহ নেই, এ এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি।

সেই ট্র্যাজেডির নায়িকা রারোইয়ার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

'কন্‌টিকি' অভিযানের নায়ক থর হেয়ারডাল আর তাঁর দুজন সঙ্গী—বেঙ্গ্‌ট্‌ ড্যানিয়েলসন আর এরিক হেসেলবার্গের রচনাবলী থেকেই মূল তথ্য সংগ্রহ করেছি। শুধু তথ্যই।

দু বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আলোচনীতে এই রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল এবং কবি শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে সেজন্য কৃতজ্ঞ। অঙ্কিত স্কেচগুলোর জন্য শিল্পীবন্ধু অহিভূষণ মল্লিকের কাছেও। বইতে কিছু নতুন সংযোজনও আছে।

বরাহনগর

শ্রাবণ, ১৩৬৪ — রূপদর্শী

স্বর্গ যদি কোথাও থাকে

মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই, সেকথা যে যাই পাসরি।

—রবীন্দ্রনাথ

এই লেখকের অন্যান্য বই

এই কলকাতায়

নক্‌শা

সার্কাস

কথায় কথায়

নাচের পুতুল

সোজা সরল সহজ পথে চলার যে চাবিকাঠিটি পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ আজ হারিয়ে ফেলেছে, কেমন করে না-জানি সেই চাবি এদের হাতে এখনও রয়ে গেছে। এদের আচার, এদের ব্যবহার, এদের জীবন-যাত্রার প্রণালী, অতি তুচ্ছ বিষয় থেকে অতি গভীর বিষয়টির প্রতি এদের মনোভাব, এই সবকিছুই ড্যানিয়েলসনকে অবাক করেছে। ভালও লেগেছে তার।

ড্যানিয়েলসনের মনে পড়ে একটা ঘটনার কথা। একদিক থেকে দেখতে গেলে অতি তুচ্ছ (হ্যাঁ তুচ্ছ বই কি) এক ঘটনা। রারোইয়াবাসীদের ফুটবল খেলার ঘটনাটা।

একদিন দুপুরে, রোদ যখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে, তাপমান যন্ত্রের পারা উঠেছে ৯৫ ডিগ্রীতে, গরমে প্রাণ আইঢাই, সেই সময় হঠাৎ মানাও এসে ড্যানিয়েলসনকে ডাক দিল। এক্ষুনি ফুটবল ম্যাচ শুরু হবে, দেখতে চাও তো এস। মানাও-এর আগ্রহ দেখে ড্যানিয়েলসনকে রাজী হতেই হল।

মাঠে গিয়ে ড্যানিয়েলসন তো অবাক। এ কী রকম খেলা! দুপক্ষের খেলোয়াড় এসে গেছে। কিন্তু খেলার মাঠ কোনটা? খেলাটা হবে কোথায়?

কেন? একজন বুঝিয়ে দিল, এই তো মাঠ, তোমার সামনেই। যতদূর তোমার নজরে পড়ছে, সেই সবটাই আমাদের মাঠ। এখানেই আমাদের খেলা হবে।

জবাব শুনে ড্যানিয়েলসন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। আর দ্বিরুক্তি না করে, বেশ ভাল ছায়া-অলা একটা নারকেল গাছ বেছে নিয়ে তিনি তার নীচে বসে পড়লেন। খেলা শুরু হল। মাঠ ভরতি নারকেল গাছ। দু-পক্ষের লোকেরা তার মধ্য দিয়েই বল নিয়ে এঁকে-বেঁকে দৌড়চ্ছে। কেউ আবার পাশ কাটাতে না পেরে সোজা গাছে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে। এতক্ষণে ড্যানিয়েলসন বুঝলেন শুধু মানুষেরই নয়, এখানকার ফুটবল খেলায় এই যে সব নারকেল

গাছ, এদেরও একটা প্রধান ভূমিকা আছে। তিনি দেখলেন, বিপক্ষদলের ফরোয়ার্ডদের আক্রমণ মানুষের চাইতে এই গাছ-গুলোই প্রতিহত করছে ভালভাবে। আর একটা জিনিস ড্যানিয়েলসন লক্ষ্য করলেন। গোলপোস্টের কোনো বালাই নেই। গোলকীপার ছুটতে ছুটতে যেখানে দুটো নারকেল গাছের ফাঁকে দাঁড়িয়ে পড়ছে, তখনকার মত সেই দুটোই হচ্ছে গোলপোস্ট। গোলপোস্ট বারে বারে বিভিন্ন জায়গায় বদলে যাওয়ায় সহজে গোল হওয়া মুশকিল। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ তো এর কাছে জলভাত। রেফারীগিরি করবার নিয়মটাও এখানে অভিনব। রেফারী একটা ছায়াচ্ছন্ন গাছতলায় বসে থাকেন। একটা কাঠের টুলে। বসে বসে সেখান থেকেই এন্তার নিজের মনে হুইশিল ফুঁকে চলেছেন। ওদিকে খেলার মনে খেলা চলেছে। খেলতে খেলতে যেই এক পক্ষের মনে হল তারা গোল দিয়েছে, অমনি তারা গোল গোল বলে চেঁচিয়ে উঠল। আর রেফারীও সঙ্গে সঙ্গে হুইশিল ফুঁকে দিচ্ছেন। আবার অন্যপক্ষের যেই মনে হল তারাও গোল দিয়েছে, অমনি তারা চেঁচিয়ে উঠছে গোল। সঙ্গে সঙ্গে রেফারীও সেটা জানিয়ে দিচ্ছেন। গোল শোধ। ১-১। দিব্যি খেলা চলছে। এই অভিনব খেলা দেখতে দেখতে ড্যানিয়েলসন জমে গেলেন। মানাও-এর দল প্রতিপক্ষকে আর একখানা গোল দিতেই খেলা আরও ঘণ্টাখানেক চলল। ড্যানিয়েলসন হিসেব করে দেখলেন, চারঘণ্টা ইতিমধ্যেই কাবার হয়ে গিয়েছে। তবু খেলা শেষ হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মানাও-এর দলই ভাল খেলছিল, ২-১ গোলে ওরা এগিয়ে ছিল। হঠাৎ প্রতিপক্ষ গোলখানা শোধ করে দিতেই হৈ-হৈ করে খেলা ভেঙে গেল। সবাই খুব খুশী।

ড্যানিয়েলসন জিজ্ঞাসা করলেন, এতক্ষণ খেলা চলে তোমাদের ?

রেফারী বললে, আগের বারে অনেক আগেই খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার ওরা গোল শোধ দিতে দেরি করল কিনা, তাই সময় একটু বেশী লাগল।

জবাব শুনে ড্যানিয়েলসনের চোখ কপালে ওঠে আর কি।

ড্র তো হঠাৎ হল। মানাও-এরই তো জেতা উচিত ছিল।

হয়ত ছিল, রেফারী সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিলেন, কিন্তু এখানে সব খেলা ড্র করে শেষ করতে হয়। সেইটেই এখানকার নিয়ম। যতক্ষণ না ড্র হচ্ছে, ততক্ষণ আমি খেলা চালিয়ে যাব, যেই ড্র একটা হল, ২-২, কি ৩-৩, কি ৪-৪ একটা যাহোক কিছু হয়ে গেল, আর আমিও অমনি খেলা ভেঙে দিই।

কিন্তু মানাও যদি ৩ গোল দিত আর ওরা যদি শোধ দিতে না পারত তখন?

রেফারী একগাল হেসে বলল, রাইরোইয়াতে সেটি হওয়ার জো নেই। এখানে সব খেলাই 'ড্র' হয়। ওরা যদি গোল শোধ দিতে না পারত তাহলে তো মানাও-এর খেলোয়াড়েরাই এই টিমে যোগ দিয়ে সে গোল শোধ করত। খেলায় 'ড্র' হলে কারো মনেই দুঃখ লাগে না। হাজার হোক সবাই বন্ধু তো বটে।

ড্যানিয়েলসনের চকিতে মনে পড়ল সভ্য জগতের কথা। মানস চক্ষে দেখতে পেলেন তিনি ভ্রূকুটিকুটিল ক্ষমতাদর্পী পলিটিশিয়ানদের কুৎসিত মুখগুলো। অসম্ভব এক ইচ্ছা তাঁর মনে জাগল, কোনও ক্রমে কি ওই জটিল মস্তিষ্কগুলোর মধ্যে রারোইয়ার এই খেলোয়াড়ী নীতি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না?

২

আগামীকাল? সে তো রোজ আছে, সে তো নিরবধিকাল ধরে আছে। প্রত্যহই আছে। আগামীকালের পরে আরও আগামীকাল আসছে। আসছেই! তবে এত তাড়া কেন?

আগামীকালের জন্য সঞ্চয় করতে গিয়ে আজকের জীবনকে কেন বঞ্চনা করা?

পলিনেশীয়রা, বিশেষ করে রারোইয়াবাসীরা জানে প্রতিটি মুহূর্ত জড় করে করে জীবনের এক একটা দিন গড়ে তুলতে হয়। মুহূর্তের সুখ আর মুহূর্তের দুঃখ, মুহূর্তের হাসিকান্না দিয়ে জীবন আচ্ছন্ন। কাজেই জীবনের কোনো মুহূর্তই মূল্যহীন নয়। তাই রারোইয়াবাসীরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এত মূল্য দেয়। প্রতিটি মুহূর্তকে ওরা উপভোগ করে। প্রতি মুহূর্তে বাঁচে।

কাজ? আরে কাজ তো আছেই। যেখানে জীবন, সেখানেই কাজ। জীবনকে রাখবার জন্য, চাখবার জন্যই না কাজ? তবে? কাজকে বশে রাখ। জীবন যদি সওয়ার, কাজ তবে তার তেজী ঘোড়া। তাকে লাগামে লাগামে রাখ। হুঁসিয়ার ভাই সব, কাজের ভূত ঘাড়ে চেপে জীবনকে না পঙ্গু করে ফেলে।

সভ্য জগতের মানুষ কাজের কাছে হার মেনেছে। তাদের হাতের লাগাম ছুটে গেছে। এখন শুধু প্রাণপণে ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে কোনোক্রমে তার পিঠে ঝুলে আছে। যেদিকে ঘোড়ার গতি, সওয়ারও সেইদিকে। আর তাতেও কি প্রাণান্ত! কি আতঙ্ক! সর্বদা আশঙ্কা, এই বুঝি সে ছিটকে পড়ে। ভোঁপা বাজল ফ্যাক্টরির। ভোঁ ভোঁ। সেই তিমিরাচ্ছন্ন ভোরে ঘড়ির কাঁটা পা ছুঁড়ল খট খট। ধাক্কা মেরে ঘুম ভাঙাল, ওঠো, ওঠো। চোখ রাঙাল, সময় যায়, ছোটো, ছোটো। চোখ মুছতে মুছতে মানুষ ছুটল কারখানায়। বেলা বাড়ল। ঘড়ি আবার ধমক দিলে। খট্ খট্। ওঠ ওঠ! ছোট্ ছোট্। আবার শুরু হল ঊর্ধ্বশ্বাস, রুদ্ধশ্বাস ছোটাছুটি। ঘড়িতাড়িত সভ্যতায় কারও নিস্তার নেই। এই ছোটার হাত থেকে, এই কাজের হাত থেকে।

তাই বলি, এস এই রারোইয়া দ্বীপে। লেগুনবেষ্টিত নারকেল পাতাঝিরি শান্ত এই দ্বীপটিতে।

গ্যাখ এই আদিমদের। এদের ঘাড়ে কাজ চাপে নি। এরাই কাজের ঘাড়ে চেপেছে। জীবনকে কেমন সুন্দর ছোটাচ্ছে দেখ।

সময়শাসিত ইওরোপের লোক এই ড্যানিয়েলসন। প্রথম-প্রথম বড় অবাক লেগেছিল তাঁর। এ কী রকম লোক এরা, এই রারোইয়াবাসীরা? এ কী রকম কাজের রীতি এদের?

পাশের বাড়ির লোকটির নাম টেফাউ। একদিন ড্যানিয়েলসন দেখলেন, টেফাউ সকাল থেকে নিবিষ্টচিত্তে কাজে লেগে গেছে।



ছোট্ট ঠেলাগাড়িটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে সে সমুদ্রের ধারে যাচ্ছে। আবার গাড়ি বোঝাই বালি নিয়ে নিয়ে তার বাড়ির পাশে ফেলছে।

কী ব্যাপার টেফাউ ? না, ইঁদুরে বড় গর্ত করেছে বাড়ির মধ্যে। বড্ড অসুবিধে। ওগুলো এবার বুঁজিয়ে দেব।

কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল, টেফাউয়ের বালি-ভরতি ঠেলা-গাড়িটা গ্রামের পথ জুড়ে পড়ে আছে। টেফাউ-এর টিকিরও সাক্ষাৎ নেই। আর নেই তো নেই-ই। দিনের পর দিন গাড়িটা পথ জুড়ে পড়ে থাকল। লোকের পর লোক সেটা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পার হল, এমন কি টেফাউকেও বার কয়েক ওটা ডিঙিয়ে যেতে দেখা গেল। কিন্তু ব্যস, ওই পর্যন্তই। না টেফাউ না অন্য কেউ জিনিসটা যে পথ জুড়ে থেকে অসুবিধে ঘটাচ্ছে, সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করলে না।

আবার হঠাৎ একদিন ভর দুপুরের ঠা-ঠা রোদ্দুরে, কি অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর রাত্রে, টেফাউয়ের ঠেলাগাড়ির চাকার ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ শোনা গেল।

কী ব্যাপার টেফাউ ?

টেফাউ একগাল হেসে তেমনি জবাব দেবে, ইঁদুর গর্ত করেছে। বড্ড অসুবিধে। ওগুলো এবার বুঁজিয়ে দেব।

সিমেণ্ট একটা বস্তু যা দিয়ে আমরা জানি বাড়িঘর বানাতে কি পথ, সেতু গড়তে। কিন্তু এরা তাকে আরও অজস্র অভিনব কাজে লাগাতে জানে।

ড্যানিয়েলসন হঠাৎ একদিন দেখলেন, রাউরি তার জমিতে অশেষ পরিশ্রম করে গর্ত খুঁড়ছে। এমন দৃশ্য এখানে সচরাচর দেখা যায় না। তাই ড্যানিয়েলসনের কৌতূহল হল।

কি রাউরি গর্ত খুঁড়ছ যে; এখানে হবেটা কি ?

গর্ত নয়, গর্ত নয়, রাউরি মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল। এখানে পাঁচিল তুলব।

পাঁচিল তুলবে! নিজের জমিতে! কেন? তোমার তো কোনও ভাগীদার নেই।

রাউরির স্বভাবসিদ্ধ গালভরা হাসিটা বেরিয়ে পড়ল। বললে, ভাগীদারের জন্য নয়, মাঠে বড্ড আগাছার উৎপাত হয়েছে। তাই ঠেকাবার জন্যই পাঁচিল তুলছি।

আগাছা ঠেকাতে পাঁচিল! জবাব শুনে ড্যানিয়েলসনের চোখ দুটো গোল হয়ে গেল।

রাউরি খুব গম্ভীরভাবে জবাব দিল, বাইরে এত আগাছা বেড়ে গেছে আর সেগুলো এমন প্রচণ্ডভাবে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ছে যে, এখন বাগানটা বাঁচাবার জন্যই বাধ্য হয়ে পাঁচিল তুলতে হচ্ছে।

কি সুন্দর যুক্তি! রাউরির মাথাটা ঠিক আছে কিনা ড্যানিয়েলসনের সন্দেহ হল। ওর জামাইটা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ফিসফিস করে বলল, আরে ওসব আগাছা-ফাগাছা বাজে কথা। আসল কথাটা হচ্ছে, ও সেদিন হঠাৎ কিছু সিমেণ্ট কিনে ফেলেছে। এখন সেগুলো কাজে লাগাতে হবে তো, টাকার জিনিস, নষ্ট তো আর করতে পারে না। আর বাড়িঘর কি বাড়ির ভিত এর আগে ও এত বানিয়েছে যে তাতে আর বিশেষ রুচি নেই। একটা নতুন কিছু করা চাই। তাই পাঁচিল তুলছে।

কাজকে যেভাবে বশে রেখেছে এই রারোটোঙ্গাবাসীরা, টাকাকেও তেমনিভাবে বশে রেখেছে। পৃথিবী টাকার বশ, এ সত্য সভ্য-জগতের। রারোটোঙ্গাতে টাকা সম্পূর্ণভাবে মানুষের বশ। এখানেও কেনাবেচা হয়, ব্যবসাবাণিজ্য চলে, লেনদেনও হয়; কিন্তু তা নিয়ে কলহ বিবাদ করে, মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক এখানে কখনও তিক্ত হয় না, বিষাক্ত হয় না।

তারা যদি সভ্য দেশের জীব হত তো টেকুরার ভিটের নিশ্চয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ত, চরাতে না পারলেও সেই চেষ্টায় নিজের সবটুকু কেরামতি যে দেখাত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা আর টেকুরা ভিন্ন জগতের বাসিন্দা, তাই তাদের সমস্যার কেমন সুন্দর সমাধান নিজেরা করে ফেলল।

ঘটনাটা বলি। তারা প্রায় বছর দশেক তাহিতিতে কাটিয়ে রারোইয়াতে ফিরল। ইচ্ছে যে-কটা পয়সা জমিয়েছে, তাই দিয়ে কিছু জমি কিনে বাকী কালটা দেশের মাটিতেই কাটিয়ে দেয়। কার কাছ থেকে জমি পাবে? কে জমি বেচতে পারে? খুঁজতে খুঁজতে বের করল টেকুরাকে। টেকুরা, জমি বেচতে রাজী আছ? হ্যাঁ, রাজী। ব্যস্ তবে এই নাও টাকা। আমাকে এক টুকরো জমি দাও। দিলাম। হয়ে গেল জমি কেনাবেচা। দলিল না, পত্তর না, উকিল না, মুহুরি না, কিচ্ছু না। তারা জমিটা দেখল না

তারপর জমি-বেচা টাকায় চলল কদিন ধরে, অনবরত নাচগান, খাওয়া দাওয়া, ফুর্তি। টেকুরা যত পারল বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে নেমন্তন্ন করল। সে কদিন তারারও নেমন্তন্ন তার বাড়িতে। শেষ পাই পয়সাটি অব্দি যেদিন খরচ হল, সেইদিন সব যে যার স্থানে রওনা দিলে।

এদিকে সর্বস্ব দিয়ে যে জমিটুকু টেকুরার কাছ থেকে পেল, তাতে দেখা গেল তারার ফুর্তি-টুর্তি করার খরচটা বড় জোর উঠতে পারে, কিন্তু সে জমির আয়ে সংসার চলবে না। সে তৎক্ষণাৎ টেকুরার কাছে অভিযোগ করল। অভিযোগ শুনে টেকুরার তো চক্ষু চড়ক গাছে। কারণ সে তারাকে কখনও ঠকাতে চায় নি। এদিকে টেকুরার আর বাড়তি জমিও নেই যা তারাকে দিতে পারে। ওর টাকাও সব ফুঁকে দিয়েছে। নিজের এমন পয়সাও নেই যে তারার টাকা শোধ করে দেবে। এখন উপায়? টেকুরার মাথায়

আকাশ ভেঙে পড়ল। রাতদিন এখন টেকুরার এক চিন্তা কী করে সে তারার ক্ষতিপূরণ করবে। হঠাৎ টেকুরার মাথায় এক চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেল। টেকুরার তো ইয়ারবন্ধুর আর সীমা-সংখ্যা নেই। নেমন্তন্নও তো একটার পর একটা লেগেই আছে ওর বাড়িতে। রান্নাবান্না করবার জন্য ওর তো একজন লোক বিশেষ দরকার। তা সেই কাজের জন্য তারাকে রাখলে কেমন হয়? এর ফলে তারাকে আর নিজের খাওয়া-পরার জন্য ভাবতে হবে না। জমিতে যে নারকেল হবে তার টাকায় সে অনায়াসে অন্য কাজ করতে পারবে।

তারার কাছে প্রস্তাবটা করতেই সে খুশীমনে সায় দিল। টেকুরাও মস্ত একটা দুশ্চিন্তার বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে বাঁচল।

টুকাওকো ভেবে দেখল ব্যবসাতেই লক্ষ্মীর বাস। দুপয়সার মুখ যদি দেখতে হয় তো ব্যবসা ছাড়া গতি নেই। বেশ, টুকাওকো স্থির করল, তবে ব্যবসাই করব।

যেই এই কথা ভাবা আর টুকাওকো ঠিক করে ফেলল, সে দোকান খুলবে। সেই গ্রামে যে আরও দোকান আছে, তার উপর আবার একটা দোকান খুললে চলবে কি না সে সব হিসেব তো তুচ্ছ। এই সব ছোটখাট ব্যাপারে সে মাথা ঘামাল না। তার মন প্রাণ তখন ব্যস্ত রয়েছে দোকানটা যেন দর্শনধারী হয়, সবাই যেন দেখে হাঁ হয়ে যায়, তারিফ করে, ইত্যাদি। বহু খরচাপাতি করে টুকাওকো একটা দোকান-ঘর শেষ পর্যন্ত বানিয়ে ফেলল। সত্যি খুব সুন্দর দেখতে হল বটে দোকানঘরখানা। চকচকে নতুন টিনের চালা তুলল, বাইরের দেয়াল হলদে আর নীল রঙে রং করে দিল, আর ভিতরের দেয়ালে লাগাল সবুজ রঙ। তাহিতি থেকে দামী দামী কাঠ আনিয়ে তাই দিয়ে তাক-টাক বানাল। একটা মস্তবড় সাইনবোর্ডও শেষ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিল টুকাওকো ওর

দোকানের সামনে। সাইনবোর্ডের উপর টুকাওকোর নাম জ্বলজ্বল করছে দেখে ওর বুক গর্বে ফুলে উঠল। হ্যাঁ, দোকান যদি করতে হয় তো এমন একখানা দোকানই চাই।

কিন্তু এত করেও টুকাওকোর দোকান চলল না। কারণ দোকান চালাতে গেলে যেমন ভাল একখানা দোকানঘর চাই, তেমনি মালও তো চাই। দোকান গড়তে টুকাওকোর সব টাকা বেরিয়ে গেল, মাল কিনতে আর পারল না। টুকাওকো কিন্তু তাতে মোটেই দমল না। নারকেলের শুকনো শাঁস যতদিন আছে, ততদিন টাকার ভাবনা কি? সারা বছর ধরে খেটেখুটে প্রচুর শুকনো শাঁস তৈরি করল। ব্যাপারীর কাছে বেচে টাকা পেল বেশ। অনেক টাকা সঙ্গে নিয়ে টুকাওকো তাহিতি গেল মাল কিনতে। সেই যে সে তাহিতিতে গেল, আর ফিরল বছরখানেক পরে, দুহাত একেবারে খালি করে। কি হল টুকাওকো, মাল আনতে গেলে, মাল কই?

শূন্য দোকানের বারান্দায় লোকজন জুটিয়ে টুকাওকা তখন তার তাহিতিবাসের রোমাঞ্চকর বিবরণ সব শোনাতে লেগেছে। প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে চেয়ে একগাল হেসে বলল, মালের কথা এখন শিকেয় তুলে রাখ ভাই। তাহিতি যদ্দিন আছে মালপত্রের ভাবনা কি? আর আমার দোকানঘরখানাও যা মজবুত বানিয়েছি দু এক বছরেই কিছু ভেঙে পড়ছে না। দোকান একদিন না একদিন হবেই। আফসোস এই, আমার সঙ্গে তোমরা কেউ গেলে না। বাইস্কোপ, বিলাতী থিয়েটার, নাচ, সার্কাস—কি ফুর্তিটাই না এবার জমেছিল! এঃ।

রেহুয়ার মাথাতেও দোকান করবার মতলব এসেছিল। তবে সে ঠিক টুকাওকার পথে পা বাড়াল না। দোকান তুলতেই যদি সব টাকা বেরিয়ে গেল তো মাল কিনবে কি দিয়ে? দোকান

তুলতে তাই সে এক আধলাও খরচ করল না। রেহুয়ার মাথায় তখন সরেস সরেস সব মতলব খেলছে। ওর ঠাকুমার যে কাঠের বাড়িখানা আছে—বাড়ি মানে একখানাই শুধু ঘর—তাতেই তো দিব্যি দোকান হতে পারে। তাই রেহুয়া বুড়িকে কুটুমবাড়ি পাঠিয়ে তার ঘরেই দোকান ফেঁদে বসল। মালপত্তর এনে দোকান বোঝাই করে ফেলল। তারপর চলল ফলাও কারবার। হু হু করে রেহুয়ার মাল কাটতে লাগল। রেহুয়া খুশী, তার মাল কাটছে। রেহুয়ার আত্মীয়-বান্ধবেরা খুশী, তারা ফোকটে মাল পাচ্ছে। আত্মীয়স্বজন যদি দাম দিয়েই মাল কিনবে তো রেহুয়া দোকান করল কার জন্যে? আর যে অল্প কয়জন—অল্প মানে খুবই অল্প, কারণ গ্রামের প্রায় তাবৎ লোকই হয় রেহুয়ার বন্ধু নয় তার আত্মীয়—পয়সা দিয়ে মাল কিনতে তারাও খুশী, কারণ রেহুয়ার দোকানে মাল কিনতে কখনও একঘেয়েমি লাগে না। জিনিসের দাম এক রেখে রেহুয়া কখনই খদ্দেরের ক্লান্তি বৃদ্ধি করে না। সকালে উঠেই রেহুয়ার মনে হল, এই সাবানটার দাম পাঁচ আনা হওয়া উচিত (কিন্তু সাবানটা কিনতে হয়ত সাত আনা লেগেছে), তো তখন সাবানটা সে পাঁচ আনাতেই বেচল। আবার সেইদিন বিকেলেই রেহুয়ার খেয়াল হল, না এ সাবানের দাম চোদ্দ পয়সার বেশী হতেই পারে না। অমনি রেহুয়া হাঁক ছাড়তে শুরু করল, লে লো ভাইয়া চৌদ্দ পয়সা।

ফলে, যা হবার তাই হল। দোকানের মাল যে পরিমাণ বেবিয়ে গেল, সেই পরিমাণ আর দোকানে তোলা গেল না। মাল কমতে কমতে এমন এক সময় এল, যখন রেহুয়ার মনে হল, এ দিয়ে আর ব্যবসা চলবে না। তাতে রেহুয়া দমে গেল না, বিন্দুমাত্র দুঃখিতও হল না। এই ব্যবসার পিছনে যে সে তার সব টাকা ঢেলেছে, তা যে এইভাবে অতলে তলিয়ে গেল, সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই রেহুয়ার। সেও খালি ভাবছিল, ব্যবসাটা

[illegible] ? এখনও তো কিছু মাল আছে দোকানে। হঠাৎ [illegible] মাথায় খেলল, ফিষ্টি করলে কেমন হয় ?

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। রেহুয়া ছুটল সবাইকে নেমন্তন্ন করতে। তারপর দিন দুই ধরে চলল ঢালাও ফুর্তি। যে যার কাজে কর্মে ইস্তফা দিয়ে রেহুয়ার দোকানে এসে জড় হল। তার-পর চলল, নাচগান, খানাপিনা, ফুর্তি। দোকানে যা মাল ছিল, তার শেষ কণাটি যেদিন ফুরোল, সেইদিন আবার যে যার কাজে ফিরে চলল।

রেহুয়া কেন যে দোকান চালাতে পারল না, সে সম্পর্কে ড্যানিয়েলসনকে অপেক্ষাকৃত হুঁশিয়ার এক ব্যক্তি বললে, আরে দূর, ও দোকান চালাবে কি ? ও কি হিসেব করতে জানে ? কোন জিনিস কত দামে কিনেছে, ও তা বলতে পারে নাকি ? তবে হ্যাঁ, ব্যবসাটা ওর মাথায় না ঢুকলেও, মানুষটা সরেস। কি ফুর্তিটাই না জমালে। দুদিন ধরে গোগ্রাসে গিলে ওর দোকানের মাল আমরা সাবাড় করেছি। আর কি খাসা খাসা জিনিস সব আমদানি করেছিল রেহুয়া। ব্যবসাটা ভালভাবে করলে ওর হত কী ? বড় জোর ওর দোকানটা টিঁকত। কিন্তু এ যা করলে রেহুয়া তাতে দু-তিন পুরুষ ধরে লোকে ওর নাম করবে। বলবে, হ্যাঁ দোকানের মত দোকান একখানা করেছিল বটে রেহুয়া। গ্রামসুদ্ধ লোক দুদিন ধরে খেয়ে তবে তার মাল ফুরোয়। এখন বলুন কোনটায় লাভ বেশী ?

৩

মারাও, সে এক ছোট্ট মেয়ে। বছর চারেক তার বয়েস। কাকার সঙ্গে সাইকেল চেপে আসছিল। পিছনের ক্যারিয়ারে বসে ছিল। কি করে যেন তার পা ঢুকে গেল চাকার ভিতরে। আর যাবে কোথায়, স্পোক ভেঙে পায়ে ফুটল। চেনের চাপ লেগে কচি

গোড়ালি মুড়মুড় করে গুঁড়িয়ে গেল। কাকা হতভম্ব। [illegible] লোক এসে জড় হল। মারাও ততক্ষণে চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে পথ। সর্বনাশ! কি হবে? কেন, ডাক্তার ডাকো। ডাক্তার! রারোইয়াতে ডাক্তার কোথায়? সব কাছে যে ডাক্তার, তিনি থাকেন পাপিতিতে। কিন্তু সে তো কমপক্ষেও চার পাঁচ শ মাইলের ধাক্কা। যানবাহনও হামেশা মেলে না। ন মাসে ছ মাসে একটা জাহাজ আসে কিনা সন্দেহ।

খবর পেয়ে ড্যানিয়েলসন ছুটে এলেন। মারাও-এর অবস্থা দেখে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তিনি নিজে ডাক্তার নন। তবু যা হোক করে মারাও-এর পায়ের ভিতর থেকে ভাঙা হাড়ের টুকরো বের করলেন। ব্যাণ্ডেজ-ট্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করলেন। দেখে বুঝলেন, গোড়ালির মায়া মারাওকে ত্যাগ করতে হবে।

মারাওকে ধরাধরি করে ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। ঘণ্টাখানেক বাদে তার চিৎকার কিছু কমল। ততক্ষণে মারাও-এর বাপ মা কাকা দাদা থেকে শুরু করে পিসতুতো মেসোর মামাতো খুড়ো অবধি সবাই বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে জুটে গেছেন তার বিছানার চার পাশে। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, সে বিষযে দুশ্চিন্তা বড় একটা কারো মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। বরং ব্যাপারটা যে এই পরিবারের মধ্যেই ঘটল এতেই সবাই যেন একটু খুশী। এ বাড়িতে আসবার যে একটা উপলক্ষ্য ঘটল, সেটা ভাগ্য বলে মনে করতে হবে বই কি? দুনিয়াটা তো আর আগের মত নেই। কি যে দিনকাল পড়ল, বিনা কারণে কেউ আর বড় একটা কারো বাড়ি যেতেই চায় না আজকাল।

দিব্যি গল্প-গুজব চলল। মারাও-এর বাবা বলল এ বরং এক পক্ষে ভালই হয়েছে বলতে হবে। হাত-টাত একটা গেলে মারাওকে বিলক্ষণ অসুবিধেয় পড়তে হত। ভাগ্যিস গোড়ালির

উপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটেছে। চলতে ফিরতে অবিশ্যি একটু কষ্ট হবে। তা মেয়েলোককে তো আর ফুটবল খেলতে হয় না। তবে আর মারাও-এর মুশকিলটা কোথায়।

মারাও-এর বাবার এই দার্শনিক তত্ত্বে ড্যানিয়েলসনের দুশ্চিন্তা গেল না। তিনি ওর বাবাকে বললেন, প্রথম সুযোগেই মারাওকে পাপিতিতে নিয়ে গিয়ে বড় হাসপাতালে ভরতি করে দিতে।

পাপিতি যাবার নাম শুনে মারাও-এর বাবা নেচে উঠল। ঠিক কথা। এতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। টাকা-পয়সার যোগাড়? সে হয়ে যাবে। হাতে জমান টাকা নেই, তাতে কি? ঘরের চালে টিন আছে কি করতে। পাপিতি গেলে মাস তিন চারের জন্য নিশ্চিন্ত। সে সময়টা আর তো এ বাড়ি তার কাজে লাগবে না। তবে? দাও চালের টিন খুলে মহাজনের কাছে বেচে।

বুদ্ধিটা ভালই করেছিল মারাও-এর বাবা। কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল। বাড়িটা তো ওর একার নয়। এজমালি। ও যদি টিন খুলে বেচে দেয় তো ওর ভাইয়েরা দাঁড়াবে কোথায়? মাথা গুঁজবে কিসের তলায়? হুঁ ভাববার কথা বটে। কিন্তু যাহা মুশকিল তাহা আসান। নতুন বুদ্ধি খেলে গেল মারাও-এর বাবার মাথায়। ও যদি পাপিতি যায়, তো ওর ভায়েদেরই বা এখানে থাকা কেন? ওরাও চলুক না সঙ্গে। তাহলেই তো সমস্যাটা মিটে যায়। আর লোক যত বেশী হবে, ফুর্তিও তত জমবে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ওর ভাইয়েরাও যাবে সঙ্গে। কথাটা পাড়তেই তক্ষুনি রাজী হয়ে গেল সবাই। আর সঙ্গে-সঙ্গে চালের টিন খোলা শুরু হয়ে গেল।

আরে! আরে! করছ কি? কোথায় জাহাজ তার ঠিক নেই, আর তোমরা এখন থেকেই চালের টিন খুলছ। যদি মাস খানেকের মধ্যে জাহাজটা না আসে, তখন থাকবে কোথায়?

থামো তো হে বাপু। পিছন থেকে টিক-টিক করে শুভ কাজে বাগড়া দিও না। জাহাজ আজ না আসে, কাল আসবে। কাল না আসে, পরশু। তার জন্যে তাড়া কি? কাজটা এগিয়ে রাখতে দোষ কি? বলে কি, থাকবে কোথায়? কেন, ঘর ছাড়া কি থাকা যায় না? গাছতলা আছে কি করতে? যদ্দিন জাহাজ না আসে, তদ্দিন গাছতলায় থাকব। আমি তো মনে করি, বদ্ধ ঘরের চেয়ে খোলামেলায় থাকাই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

এমনি করে, গাছতলায় থাকবার পক্ষে একটার পর একটা যুক্তি যত বাড়ে ততই এক একখানা করে করোগেটেড টিন চাল থেকে খসে খসে পড়ে। দুমদাম শব্দ হয় টিন পড়ার। আর গোটা পরিবার খুশীতে মেতে ওঠে এই নতুন খেলায়।

কিন্তু খুশীর মাত্রা বেশী হলেই মানুষের সতর্কতা কমে। আর অসতর্ক হলেই মানুষের ঘাড়ে দুর্ঘটনা চেপে বসে। এদেরও তাই হল।

একজন চাল থেকে টিন খুলে ফেলে দিচ্ছিল আর অন্যরা সেগুলো বয়ে মহাজনের বাড়িতে দিয়ে আসছিল। যারা টিন বইছিল, তাদেরই একজন হঠাৎ আবিষ্কার করল, টিনগুলো মাথায় না চাপিয়ে যদি ওগুলোকে পালের মত করে বাতাসের মুখে ধরা যায় তো তার ধাক্কায় দিব্যি এগিয়ে যাওয়া যায়। যেই ভাবা সেই কাজ। আর একজন যদি শুরু করল তো সেই কাজে সবাই উঠল মেতে। অমনি শুরু হয়ে গেল পালের রেস। কি ফুর্তি কি ফুর্তি। কাজের মত কাজ জুটেছে একখানা। মারাও-এর দশ বছুরে দাদা পালের রেস দিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আর টিনের কানায় ধাক্কা লেগে তার পা-খানা গেল কেটে। ড্যানিয়েলসন ব্যাপার-স্যাপার দেখে অনেকক্ষণ থেকেই এই রকম একটা কিছু ঘটবারই আশঙ্কা করছিলেন। তাই

তৈরীই ছিলেন। ছেলেটির পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তাকে শুইয়ে দিলেন মারাও-এর পাশেই। ব্যবস্থা দেখে মারাও-এর বাবা খুব খুশী।

বলল, যাক, এতদিনে মারাও-এর একজন সঙ্গী জুটল। ব্যাচারাকে বড্ড একা একা দিন কাটাতে হত। এখন সে ভাবনা ঘুচল।

রারোইয়াবাসীরা সকল ভাবনার মত রোগের ভাবনাকেও তালাক দিয়েছে। আরে, শরীরটা যখন আছে রোগও তখন থাকবে। এতে ভাবনার কি আছে? ওদের ভাবখানা এই।

রারোইয়াতে ডাক্তার নেই। কাজেই এক বিষয়ে ওদের খুব সুবিধে। ইচ্ছেমত ওরা চিকিৎসা করতে পারে। ওষুধও খায় খুশিমত। আর সেই বিষয়ে বাছবিচার বড় একটা নেই।

তবে কিছুদিন আগে বড় রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে আইডিনের উপর ওদের ভক্তি চটে গেছে। নইলে এক-কালে আইডিনই ছিল ওদের সব থেকে পেয়ারের ওষুধ।

সমুদ্রের সঙ্গে রারোইয়াবাসীদের জীবন-মরণ সম্পর্ক। সমুদ্র ওদের মাছের যোগান দেয়। শুক্তির যোগান দেয়। মাছ ধরতে, শুক্তি তুলতে তাই সমুদ্রে ঘন ঘন যাতায়াত। জলের নীচে যে প্রবাল-প্রাচীর, তাতে ঘষা লেগে পায়ে ক্ষত প্রায় প্রত্যেকটি রারোইয়া বাসীরই হয়। আগে তা কিভাবে সারাত তা তারাই জানে। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দৈবাৎ পাশ্চাত্ত্য দেশীয় এক চিকিৎসক রারোইয়াতে এসে পড়েন। আর তিনি এদের আইডিনের ব্যবহার শিখিয়ে দেন। তুলোতে কি করে আইডিন মাখাতে হয়, কেমন করে তা দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করতে হয়, সে সব এরা পটাপট শিখে নিল। কাজটা অতি সোজা। নিতান্ত বাচ্চা যে, সেও করতে পারে।

একবার জিনিসটা শিখতে যা দেরি, তারপর আর কি?

রারোইয়াতে দিনকতক শুধু তুলো আর আইডিনের রাজত্ব চলল। তুলোর পাহাড় জমে উঠল। নদী বইলো আইডিনের। বহু মেয়াদী ক্ষত নিরাময় হয়ে গেল। নতুন ক্ষত বাড়বার অবকাশ পেল না।

তারপর একদিন কে যেন ার একজিমায় আইডিন লাগিয়ে উপকার পেল। ব্যস্, আইডিনের উপর ওদের ভক্তি চতুর্গুণ বেড়ে গেল। তারপর যত্রতত্র চলল আইডিন লাগানোর পালা। একটা কিছু হলেই সেখানে আইডিন লেপে দাও।

আইডিনের গ্রহ যখন এই রকম তুঙ্গে, সেই সময় একদিন রারোইয়ার মোড়ল ভয়ানক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। পাকস্থলীতে তার অসম্ভব ব্যথা। এ ব্যাধি ওদের কাছে নতুন। ওষুধ যা যা জানা ছিল বা যেগুলো ওদের পছন্দ হল, সবই এক একবার লাগাল। চিকিৎসার এই কায়দা বের করছে টেমাকের বউ তেহেতু।

তেহেতু বলে, আরে, এতে অত মাথা ঘামানোর কি আছে? একদিকে যেমন রোগ আছে অন্যদিকে তেমনি তার ওষুধও আছে। যদি জান, কোন রোগের কোন ওষুধ, তো বাস, তাই খাও। যদি তা না জান, তো সব ওষুধই খাও। যেটা সেখানে লাগবার লাগবে, বাকীগুলো বেরিয়ে যাবে। এ তো জলের মত সোজা।

তেহেতুর উপদেশ, এমন কি রারোইয়াতেও, বোধহয় সবাই পালন করতে ভরসা পায় না। কিন্তু বুড়ো মোড়লের পেটের ব্যথায় প্রাণপাখি বুঝি খাঁচা ছাড়ব-ছাড়ব হয়। তাই সে পাঁচ রকম চিকিৎসা করে দেখল। হঠাৎ মোড়লের মনে পড়ল, তাই তো, তার ঘরে তো বোতল বোতল টিনচার আইডিন আছে। গ্রাম-সুদ্ধ লোকের সে জিম্মাদার। তাই ওষুধ-বিষুধ সব তার কাছেই জমা থাকে

এই আইডিনে যখন রাজ্যের লোকের পায়ের ব্যথা, গায়ের ব্যথা, হাতের পিঠের সব জায়গার ব্যথাই সারছে, তখন তার পাকস্থলীর ব্যথাই বা কি এমন অপরাধ করেছে যে সারবে না। যেই এ ভাবনা মনের মধ্যে লাপঝাঁপ দিতে শুরু করা আর মোড়ল একটি পুরো পাকী আধসেরী টিনচার আইডিনের বোতল টেনে নিয়ে ঢক-ঢক করে সবটুকু গলায় ঢেলে দিলে। তারপর?

তারপর, বুড়ো মারা গেল। টেহেই কথাটা এমনভাবে বলল, যেন এ তো জানা কথা। বুড়োর গোটা পাকস্থলীটাই পুড়ে গিয়েছিল কিনা। আইডিন যে এমন মারাত্মক বদমাস তা কে জানত।

সেই থেকে রারোইয়াতে আইডিনপর্বে ইতি পড়ল!

রোগ পুষে রাখা রারোইয়াবাসীদের স্বভাব। কিছুটা কুঁড়েমি, কিছুটা ব্যথা লাগার আশঙ্কা, আর কিছুটা রোগের প্রতি একটা দার্শনিকসুলভ উদাসীনতা। শরীরটা আছে যখন, রোগটাও থাকবে। এই যেমন হাত, এই যেমন পা, এই যেমন আর পাঁচটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মেনে নিয়েছি, তেমনি রোগকেও মেনে নিতে হবে। সারাতে পার ভাল, না পারলে সঙ্গের সাথী করে রাখ। ভয় পেয়ো না, ওর জন্য অনর্থক মাথাও ঘামিও না।

ড্যানিয়েলসন দেখে অবাক হয়েছেন। রারোইয়াবাসীরা কি অসীম মনোবলের সঙ্গে রোগকে উপেক্ষা করে চলেছে। জীবনকে উপভোগ করতে ওঁরা ওস্তাদ। তাই কোনো কিছুর কাছেই মাথা নোয়ায় না।

গোটা গ্রামের মধ্যে টেমাকেই একমাত্র লোক যে ওষুধপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে। তার কারণ, তার দোকানে কিছু ওষুধের স্টক আছে। টেমাকে একদিন সে সব দেখাবার জন্য ড্যানিয়েলসনকে নিয়ে গেল। ব্যাপার দেখে ড্যানিয়েলসনের মুখ হাঁ হয়ে গেল। সারা ঘরময় শিশি-বোতল ছড়ান। যেখানে-সেখানে ওষুধপত্র ছড়িয়ে আছে। শিশি-বোতলের লেবেল

অনেকগুলোরই নেই, কিছু কিছু যাও বা আছে, একেবারে অস্পষ্ট। ওগুলোর উপর ধুলো জমেছে পুরু হয়ে। কার যেন ওষুধের দরকার। টেমাকের পরিবারসুদ্ধ লোক খুঁজতে লেগে গেল। লোশনটা কই? কাশির মিকশ্চারটা? কেউ জানে না। খোঁজ খোঁজ। শুরু হল খোঁজা। তাকেব মাথা, আলমারির পিছন, ঘবের কোনাঘুঁজি - কোথাও নেই। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে তোষকের নীচ থেকে একটা বোতল হয়ত বেরুল। টেমাকে খুব খুশী।

এই যে কাশির মিকশ্চাব। বোতলটা তুলে ধরতেই ওর বউ তেহেতু চেঁচিয়ে উঠল, আরে ধ্যুৎ, ও তো মালিশের ওষুধ।

না, না, এটা কাশির ওষুধ। সেদিন একজনকে দিলাম। তার তো কাশি সেরে গেল।

তেহেতু বললে, আর ওটা মালিশ করে যে আমার ঘাড়ের বেদনা কম পড়ল, তার কি ?

এই নিয়ে দাম্পত্য কলহ মাথা চাড়া দেয় দেখে, ড্যানিয়েলসন বোতলটা নিলেন। বেশ করে ঝেড়ে-ঝুড়ে লেবেলটা পড়ে দেখলেন, ওটা মালিশেরই ওষুধ। স্পষ্ট করে লেখা, আছে, বিষ, শুধু মালিশের জন্য।

কতকগুলো বেশ সোজা সোজা চিকিৎসা ওদের আছে। প্রবল জ্বর হয়েছে? গা পুড়ে যাচ্ছে উত্তাপে? তো যাও, রোগীকে লেগুনের জলে ঘণ্টা খানেক চুবিয়ে নিয়ে এস। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দা কাটারী গবম হলে এই ভাবেই তো তা ঠাণ্ডা হয়। কি হয়েছে? পেট কামড়াচ্ছে বেজায়? আচ্ছা সে পেট ডলাডলি কর। বমি বমি লাগছে? বেশ কথা। গলা পর্যন্ত ঠেসে খাইয়ে দাও। জলের দেশের লোক ওরা, অথচ জলে ডোবার চিকিৎসা জানে না। তার কারণ, রারোইয়াবাসীরা সব যেন হাঁসের বাচ্চা। কেউ জলে ডোবে না। ওদের স্মরণকালে একজন মাত্র ডুবেছে। তাও সে লোক এখানকার নয়, তাহিতির।

একজন বললে, ব্যাটাকে নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল।

কেন, কি হয়েছিল ?

জল খেয়ে খেয়ে ওর পেটটা ফুলে জয়ঢাক হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওকে ধরাধরি করে একটা পিপের উপর উপুড় করে শুইয়ে দিলাম। তারপর পিপেটাকে গড়াতে লাগলাম। একবার সামনে গড়াই, একবার পিছনে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। গ্রামসুদ্ধ লোক হিমসিম খেয়ে গেল, কিন্তু ব্যাটার মুখ দিয়ে একটি ফোটা জলও বের করতে পারলে না।

তারপর ?

তারপর, কায়দাটা বদলাতে হল। ওকে পিপের সঙ্গে আচ্ছা করে বেঁধে পিপেটাকে একটা পুরো গড়ান দিতেই পিপের নীচে ব্যাটা যখন চেপ্টে গেল, তখন হুড়হুড় করে সব জল বেরিয়ে গেল।

টেমাকের কাহিনীটা আরও মজার। একদিন টেমাকে ড্যানিয়েলসনের কাছে এসে বলল, ছাখ, আমার পিঠটায় বড় ব্যথা হয়েছে।

কেন ? খুব মোট টেনেছ বুঝি ?

টেমাকে বলল, না না; আজকের ব্যথা নয়। ওটা সেই ১৯২০ সাল থেকে আছে।

সে কি ? ডাক্তার দেখিয়েছ ?

হুঁ।

কি বললে ডাক্তার ?

টেমাকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ডাক্তার দেখে বলেছিল, ব্যথা-ট্যাথা কিছু নেই। পিঠের দিকে হাত দেখিয়ে টেমাকে বলল, অথচ ব্যথাটা আছেই ওখানে। বড্ড খচখচ করে।

১৯১৪ সালের যুদ্ধে গিয়েছিল টেমাকে। কপাল ভাল, তাই লড়াই-টড়াই করে দিব্যি অক্ষতই ফিরে এসেছিল। একদিন গাছতলায় ঘুমুচ্ছে আর টেমাকের পিঠে ছুম করে পড়ল সের

পাঁচেক ওজনের এক রাক্ষুসে ডাব। সেই যে ব্যথা, সে আর কিছুতেই সারছে না।

ড্যানিয়েলসন বললেন, তা গরম সেক-টেক দিলে পার।

কই, তাতেও বা সারছে কই? বউ তো দুবেলাই পিঠে ইস্তিরি করে দিচ্ছে।

কি? কি করেছে তোমার বউ? কথাটা প্রথমে বুঝতে পারেন নি ড্যানিয়েলসন।

টেমাকে গম্ভীরভাবে জবাব দিল, ইস্তিরি। তা বউয়ের তো কিছু অসুবিধে নেই। পিঠটা তো আমার বেশ চওড়াই। জামা কাপড় ভাঁজ করে দিব্যি পিঠের উপর পাতে, তারপর চালায় গরম ইস্তিরির ডলা। সেককে সেকও হল, ওদিকে কাপড় জামাও দিব্যি ইস্তিরি হয়ে গেল। বরঞ্চ অসুবিধে আমারই, বউটার তো আর জ্ঞানগম্যি নেই। মাঝে মাঝে খালি পিঠেই ইস্তিরি চালিয়ে দেয়। এই ছাখ না কত ফোস্কা পড়েছে।



টেমাকে জামা খুলে পিঠ দেখায়। অতি দুঃখেও হাসি আসে ড্যানিয়েলসনের।

বলেন, তা এতে উপকার পাচ্ছ কিছু?

টেমাকে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জানায়, না। তাইতো তোমার কাছে এলাম।

ওদের কথা শেষ না হতেই গ্রামে সোরগোল পড়ে গেল।

জাহাজ এসেছে, জাহাজ। গ্রাম উজাড় করে সবাই ছুটল জেটিতে। হৈ-চৈ পড়ল। সাজ সাজ রব উঠল ঘরে ঘরে।

মারাও আর তার দাদাকে পাপিতিতে নিতে হবে চিকিৎসা করাতে। মারাও-এর সঙ্গে বহু লোক জুটে গেল। ওদের আত্মীয় বান্ধব সব চলল পাপিতি। দেশ দেখার এমন সুযোগ আর কবে ঘটবে কে জানে। দুর্ঘটনা তো আর রোজ ঘটে না।

টিয়াপারারও একটা অদ্ভুত রোগ হয়েছিল। মাঝে মাঝে একটা চোখ খুব ফুলে উঠত। মাথায় হত অসহ্য যন্ত্রণা। তাকেও পাঠান হল এই সঙ্গে। রোগের যন্ত্রণায় বেচারা তখন বড়ই কাতর।

নাচগান গীটারের বাজনা আর হৈ-চৈ চিৎকারের মধ্যে রোগীদের নিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। ফুর্তি দেখে মনে হয়, হাসপাতালে নয়, সব যেন রাজ্য জয় করতেই চলেছে।

হপ্তা ছয়েক পরে টিয়াপারা ফিরে এল। কিন্তু মারাওদের কোনও পাত্তা নেই। তারপর পাপিতির খবর কি? এবার ফুর্তি জমল কেমন? অমুক কাকার খবর কি? তমুক মাসির সঙ্গে কি দেখা হয়েছে? শত শত প্রশ্ন ওঠে শতেকজনের কণ্ঠে। জবাব দিতে টিয়াপারার মুখে যেন খই ফোটে।

অনেকক্ষণ পরে, এক ফাঁকে একটু ফুরসত পেতেই ড্যানিয়েলসন জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তার কি বলল তোমাকে?

কিছু না তো।

ড্যানিয়েলসন বিস্মিত হলেন। সে কি, কেন?

টিয়াপারা হেসে বলল, ডাক্তারের কাছে গেলাম কখন। যেতে যেতে অসুখটা কম পড়ে গেল, ভাবলাম সেরে গেছে। ভাই যে কদিন ছিলাম ফুর্তি-টুর্তি করে বেড়ালাম। ডাক্তার দেখাতে আর সময় পাইনি। পাপিতিতে ভালই ছিলাম। একদিনও যন্ত্রণা হয়নি। কিন্তু এখানে এসে ইস্তক আবার যন্ত্রণাটা টের পাচ্ছি। কি করি বল তো?

ড্যানিয়েলসন দেখলেন টিয়াপারার একটা চোখ আবার ফুলতে শুরু করেছে।

ড্যানিয়েলসন জিজ্ঞাসা করলেন, আর মারাও, সে কেমন আছে?

সে ভালই আছে। হাসপাতালে ওর পা থেকে একটা হাড় বের করে ফেলা হয়েছে। আমরা যখন আসি, তখনও প্রায় ভালই হয়ে গেছে।

বেশ, তবে যে ওরা এল না।

টিয়াপারা বলল, আসবে কি? ওদের তো দেখাই হয়নি কিছু। পাপিতি তো আর একটুখানি জায়গা নয়। আমরা যেদিন আসি, সেদিন মারাও-এর বাবা আমাদের জাহাজে এসেছিল। বলল, জুলাই পরবটা দেখে আসাই ওদের ইচ্ছা। আর তো এমন সুযোগ নাও ঘটতে পারে। দুর্ঘটনা আর কটা ঘটে বল?

৪

যেমন সব ক্ষেত্রে, সকলের বেলাতেই, জন্ম দিয়ে জীবনের শুরু, বিবাহে পরিণতি আর মৃত্যুতে তার সমাপ্তি, এই রারোইয়াবাসীদের বেলাতেও তাই।

তবে রারোইয়াতে হাসপাতাল নেই, প্রসূতি-মঙ্গল-আগার নেই, শিশুবিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই। এমন কি, ধাত্রী-বিদ্যায় সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন কাউকেও এখানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই রারো-ইয়াতে জন্মের আগে কোনো তোড়জোড় করা হয় না। যেমন গাছের বেলা ঘটে, যেমন পশুর বেলা ঘটে, তেমনি মানুষের বেলাতেও জন্মটা একটা অনিবার্য, অপরিহার্য ঘটনা বলে তার নিয়ম অনুসারে ঘটতে দেওয়া হয়। এ নিয়ে কারও চাঞ্চল্য নেই, আতঙ্ক নেই, উদ্বেগ নেই।

টিনোরুয়া জানত, তার বউ-এর প্রসব হতে এখনও দেরি

[illegible] অন্তত দু-হপ্তা তো বটেই। ওর বউ হামাউ-এরও সেই ধারণা ছিল। কাল অনেক রাত পর্যন্ত দুজনে গল্পগুজব করেছে। বিয়ের পর থেকে সর্বদা জোড় বেঁধে থাকতেই দেখা যায় দুজনকে। কেউ কাউকে ছেড়ে দু দণ্ডও থাকে না। তাই সকাল থেকে টিনোরুয়াকে এতটা সময় একা বসে থাকতে দেখে একটু অবাক লাগল। ড্যানিয়েলসন গিয়ে বসলেন টিনোরুয়ার কাছে। এ-কথা সে-কথায় বেশ গল্প জমে উঠল।

হঠাৎ ড্যানিয়েলসন জিজ্ঞাসা করলেন, হামাউকে দেখছিনে ?

হামাউ ? টিনোরুয়া হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল, বলল, ঠিক কথা, একটু বস, ওকে দেখে আসি। ও আঁতুড়ে ঢুকেছে। ছেলেপুলে হবে কিনা ?

বল কি ! ড্যানিয়েলসন বিস্মিত হলেন। বললেন, তবে তুমি এতক্ষণ ধরে এখানে বসে আড্ডা মারছ কেন ?

টিনোরুয়া এক গাল হেসে জবাব দিল, না না, তেমন গোলমালের কোনো ব্যাপার না। হামাউ-এর এসব বিষয়ে বেশ হাতযশ আছে। ও কখনও কষ্ট পায় না।

এখানে ধাত্রী-টাত্রী কেউ নেই ? ড্যানিয়েলসনের সভ্য মনে আশঙ্কার ছায়া দেখা দেয়।

টিনোরুয়া হাসে। বলে, এখানে ওসব ঝঞ্ঝাট নেই।

ড্যানিয়েলসনের স্ত্রী মেরী টেরেসাও কথাটা শুনলেন। তাঁর ভয় আরও বেশী। তিনি বললেন, এসব ব্যাপার হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। জীবন-মরণ এখানে জড়িত। মেরী টিনোরুয়াকে সাহায্য করতে চাইলেন।

সাহায্য করবে ? টিনোরুয়া বলল, বেশ তো, সে তো ভাল কথা। চল, তবে ভেতরে চল।

টিনোরুয়ার সঙ্গে তিনি ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এলেন। ভয়ানক বিরক্ত হয়ে।

কি ব্যাপার ?

এরা মানুষ না অন্য কিছু ?

কেন, হল কি ?

বাচ্চা যে হবে, তার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত কিছু থাকবে তো ? না আছে একটুকরো ফরসা ন্যাকড়া, না গরম জল, না তুলো, না স্পিরিট, না একখানা কাঁথা, না একটা কাপড়। কিচ্ছু নেই। সবাই কেমন দিব্যি নির্বিকার।

টিনোরুয়াকে এসব বলতেই ও অবাক হয়ে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইল। যেন এমন আজগুবী কথা ও জীবনে শোনেনি।

বলল, বাচ্চা তো হবে একটা এইটুকুন। তার জন্য গন্ধমাদন যোগাড় করতে হবে নাকি। বাচ্চাটাকে জড়াবার মত একটা কিছু থাকলেই হল। এখানে আমরা যা পাই, তাই দিয়ে বাচ্চাকে জড়িয়ে রাখি। সেটা নোংরা হয়ে গেলে আবার একটা কিছু আনি।

ভাল করে ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য টিনোরুয়া ঘরের কোণ থেকে গোটাকতক ছেঁড়া শার্ট নিয়ে এল। তারপর সেগুলো পড়পড় করে ছিঁড়ে টুকরোগুলো জড় করে মেরীকে দিল।

তারপর নিশ্চিন্তভাবে এক পাশে বসে বলল, কেমন হল তো। যেমন ঠাকুর, তেমন তো তার নৈবিদ্যি। ঐটুকুন মুনিষ্যির জন্য তো আর এক ফ্যাক্টরি কাপড় যোগাড় করা যায় না।

মেরী কিন্তু এত সহজে দমে যাবার পাত্রী নন। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, আধুনিক প্রসূতি-বিজ্ঞানের মহিমাটা এদের বোঝাতে হবে। সরল শিশু-পালনের পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে ওরা দুজনে জ্ঞান সঞ্চয় করতে লাগলেন। কিন্তু ঐ জ্ঞান পর্যন্তই এগুলেন। তা আর বিশেষ কাজে পরিণত করা গেল না।

টিনোরুয়ার মা ছিল, এক বুড়ি। খবর পেয়ে সে এল। এসেই এসব যোগাড়যন্ত্র দেখে তার তো বিস্ময়ের আর অবধি নেই।

বাপরে! এ কী এলাহী কাণ্ড! কোথায় বুড়ি একটু সাহায্য করবে, তা নয়, ধাতস্থ হওয়ামাত্র ছুটল গ্রামের লোক জড় করতে। ওগো, কে কোথায় আছ, শিগগির এস আমার ছেলের বাড়ি। দেখ, সাহেব-মেম কী কাণ্ডই না করেছে।

মেরী আর ড্যানিয়েলসন অনেক কষ্টে ওদের উত্তেজনা, বিস্ময় ঠাণ্ডা করে কাজে লাগলেন।

বললেন, আগে কাজ কর। পরে মজা দেখ। নাও, জল গরম কর তো।

যেই বলা, আর অমনি কাজ শুরু করলে ওরা। যেন ফিষ্টি করছে, তেমনি হৈ-চৈ করে ওরা মহা উৎসাহে আগুন জ্বালাতে লেগে গেল।

হঠাৎ টিনোরুয়া মেরীকে ডাকতেই, মেরী ভিতরে ঢুকে গেলেন। তারপর মিনিট পাঁচেক পরে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ফিরে এলেন।

বললেন, হয়ে গেছে। জল, গরম জল কই? আন শিগগির।

গরম জল? এই শিগগির গরম জল আন। এদিক থেকে ক-জন হৈ-হৈ করে উঠল।

বাইরে থেকে আরও ক-জন মহা উৎসাহে জবাব দিল, হচ্ছে হচ্ছে। সবুর। গরম হলে তো নিয়ে যাব। এই কাঠ আন, নারকেলের ছোবড়া আন বেশী করে। আগুনটা উস্কে দে। নানারকম হাঁক-ডাক শুরু হল বাইরে।

এদিকে অপেক্ষা করার সময় কই? যা লোক এরা, মেরী ভাবলেন, হয়ত নোংরা জলই বাচ্চাটার গায়ে ঢেলে দেবে। তাই আর কিছু না পেয়ে তিনি এক বোতল নারকেল তেল টেনে নিয়ে তাই দিয়েই নবজাত শিশুটিকে পরিষ্কার করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হামাউ আর তার মেয়েটাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। দুজনেই বেশ সুস্থ আছে।

আর কিছু করার নেই দেখে ওরা দুজন বাসায় ফিরে গেলেন।

ঘণ্টা কয়েক বাদে ড্যানিয়েলসন আর মেরী হামাউ-এর খবর নিতে এলেন।

ওদের দেখেই হামাউ উঠে বসে বলল, বাচ্চাটা খেতে আরম্ভ করেছে জান।

সত্যিই তাই। ওরা দেখলেন, টিনোরুয়া মেঝেতে বসে। তার কোলে বাচ্চাটা। আর টিনোরুয়ার হাতে একটা দিব্যি বড়-সড় ঘাসের ডগা।

কি ব্যাপার, ওকে ঘাস খাওয়াচ্ছ নাকি ?

টিনোরুয়া হেসে বলল, না। ঘাসের ডগায় করে ফোঁটা ফোঁটা চিনির জল ওর মুখে দিচ্ছি।

মেরী আর ড্যানিয়েলসন অনেকক্ষণ ধরে শিশুর খাদ্য, পুষ্টি, যত্ন, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত কী তা ওদের বুঝিয়ে বললেন, শিশুর খাওয়া-দাওয়ার দিকে সাবধান হয়ে নজর দেওয়া উচিত। যা-তা খাওয়ান উচিত নয়।

টিনোরুয়া গভীর মনোযোগ দিয়ে সব শুনল। তারপর বলল, কিন্তু এইটুকুন বাচ্চা তো আর হাতি ঘোড়া খাবে না। কাজেই চিনির জল ছাড়া আর খাবে কি ? বলে সবাই মিলে হাসতে শুরু করে দিল। হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে আর কি ?

টিনোরুয়ার মা-বুড়ি সব শুনছিল।

সে হঠাৎ বলল, তোমরা সব বিষয়ে বড় বেশী উতলা হও। বাচ্চা হবে একটা, তার জন্য হ্যান চাই, ত্যান চাই, গরম জল চাই। এত বায়নাক্কা কিসের ? আমাদের আমলে কি করা হত, জান ? যেই বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হত, অমনি তাকে লেগুনের জলে নিয়ে গিয়ে বেশ করে ধুয়ে-পাকলে আনা হত।

বল কী ! মেরী আঁতকে উঠলেন। মারা পড়ত না !

বুড়ি শান্তভাবে বলল, তা মরত, অনেকে মরে যেত। তোমাদের দেশে কি লোক মরে না ?

মেরী চুপ। ড্যানিয়েলসন একবার ভাবলেন বলি, যে সেই জন্যই তোমাদের এখানে শিশুমৃত্যুর হার এত বেশী। হিসেব দেখিয়ে তিনি বলতে পারতেন, ইংলণ্ডে যেখানে জন্মাবার পর হাজারটা শিশুর মধ্যে মরে মাত্র তিরিশটি, সে জায়গায় তোমাদের মরে দুশো কুড়িটি। কিন্তু ভেবে দেখলেন, এসব বলা পণ্ডশ্রম। হয়ত বলে বসবে, এতে আর কি হয়েছে, বাকী সাতশ আশীটি তো বাঁচবে? তবে আর কি, তাদের নিয়েই আমাদের দিব্যি চলবে।

মিল নেই। সভ্যজগতের আচার-আচরণের সঙ্গে এই রারোইয়াবাসীদের কোথাও মিল নেই এতটুকু। শিশুটি জন্মাল। বছর দুই তিন থাকল বাবা মায়ের কাছে। তারপরেই শুরু হল এই শিশুদের জীবনে এক গুরুতর পরিবর্তন। পুষ্যি দেওয়া শুরু হল। আমাদের দেশে যে শিশু যে ঘরে জন্মায়, সেটাই তার বরাবরকার ঘর। সেই তার বাপের বাড়ি। কিন্তু রারোইয়াতে তা নয়। শিশু একটু বড় হল কি, তাকে একজন পুষ্যি নিল। এই পুষ্যি-বাপের বাড়িই তখন শিশুর নিজের ঘর হয়ে দাঁড়াল। এই দস্তুর এখানে। আমাদের দেশে পুষ্যি নেয় কে? যে নিঃসন্তান, সে। অগাধ পয়সা, বিরাট বংশ অথচ বংশধর নেই। জন্মাল না। নাও, বংশ রক্ষার জন্য অন্য ঘর থেকে সুলক্ষণযুক্ত এক ছেলে আন। তবে এ ব্যাপারও আমাদের দেশে হামেশা ঘটে না। ক্বচিৎ কখনও ঘটে।

কিন্তু রারোইয়াতে তা নয়। বংশধর একটা কেন, এক কুড়ি ঘুরছে পিলপিল করে। তবুও এরা পুষ্যি নেয়। এই নিয়ম। তোমার ছেলে আমি পুষ্যি নিলাম। আমারটা নেবে সে, আর তারটা নেবে তুমি। এতে গোলমাল হবার কোনো আশঙ্কা নেই। তোমার যাকে খুশি, যতগুলি খুশি, তুমি পুষ্যি নাও। কেউ কিছু বলবে না। তোমার লাভ কি? না তোমার পসন্দসই

জিনিস তুমি পাচ্ছ। তোমার ঘরে যা জন্মায় তা তোমার পছন্দ নাও হতে পারে। ঈশ্বর তোমার ঘাড়ে যা চাপাবেন—কানা হোক, খোঁড়া হোক, খ্যাঁদা হোক, তার আওয়াজ তোমার ভাল লাগুক আর না লাগুক, যেহেতু সে তোমার ঘরে জন্মেছে, তুমি তার বাপ, কি তুমি তার মা, তাকে নিয়েই তোমার ঘর করতে হবে। এ নিয়ম সভ্যদেশের। সেখানে এ বালাই নেই। তোমার ঘরে যে ছেলে জন্মাল, তাকে অন্যের হয়ত ভাল লাগল। সে তখন তাকে পুষ্যি নিয়ে নিল। এতে তোমারও লাভ। আর সেই শিশুর তো ডবল লাভ। তার দুটো বাবা, দুটো মা, দুটো বাপের বাড়ি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। থাক, যেখানে খুশি, এ বাড়িতে যতক্ষণ ভাল লাগে, এখানে থাক, খারাপ লাগলে ও বাড়ি চলে যাও। শিশুর দায়িত্ব দুজনেরই, অথবা কারোরই নয়।

বরং শিশুর ঘাড়েই এরা দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে। আর তা দেয়ও চাপিয়ে। যেই তিন বছর বয়েস হল কারো, অমনি তাকে ঘরের কাজে লাগিয়ে দিল ওরা। আর কিছু না পার বাপু, তো অন্তত ঘরখানা ঝাট দাও। চার পাঁচ বছরে যেই পড়েছ, যাও জল আন। আর আট বছরে যে পড়ল, সে তো রীতিমত বড়ই হয়ে গেল। ঐ বয়সের মেয়েরা কাপড় কাচে, রান্না করে আর ছেলেরা নারকেল পাড়ে, নারকেলের ছোবড়া ছাড়ায়, শাস বের করে, শুকোয়। বাপদাদার সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়েই সব কাজ করে। গ্রাম উজাড় করে বাপমা-রা যখন দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যায়, কাজের সন্ধানে বড়রা যখন পনের কুড়ি দিনও বাইরে কাটিয়ে আসে, তখন গ্রামগুলোতে এই বয়সের ছেলে-মেয়েরাই সংসার আগলায়। বুড়োবুড়িদের দেখে, বাচ্চাকাচ্চা-গুলোর হেফাজত করে।

রারোইয়াবাসীরাও এদিক থেকে বড় যুক্তিপ্রবণ। বয়েস যার যাই হোক না কেন, কাজ করছে তো বড়দের মতন, ব্যস,

ওদের সঙ্গে বড়দের মতই ব্যবহার কর। ওরা তাই করে। সংসার, জীবন, নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে ওরা ছোটদের সঙ্গে বড়দের মতই খোলাখুলি আলোচনা করে। আর তাই বোধ হয়, রারোইয়ার শিশুরা শৈশব থেকে একেবার সোজাপথে যৌবনে প্রবেশ করে।

অথচ শৈশব থেকে যৌবনে আসতে আমাদের সভ্যজগতের অধিবাসীদের কি নাকানি-চোবানিই না খেতে হয়। বয়ঃসন্ধি আমাদের জীবনে এক বড় কঠিন কাল, বড় সংঘাতসঙ্কুল সময়। সে সময় বাল্যের সবলতা আমরা হারিয়ে ফেলি, যৌবনের রহস্যঘেরা জীবনে পৌঁছবার পথ নানা বাধানিষেধেব আলো-আঁধারিতে আবছা হয়ে থাকে। সোজা পথের হদিশহাবা যাত্রী আমরা, সভ্যবা, নানা জটিলতায় জড়িয়ে পড়ি, নানা বিকারে আক্রান্ত হই।

এই জটিলতার, এই বিকারের হাত থেকে বাবোইয়ার শিশুরা মুক্ত। আর শিশুকাল থেকে মুক্ত বলেই, ভবিষ্যৎ-জীবনে রারোইয়াবাসীরা এত সবল, এত নির্ভয়, এত দায়িত্বহীন, এত খেয়ালখোলা। আমাদেব চোখে এত অদ্ভুত।

৫

রারোইয়াতে খবরের কাগজ নেই। প্রতি ববিবাবে তাই পাত্রপাত্রী কলমে সর্বগুণসম্পন্না সযৌতুক কন্যার লোভনীয় বিজ্ঞাপন রারোইয়াবাসীরা পড়তে পায় না। ঘটকও নেই। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘোটক মেলাবার চেষ্টাও কেউ কবে না। তবে রাবোইয়াতে কি করে বিয়ে হয়?

কি করে হয়, শুনবেন? টেফাউ তার স্ত্রী মারুর দিকে চাইল। ওর মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। মারুর হাসি কিন্তু এত সহজে বাঁধ মানল না। খিলখিল করে সে হেসে উঠল। ওর হাসির

ছোঁয়াচ লেগে টেফাউ-এর হাসির ব্লাশ গেল ছুটে। 'তারপর চলল দমকা হাসির পাল্লা। এ হাসে, সে হাসে। পাড়াপড়শি যারা পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারাও দুদণ্ড এসে দাঁড়াল, তারপর খানিক হাসি যুগিয়ে যে যার পথে চলে গেল।

খানিক পরে হাসি থামিয়ে টেফাউ বলল, বিয়ের কথা শুনবেন? তবে আমাদের ব্যাপারটাই শুনুন। ঐ যে দেখছেন মারু, আমার বউ, ও তো আমার দাদাকে বিয়ে করতে গিয়েছিল।

কিন্তু মারুর বাবা মা তাতে রাজী ছিল না। টেফাউ-এর দাদাকে তাদের পছন্দ হয় নি। কিন্তু তাদের পছন্দ না হলে কি আসে যায়? বিয়ে তো কববে মারু। তার পছন্দ কাকে? সে কাকে চায়? মারুর বাবার ইচ্ছে ছিল টেমাকের ছেলের সঙ্গে মারুর বিয়ে দেয়। টেমাকে গ্রামের এক বড় মহাজন। পয়সা বল, পজিশন বল, সবই তার আছে। তারই ছেলে। পাত্র তো খারাপ নয়। কিন্তু সে পাত্র ভাল হোক মন্দ হোক তাতে মারুর কি? সে তো তাব মন প্রাণ সব টেফাউ-এর দাদাকে সঁপে দিয়ে বসে আছে।

মারু কারো কথা শুনল না। টেফাউ-এর দাদার সঙ্গে একদিন বেরিয়ে গেল। তারপর দুজনে স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসবাস করতে লেগে গেল। এটা হল ট্রায়াল।

কোট বানাতে গিয়ে দর্জির দোকানে ঢুকলেন, গায়ের মাপ দিলেন, আর তার পরদিনই দোকানে গিয়ে কোটটি নিয়ে এলেন —এ কখনও হয়, না হয়েছে? ট্রায়াল দিয়ে না দেখে কোনো দর্জিই আপনাকে কোট বানিয়ে দেবে না। কোট, বিশেষ করে গরম কোট একটি টেঁকসই বস্তু। একটি বানালেন তো পাঁচ দশ বচ্ছর চলল। কাজেই ঠিকমত ফিট যদি তা না করল তো যতদিন ও কোটের পরমায়ু ততদিন ধরেই মন খচখচ।

রারোইয়াবাসীরা বিয়েটা কোটের মতই টেঁকসই বলে

মনে করে। তাই পাকাপাকি বিয়ের আগে, ওরা ট্রায়াল বিয়ে করে।

ট্রায়াল বিয়ে! বিয়ের আবার ট্রায়াল কি?

যে কোনও রারোইয়াবাসী, শুধু রারোইয়া কেন, পলিনেসিয়ার যে কোনওখানে যে কোনও লোককেই যদি ও প্রশ্নটা করে বসেন, তবে সে নির্ঘাত আপনাকে একটা বিলাতী বাঙাল ঠাউরে বসবে।

চোখ বড় বড় করে সে খানিকক্ষণ আপনার দিকে চেয়ে থাকবে তারপর বলবে, ট্রায়াল না দিলে ও বৌ-এর সঙ্গে ভবিষ্যতে আমার বনবে কি বনবে না, বুঝব কি করে? দূর থেকে কি মানুষ চেনা যায়? মেয়েমানুষ চেনা তো আরও শক্ত। আমরা আসল ঘর বাঁধবার আগে তাই নকল ঘর বাঁধি। ভাঙলে নকল ঘরই ভাঙে এখানে। আসলের গায়ে আঁচড়টি লাগে না।

টেফাউ বলল, বুঝলেন, মন বোঝা বড় শক্ত। আজ যা আপনার চোখে লাগছে, মনে ধরছে, কালই দেখলেন (যেই মন ঘুরে গেছে) তাতে আপনার আগ্রহ নেই ছিটে-ফোঁটা। যে জুতো পায় লাগে না, তা একদিন আপনার খুব প্রিয় থাকলেও তখন কি তার দিকে আর ফিরেও তাকান? তবে?

কার মনের সঙ্গে আমার মন বাঁধা পড়বে, কে আমাকে আশ্রয় দেবে বরাবরের মত, আমরা জীবন ধরে তাই খুঁজি। যেদিন পেয়ে যাই, সেইদিন থেকেই আমাদের সব ছোটাছুটিব শান্তি হয়। আমার যে মনের মানুষ সেই আমার সঙ্গিনী। সে অন্য কারও স্ত্রী হলেও ক্ষতি নেই। কার সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছে, আমাদের কাছে সেটা বড় কথা নয়, কার সঙ্গে কার মন মিলেছে, সেইটে হল বড়।

টেফাউ বলল, এই মারুর কথাই ধরুন, এক বছরের উপর ও আমার দাদার সঙ্গে বাস করেছে। কি গভীর প্রেম ছিল ওদের। গ্রামের লোক খুশী হত ওদের দেখলে। তাদের বৈঠকে মজলিশে

চলত ওদের নিয়ে আলোচনা। মারুর বাবা মা পর্যন্ত খুশী হয়ে ওদের পাকা বিয়েতে মত দিল। উৎসবের সূচনা হল গ্রামে। গান বাজনা নাচে মেতে উঠল গ্রাম। আমি তখন তাহিতিতে। অনেকদিন দেশ ছাড়া। যখন আমি তাহিতি যাই, তখন মারু ছোট, আমিও ছোট। দাদার বিয়ে। আমাকে তাহিতিতে খবর পাঠাল, গ্রামে আসতে। নিতবর হতে হবে। খবর পেয়ে এলাম।



জাহাজঘাটে টেফাউ-এর দাদা ছিল মারুকে নিয়ে। বিকালের আলোটায় সেদিন যেন কি ছিল। কি যেন ছিল বাতাসটায়। টেফাউ-এর মনে হল, এমন আলো, এমন সুন্দর আর নরম আলো, সে আগে আর দেখে নি। তার মনে হল এমন বাতাস, এমন স্নিগ্ধ আর কোমল বাতাস, সে আর কখনও দেখে নি।

টেফাউ বলল, আর আমার মনে হল, এমন মেয়েও আমি আর দেখি নি। কখনও দেখি নি। মারু যখন আমার দিকে চাইল, (কী সুন্দর চোখ দুটো!) আমার মনে হল, ওর চোখ দুটো যেন বলল, কী আশ্চর্য! এতদিন কোথায় ছিলে! আমি তো তোমারই প্রতীক্ষা করছিলাম।

তারপরেই হল আসল মজা। মারুর বাবা মা চেয়েছিলেন, মারুর বিয়েটা খ্রীষ্টানী মতে হোক। গ্রামের লোকেরা বলল, কি দরকার। বিয়েতে মন্তর-তন্তর পড়া হল কি হল না তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সেটা খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়-যন্ত্রের দিকে ঘামাও। মোদ্দা ভোজটা যেন ঢালাও হয়।

কিন্তু মারুর বাবার বড় ইচ্ছে সাহেবি মতে বিয়েটা হয়। তাই বিয়ের দিন সাজপোশাক পরে সব চলল গির্জায়।

টেফাউ বলল, কিন্তু ঐ গির্জা পর্যন্ত যাওয়াই সার। গির্জার বাইরে লোকজন সব জড় হয়েছে। হৈ হুল্লোড় গল্পে সবাই মশগুল। আর সেই ফাঁকে আমি আর মারু দে চম্পট।

খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। টেফাউ-এর দাদা, মারুর বাবা কাকা আত্মীয় স্বজন তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোথায় টেফাউ? কোথায় মারু? তাদের টিকিটিরও সন্ধান কেউ পেল না।

ধীরে ধীরে আত্মীয় স্বজনরা, যারা দ্বীপ-দ্বীপান্তর থেকে বিয়ে দেখতে এসেছিল তারা বিয়ের বদলে তার চেয়েও এক মজা দেখে ডবল খুশী হয়ে ফিরে গেল। মারুর বাবা মায়ের উত্তেজনা থিতিয়ে এল। টেফাউ-এর দাদার রাগও পড়ে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন গ্রামের লোক আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল মারু আর টেফাউকে দেখে। কাছাকাছি কোন এক দ্বীপে ওরা যেন লুকিয়ে ছিল। খুব ধুমধাম করে ভোজের আয়োজন শুরু হল। টেফাউ-এর দাদা ভাইয়ের পিঠ থাবড়ে বলল, সাবাস ভাই, আচ্ছা কাম কিয়া।

টেফাউ মারুর দিকে চেয়ে বলল, পাঁচ বছর কেটে গেল এর মধ্যে। কিন্তু মনে হয় যেন গতকাল আমরা ফিরেছি, সেই ছোট্ট লুকান দ্বীপটা থেকে। আশ্চর্য সে জায়গা। স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। টেফাউ একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ টিপ্পনি কাটে, সবই তো হল কিন্তু আফসোস যে গির্জার বিয়েটা আর মারুর কপালে জুটল না।

এই কথার পর দুজনেই খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

৬

এই যে নারকেল বন দেখছ এরই মায়ায় আমরা, রারোইয়াবাসীরা বাঁধা পড়ে আছি। এই নারকেল আমাদের খাদ্য যোগায়, বস্ত্র যোগায়, এই নারকেলই তো আমাদের জীবন। আর এর জল

খাই, তৃষ্ণা মেটে। শাঁস খাই, ক্ষিদে মেটে। কাণ্ড দিয়ে ঘরের খুঁটি বানাই, পাতা দিয়ে চাল ছাই। ছোবড়া থেকে আঁশ বার করে তা দিয়ে ঘাগরা বানাই, পরে পরে মেয়েরা বাঁচে। নারকেলের শাঁস শুকিয়ে রাখি। দেশ-বিদেশ থেকে মহাজন এসে কেনে। আমরা কাঁচা পয়সার মুখ দেখি। গাছে নারকেল আর জলে মাছ, এ যতদিন আছে, ততদিন রারোইয়াও আছে। এ নেই, তো রারোইয়াও নেই।

টাপাকিয়া খর রৌদ্রে এক ছায়াশীতল নারকেল বীথিকায় বসে নারকেল ছাড়াচ্ছিল। আব ড্যানিয়েলসনের সঙ্গে গল্প করছিল।

টাপাকিয়া রারোইয়ার কথাই বলছিল বটে, কিন্তু শুধু রারোইয়া কেন, পলিনেশিয়ার সব জায়গা সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে। পলিনেশিয়ার প্রধান পণ্যই হচ্ছে শুকনো নারকেলের শাঁস। সভ্য জগতের বাজারে এই শুকনো শাঁসের চাহিদা খুব। উদ্ভিজ্জ তেল না হলে সাহেবদের রান্না অচল, সাবানের কারখানা একদিনও চলে না।

নারকেলের মধ্যে যে গুণ আছে, রারোইয়াবাসীরা তা জানত না। এখনও যে পুরো জানে, তাও না।

আগে ওরা নারকেল পাড়ত। তার জল, দুধ আর শাঁস খেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করত। নারকেল যে এমন লাভজনক পণ্য, এ ওদের মাথায় কখনও আসে নি।

খুব বেশী দিন নয়, শ-খানেক বছর বড় জোর হবে, বিদেশী মহাজনের নজর পড়ল এদিকে। পাল খাটান জাহাজ এল দ্বীপ-দ্বীপান্তর ঘুরে। রংদার চটক, চমক লাগান সওদা-মুগ্ধ হল মেয়েরা। কেনাকাটার ধুম পড়ল। নিচ্ছ তো এসব সামগ্রী, এর বদলে কি দেবে? কি আছে তোমার, আন।

টাকা-পয়সা কাকে বলে রারোইয়াবাসীরা তখন তা জানত না। বিদেশী মহাজন, তারাও অতি ঘুঘু। তারা টাকা-পয়সা চায় নি।

টাকা? টাকা চাই নে। আমরা চাই মুক্তা। আছে? আমরা চাই শুক্তি। আছে? আন, আন। ঐসব জিনিস, যা তোমাদের কাজে লাগে না, তাই আন। মুক্তা যদি দাও, তবে এই অমূল্য জিনিস, এই টকটকে লাল অপূর্ব পুতির মালা ছড়াটি তোমায় দেব। পরে ছাখ। গলায় পর। হ্যাঁ, ছাখ তো, কি সুন্দর তোমায় ছাখায়।

এসো, এসো বনসুন্দরী, কে কোথায় আছ, এসো। ফুরিয়ে গেল মাল। মালা নাও, রেশমী চুড়ি নাও। মদ নাও, ছুরি, কাঁচি, থালা, বাটি, যা প্রাণ চায়, বেছে নাও।

জিনিস-ঠাসা জাহাজ দ্বীপে দ্বীপে এইভাবে আসে আর খালি হয়। এসব জায়গা থেকে জাহাজে মুক্তা, শুক্তি, প্রবাল, স্পঞ্জ বোঝাই হয়।

ক্রমে মুক্তা ফুরায়, শুক্তির বাজারে মন্দা পড়ে, প্রবাল, স্পঞ্জ ভাল বিকায় না। মহাজনদের শকুনি চক্ষু এদিকে-ওদিকে সর্বদা ঘোরে। আর কি আছে এদের? কি আর নেওয়া যেতে পারে এখান থেকে?

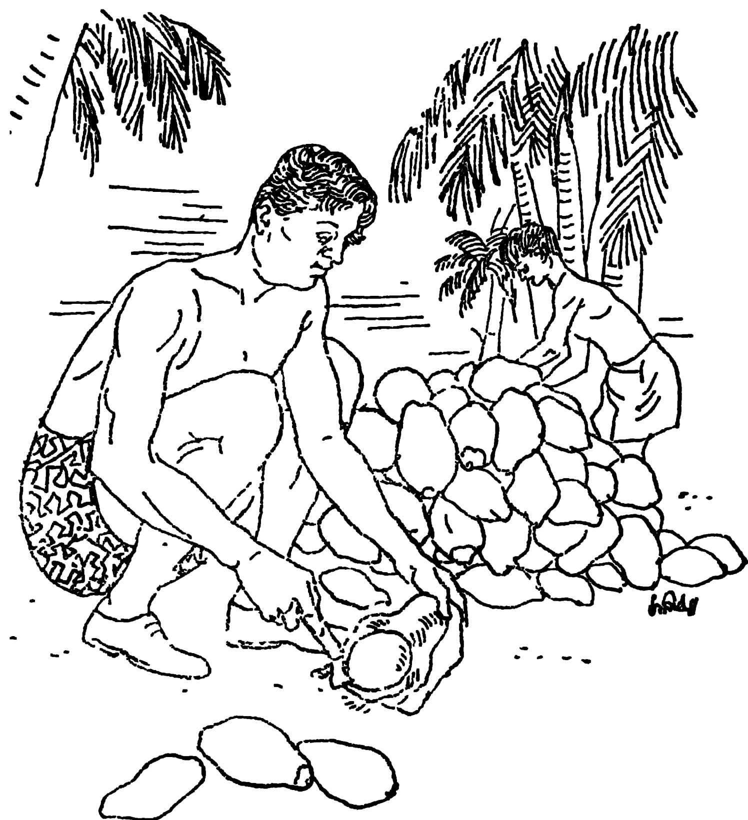
হঠাৎ নজর পড়ে নারকেলের উপর। আরে, তাই তো। এ তো অফুরন্ত। নারকেলের তেল, বাজারে তো তার আর মার নেই। নাও, নাও, জাহাজ ভর।

কিন্তু নারকেলের-তেল বানানোয় নানান হাঙ্গামা। একটা প্রায় পাঁচসেরি নারকেল ছাড়াতে ছাড়াতে টাপাকিয়া বলল। অবিশ্যি তেল ভালভাবে তৈরি করতে পারলে বেশ মোটা পয়সাই পাওয়া যায়। কিন্তু এতেই যখন চলে যাচ্ছে, তখন ভুয়ো ঝামেলা আর করা কেন?

শুধু যে পরিশ্রমের ভয় তা নয়, নারকেল থেকে ভালভাবে তেল কি করে বের করতে হয়, এরা সে কায়দাটাও জানত না। করত কি, শাঁসটা প্রথমে বের করে নিত, তারপর সেগুলোকে কোনমতে

থেঁতলে বারকোসে করে রোদে ফেলে রাখত। এই করেই যেটুকু তেল বের করতে পারত, তাই বেচত।

মহাজনরা দেখল, এতে অনেক তেল অপচয় হয়। তাই ওরা তেল কেনা ছেড়ে দিয়ে শুকনো শাঁস কিনতে লাগল।



টাপাকিয়া একগাল হেসে বলল, আর আমরাও বেঁচে গেলাম। এখন আর ঝামেলা নেই কিছু, কোনো ঝঞ্চাট নেই। নারকেলটা হাতে করে তোল, তারপর এই মার এমনি করে এক গুঁতো।

টাপাকিয়া যেন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোবড়া ছাড়ানর ক্লাশ নিচ্ছে, এমনি সিরিয়াস হয়ে ব্যাপারটা ড্যানিয়লসনকে হাতে-কলমে দেখাতে লাগল।

ওদের নারকেল ছাড়ানর কায়দাটা বড় অদ্ভুত। একটা চোখা বাখারি মাটিতে পোঁতা থাকে। নারকেলটা নিয়ে টাপাকিয়া জোরে তার উপর গুঁতো মারল। সঙ্গে সঙ্গে নারকেলের গা থেকে প্রায় অর্ধেক ছোবড়া বেরিয়ে এল। দুই টানে সে বাকী অর্ধেকও পরিষ্কার করে ফেলল। তারপর ছাড়ান নারকেলটা গাদায় ফেলে একটু হেসে বলল, দেখলে? একেবারে জলের মত সোজা। এইবার একটা দা কি টাঙ্গি, যাহোক কিছু নাও, আর চালাও কোপ। কোনও ঝামেলা নেই। দু ফাঁক হয়ে যাবে ফলটা। থাক পড়ে ওখানেই পাঁচ-সাত দিন। রোদে শুকাক, তারপর দেখো, ছুরি দিয়ে চাড় দেব, আর ফুস-ফুস করে মালা থেকে শাঁস বেরিয়ে আসবে। তখন বস্তায় পুরে রাখ। তারপর মহাজন এলে টাকা নাও, আর মাল দাও।

টাপাকিয়া হঠাৎ বলল, আমাদের কাজের মরশুম তো এসে গেল। এই তো আর ক-দিন পরেই খ্রীষ্ট-পরব। ফুর্তি-টুর্তি খুব জমবে। তার ক-দিন পরেই তো আমরা বেরিয়ে পড়ব দ্বীপ-দ্বীপান্তরে, যার যেখানে জমি আছে। নারকেল ছাড়াবার সিজিন এসে গেল কি না। যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে? গেলে নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।

ড্যানিয়েলসন তক্ষুনি রাজী। কিন্তু যত সহজে রাজী হলেন তিনি, তত সহজে যেতে পারলেন না। রারোইয়াবাসীদের জায়গা থেকে নড়ান শক্ত। মাসখানেকের মত বাইরে যাওয়া, খেলা কথা নয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, আড্ডা এসব ফেলে যেতে সময় একটু লাগে বইকি।

খ্রীষ্ট-পরব গেল। যাব যাব রব উঠতে না উঠতেই হয়ত গ্রামে বিয়ে বেধে গেল। ফুর্তি ফেলে কাজ? অমন কাজের মুখে রারোইয়াবাসীরা সর্বদাই ঝাড়ু মেরে থাকে। বিয়ের ফুর্তিও চুকল, এইবার? এইবার এইবার, আর কি, কাজ? কাজে চল।

হ্যাঁ চল। চল চল করতে করতে অন্য জায়গা থেকে হঠাৎ কারও বাড়ি কুটুম্ব এসে গেল। কাজেই কুটুম্বের খাতিরে যাওয়াটা আবার পিছিয়ে দিতে হল। গ্রামে লোক এলে এখন কি করা? তাকে ফেলে তো আর যাওয়া যায় না। কাজ তো ভদ্রতা থেকে বড় নয়। শেষ পর্যন্ত একদিন কুটুম্বও বিদায় নিলেন। এদিকে শুকনো শাঁসের সন্ধানে এসে জনা দুয়েক মহাজন শূন্য হাতে ফিরে গেল। তাদের মুখেই শোনা গেল, এবার নাকি আমদানী খুব হবে। কাজেই আগে বাজারে মাল আনতে না পারলে দাম যে নেমে যাবে।

চল হে চল, আর দেরি নয়। মহাজনের কথা শুনলে তো সব। যাই যাই আবার শুরু হল। এমন সময় গ্রামে একজন একটা ব্যাটারী-সেট রেডিও এনে ফেললে। ব্যস। নতুন যন্ত্রটা নিয়ে গ্রামসুদ্ধ সবাই মেতে গেল। নাচ গান খাওয়া ফুর্তির তোড়ে আরও দু-চারজন মহাজনের সদুপদেশ কোথায় ভেসে গেল। দুত্তোরি তোর শাঁসের দাম। নামছে তো নামুক। নেমে রসাতল পর্যন্ত যাক, তারপর দেখা যাবে। এখন বাজে কথা ছেড়ে গান হোক।

ড্যানিয়েলসনের কাছে অনুরোধ আসে, ঘোরাও তো চাবি। সেই 'কাউ-বয়' গান শুনি। আহা, কি খাসা গান!

ড্যানিয়েলসন হতাশ হয়ে রেডিওর চাবি ঘোরাতে লাগলেন। ওদের কাজকর্ম দেখবার আশা মন থেকে মুছেই ফেললেন প্রায়।

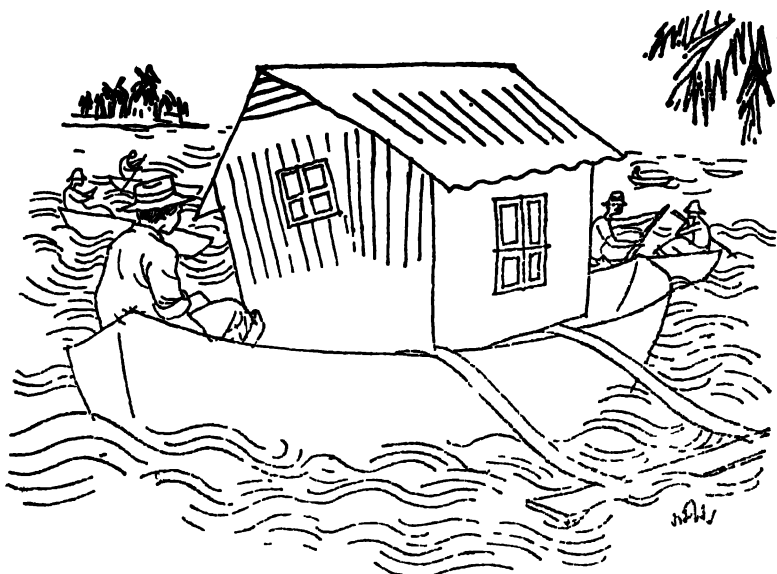
হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় রাউরি এসে হাজির। বলল, কাল ভোরে আমরা রওনা দিচ্ছি। যাবে তো তৈরী হয়ে থেকো। টাপাকিয়ার নৌকোয় আর একটুও জায়গা নেই, বাড়িটা অব্দি নিয়ে যাচ্ছে কি না। তাই বলল, তোমাকে আমার নৌকোয় যেতে।

বাড়িটা নিচ্ছে! কোথায়! ড্যানিয়েলসন তো রাউরির কথা শুনে তাজ্জব।

রাউরি বলল, কোথায় আবার? যেখানে কাজ করতে চলল, সেখানে।

আস্ত বাড়ি নিয়ে চলল? কেন, ব্যাপারটা কি?

আরে ওর কথা ছেড়ে দাও। খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রাউরি বলল, ব্যাটা কুঁড়ের বাদশা। পাছে নতুন করে সেখানে আবার বাড়ি বানাতে হয়, তাই এখানকারটা তুলে নিয়ে চলল। একথা নিয়ে ওকে কিছু বললেই বলে, বাড়ি যখন একটা আছে,



একবার যখন পরিশ্রম করে বানাতেই হয়েছে, তখন বার বার বাজে পরিশ্রম না করে সেই বাড়িখানা নিয়ে যাওয়াই তো ভাল।

পরদিন ভোরে ড্যানিয়েলসন আর মেরি টেরেসা তাড়াতাড়ি রাউরির নৌকোয় গিয়ে চাপলেন।

সমুদ্রের নীল জলটুকু কোথায় গেল? অবাক হলেন ড্যানিয়েলসন! এ যে কালো হয়ে উঠেছে নৌকোয় নৌকোয়। অজস্র ডিঙি জলে ভেসেছে। গ্রামে শক্ত-সমর্থ আর কেউ নেই। শুধু বুড়ো-বুড়িরা থাকল আর থাকল কচি বাচ্চারা। তাছাড়া

আর সবাই ভেসে পড়েছে জলে। গীটারের বাগু আর সমবেত পলিনেশীয় সুরে সেই ভোরের বাতাস ভরে উঠেছে। একটু একটু করে রারোইয়ার তীর দূরে সরে যাচ্ছে। সারি বাঁধা নারকেল চারাগুলো পাতা দুলিয়ে দুলিয়ে বিদায় দিচ্ছে। মাথা নুইয়ে নুইয়ে যেন প্রার্থনা করছে, ফিরে আয় বাছারা, ভালোয় ভালোয়, ফিরে আয়।

ড্যানিয়েলসনের চোখ আবেশে বুজে আসে। এই দৃশ্যের বুঝি তুলনা নেই। এমন সুন্দর দৃশ্যও বুঝি তাঁর চোখে আর পড়ে নি।

টারাকেহা বলে উঠল, ছাখ, ছাখ, রারোইয়া আমাদের কেমন ডাকছে ছাখ।

ইহি বলল, ঐজন্যেই তো কোথাও গিয়ে থাকতে পারি নে বাপু। চলে আসতে হয়। কত কাজ তো করলাম। কতবার পালিয়ে গেলাম। কিন্তু বার বার ফিরে আসতে হয় ওর কাছে। রারোইয়া যাছু জানে।

সবাই পরিবারবর্গ নিয়ে চলেছে। কিন্তু হিয়াও চলেছে একা। নৌকোর একপাশে চুপ করে বসে আছে। জিনিসপত্রও বেশী কিছু আনে নি।

ড্যানিয়েলসন জিজ্ঞাসা করতেই হিয়াও বলল, আমি ওদের মত ওসব জিনিস আনতে ভালবাসি নে। নারকেল-শাঁস বার করবার একটা ছুরি, একটা মাছ ধরবার বর্শা, একটা টাঙ্গি, আর একজোড়া প্যান্ট। ব্যস, আর কি চাই।

চুপ করে হিয়াও কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর এক সময় একটা খোসা ছাড়ান নারকেল তুলে নিয়ে বলল, আজ আমরা এই নারকেল ছাড়া কিছু ভাবতেই পারি নে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন এ জিনিসটাই ছিল না। কি করে নারকেলের জন্ম হল সে গল্প জান ? বলি তবে শোন। এই দেশে তখন ছিল খালি আগাছা আর ঘাস আর ঝোপ। এত লোকও ছিল না তখন। ছিল খালি

টুনা আর তার বউ হিনা। ওরা বর্শা দিয়ে মাছ মারত আর তাই খেত। হিনা কিন্তু তাতে সুখী ছিল না। খালি কাঁদত আর বলত, কি দেশ এটা, খাবার পাওয়া যায় না। জল নোনা। তা খাওয়া যায় না। যদি আমার ছেলেপুলে হয়, কি খেয়ে বাঁচবে। টুনা বলল, কাঁদিস নে। তোর ছেলে হোক আগে, তার খাবার ব্যবস্থা করব। কিছুদিন পরেই হিনার ছেলেপুলে হল। টুনা একদিন বলল, আমি শিগগিরই মরব। মরলে পর আমার মাথাটা কেটে মাটিতে পুঁতে দিস।

কিছুদিন পরে টুনা মরল। আর হিনা তার মাথাটা কেটে টুনার কথামত পুঁতে দিল। কিছুদিন পরেই সেখানে এক সবুজ চারা বের হল। ক্রমে তা এক বিরাট গাছ হল। তাতে ফল ধরল অজস্র। হিনার ছেলেরা মিষ্টি জল, মিষ্টি দুধ খেয়ে তৃষ্ণা মেটাল, শাঁস খেয়ে ক্ষুধা দূর করল। তারপর অনেকদিন কেটে গেলে একদিন হিনা তার ছেলেদের কাছে গল্পটা বলল। ছেলেরা অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল, দূর তাও কি হয়? হিনা তখন ছোবড়া ছাড়িয়ে নারকেলটা বের করে বলল, এই ছ্যাখ তোদের বাবার সেই মাথা। এই ছ্যাখ তার দুই চোখ, এই ছ্যাখ মুখ।

হিয়াও নারকেলটা দেখিয়ে বলল, দেখছ, এই ছ্যাখ দুটো চোখ, এই ছ্যাখ মুখ।

ড্যানিয়েলসন দেখলেন, নারকেলের মালার মুখে সত্যিই তিনটে কালো বিন্দু।

৭

এই সময়টাতে গ্রামের চেহারা একদম বদলে যায়। সারা বছর গ্রামখানা যেন ঘুমিয়ে থাকে। দিনরাত সাগরবায়ু একটানা বয়ে চলে। নারকেল পাতার অবিশ্রান্ত সঙ্গীত প্রখর রৌদ্রকেও যেন অলস করে তোলে। ঘুম পাড়িয়ে দেয়। পলিনেশীয় দ্বীপ-

গুলির চরিত্রই এই। রারোইয়া কি টাকুমে কি অন্য যে কোনও দ্বীপেরও চরিত্র এই।

কিন্তু তা বলে রারোইয়া আর টাকুমে যে বছরের সব সময়েই এক রকম থাকে তা নয়। রারোইয়া রারোইয়াই থাকে। দিনের পর দিন সেখানে জীবনস্রোত শ্লথ মন্থর গতিতে বয়ে চলে। বাণিজ্য-বায়ু মাসের পর মাস একই নিয়মে প্রবাহিত হয়। বছরের পর বছর শান্ত নির্জন সাগর-সোহাগিনী রারোইয়া তার সন্তান সন্ততি নিয়ে তার নারকেল কুঞ্জের সম্পদ নিয়ে, তার স্বর্গীয় সৌন্দর্য নিয়ে, অনাদিকালের দিকে চেয়ে থাকে। চেয়ে চেয়ে সময় খসা দেখে।

টাকুমেও বছরের অধিকাংশ দিন তাই করে। কিন্তু এই সময়, এই শুক্তি তোলার মরশুমে তার চেহারা একেবারে বদলে যায়। কোথায় সেই ঘুম-ঘুম গ্রাম? কোথায় সেই আলস্যজড়িত বাসিন্দারা?

এই কি সেই টাকুমে? পথে পথে জনস্রোত। বিভিন্ন জাতীয় লোকের এক উন্মত্ত মেলা বসে গেছে। ঘুমন্ত গ্রামখানাকে কোন মায়াবী যেন যাদুমন্ত্রে জিইয়ে দিয়েছে।

শত শত পলিনেশীয় ডুবুরি এসেছে। শুক্তি তুলতে। তাদের সঙ্গে এসেছে অগণিত ইয়ারবন্ধু আত্মীয়। ডুবুরির রোজগারে ফুর্তি জমাবে। হোটেলঅলা এসেছে, মনোহারী দ্রব্যের কারবারী, শুক্তির ব্যবসায়ী, মদের দোকানদার, জুয়াড়ী, বারাঙ্গনা, সব এসে ঝাঁকে ঝাঁকে জুটেছে।

তাঁবু পড়েছে সারি সারি, অস্থায়ী ঘর উঠেছে। অজস্র আলোয় আলোয় সাজান হয়েছে পসরা। গান, বাজনা, নাচ, হুল্লোড়ে খানখান হয়ে ভেঙে পড়েছে স্তব্ধতা। গ্রামের পথে সাইকেলের ভিড় আর লেগুনের জলে অজস্র দেশী নৌকা। খান চারেক মোটরবোটও।

রারোইয়া থেকে একটা দল এসেছিল শুক্তি তুলতে।

ড্যানিয়েলসনও তাদের সঙ্গ নিয়েছিলেন। ব্যাপার দেখে তিনি তো অবাক।

টেহেই-এর নৌকাতে ওরা এসেছিলেন। পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। ওদের নৌকা যখন ঘাটে ভিড়ল, তখন এদিকে ফুর্তি বেশ জমে উঠেছে। বহু গ্রামোফোনে দোলানি গানের রেকর্ড বাজছে। গান শুনে দেহ দুলছে আর রমণীর কোমর জাপটে ধরে পুরুষগুলো তালে তালে পা মেলাচ্ছে।

গোটা জিনিসটাই যেন কেমন খাপছাড়া। পলিনেশীয় প্রকৃতির ধাতের সঙ্গে সমগ্র বিষয়টাই যেন কেমন বেমানান। এখানে এলেই যেন মনে এক অসুস্থ অতৃপ্তি জেগে ওঠে। চলাফেরা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোণে কোণে লোভ, আনাচে কানাচে মোহ যেন থাবা উঁচিয়ে শিকারের প্রতীক্ষায় আছে। ওদের কবল থেকে নিস্তার নেই।

না কারও নিস্তার নেই। পাহোয়া মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলল। পাহোয়া এই টাকুমে দ্বীপেরই অধিবাসী। এই যে এরা দলে দলে আসছে শুক্তি তুলতে। পয়সা করার স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে। জীবনপাত করে এরা পরিশ্রম করবে। দেখবে অতলে ডুব দিয়ে শুক্তি তুলে আনবে। টাকাও রোজগার করবে প্রচুর। কিন্তু আফসোস, সে টাকা ওরা এখানেই রেখে যাবে। এক আধলাও ঘরে তুলতে পারবে না। ওদের রক্তমাখা টাকা ওদের ভোগে আর কতটুকু লাগে? সব তো শুষেই নেওয়া হয়।

রক্তমাখা টাকা? সে কি?

পাহোয়া হাসল। তারপর বলল, কাল ওদের কাজকর্ম ছাখ, নিজেই বুঝবে।

ড্যানিয়েলসন দেখতেই তো এসেছেন। টুয়ামটু দ্বীপপুঞ্জের নাম এখন যেমন নারকেল শাঁসের জন্য ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি এককালে ছড়িয়ে পড়েছিল মুক্তার জন্য। যে শুক্তির ভেতর মুক্তা

থাকে তা সব পরিবেশে জন্মাতে পারে না। টুয়ামটু দ্বীপপুঞ্জে বাহাত্তরটি দ্বীপ আছে। কিন্তু গোটা বারো দ্বীপেই মাত্র শুক্তি জন্মায়।

পাহোয়া বলল, আর এই টাকুমে তার মধ্যে সেরা। তার মধ্যে সেরা। তার কারণ এখানকার পরিবেশ শুক্তি জন্মানর পক্ষে সব থেকে অনুকূল।

পাহোয়া চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল। লোকটিকে ভালই লাগছিল ড্যানিয়েলসনের। একটু বেশী কথা বলে হয়ত, তা বলুক, কিন্তু ক্লান্ত করে না।

সাহেবী স্টাইলের এক হোটেল বসে গেছে। বাড়িটা কাঠের। সুন্দর চকচকে সব আসবাব। টেবিল, সোফা, এম্ব্রয়ডারী করা পর্দা। কোথাও ক্রটি নেই এতটুকু। সেইখানেই, বারান্দার এক কোণে বসে পাহোয়া তার কাহিনী বলছিল।

ডুবুরিগিরি করা আমার পৈতৃক পেশা। আমার বাবা এখানে এসেছিলেন প্রায় ৯০ | ৯২ বছর আগে। কোনও বিদেশীর জীবন তখন এ অঞ্চলে নিরাপদ ছিল না। কিন্তু কেমন করে জানি বাবা মাতব্বরদের সঙ্গে খুব খাতির জমিয়ে নিলেন। শুধু তাই নয়, কিছুদিনের মধ্যেই এখানকার চালুঙ্গা পুরোহিতের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়েও হয়েও গেল। বাবাই প্রথমে এখানে শুক্তি তোলা শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি এই দ্বীপের সবাইকে ডুবুরীর কাজ শেখান। তখন বেশীর ভাগ শুক্তিতেই মুক্তা থাকত। কাজেই কাজটা ছিল মোটা রকম লাভের। দেখতে দেখতে টাকুমের মুক্তার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। দলে দলে জাহাজ এল। বাবা একেবারে ফুলে ফেঁপে গোল হয়ে গেলেন। ক্রমে আবার সেই মুক্তা বিরল হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত এই লেগুনের মুক্তা নিঃশেষই হয়ে গেল। তখন শুরু হল শুক্তির ব্যবসা। শেষে শুক্তিও ফুরিয়ে এল। প্রচণ্ড ঘা পড়ল এই দ্বীপের জীবন-

যাত্রায়। ডুবুরির কাজ করে যারা খেত, তাদের কেউ দেশ ছাড়লে, বাকী সবাই পেশা ছেড়ে ফিরে গেল আদিম জীবনযাত্রায়। জলে মাছ, ডাঙায় নারকেল। ব্যস্. আর কি চাই। টাকুমের সে নামটুকু হয়েছিল শুক্তির দ্বীপ বলে, সেইটে কেবল মুছে গেল লোকের মন থেকে।

পাহোয়া চুপ করল। বেশ রাত হয়েছে। ভারি সুন্দর বাতাস বইছে। হোটেলের বারান্দা থেকে লেগুনের যতটুকু দেখা যায়, তাতে রকমারি আলোর লম্বা ছায়া ঢেউয়ের দোলায় দোল খাচ্ছে। আলোর ছায়া কাঁপছে, ভাঙছে, নানা নতুন রেখার জন্ম দিচ্ছে। ড্যানিয়েলসন দেখলেন। পাহোয়া দেখল। অজস্র গ্রামোফোন রেকর্ডের বিচিত্র সুর কাছে দূরে বাজছে। মিলে মিশে এক কিম্ভুত সোরগোলের সৃষ্টি করেছে।

পাহোয়া বলল, নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে সব। সারাদিন ডুবে ডুবে যে টাকা রোজগার করে, তা সারারাত এইভাবে ফুঁকে দেয়। সকালে উঠে যে ট্যাঁক খালি, সেই ট্যাঁক খালি। আবার ডোবে সারাদিন। যারা গোছাবার তারা এর মধ্যেই ঠিকই গুছিয়ে নিচ্ছে। জান, এই এর জন্যও আমার বাবা দায়ী।

ড্যানিয়েলসনকে তাকাতে দেখে পাহোয়া বলল, এই দ্বীপের ব্যবসা তো উঠেই গিয়েছিল। মুক্তাশূন্য শুক্তি আর শুক্তিশূন্য লেগুন। ওকে আর তার কদর কি? এই দ্বীপের কথা ভুলেই গিয়েছিল লোকে। কোনও জাহাজ ভুল করেও আর এদিকে আসত না। এই দ্বীপেরও কোনও লোক ভুল করেও আর শুক্তির জন্য জলে ডুব দিত না।

তারপর একদিন এল সাইক্লোন। বিরাট সাইক্লোন। ১৯০৩ সালে। আর একবার এল ১৯০৬ সালে। ঘরবাড়ি ধনদৌলত যা কিছু বাবার ছিল সাইক্লোন ধ্বংস করে দিয়ে গেল। কি একখানা বাড়ি ছিল আমাদের। বাবা প্যারিস থেকে মেহগনি কাঠ এনে,

তাই দিয়ে বাড়ি বানিয়েছিলেন। সে সব এক ধাক্কায় উড়ে গেল। বাক্স ভরা টাকা ছিল, মুক্তা ছিল অজস্র। সব কোথায় উড়ে গেল।

বাবা পাতা দিয়ে কুটির বানালেন। নারকেল-শাঁসও শুকোতে লাগলেন আর সবাইয়ের মত। এইভাবে কয়েক বছর কাটল। তারপর···

বাবা একদিন মাছ ধরতে গেছেন। লেগুনের জলে তাঁর নজর পড়ল। সন্ধানী দৃষ্টি স্বচ্ছ জল ভেদ করে নামতে লাগল নীচে আরও নীচে, তারপর হঠাৎ আটকে গেল। এ কী, শুক্তি! এ যে বিরাট শুক্তি! অনেক শুক্তি! মায়া নয় তো? স্বপ্ন নয় তো? বাবার দেহের ডুবুরির রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। বাবা দীর্ঘ কয়েক বছর পর আবার ডুব দিলেন লেগুনে। হ্যাঁ, সত্যিই শুক্তি। লেগুনে আবার জন্ম হয়েছে শুক্তির।

বাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার নামল ডুবুরির ঝাঁক। কথা পড়ল ছড়িয়ে। দেশ-দেশান্তর থেকে জাহাজ এল। এল মহাজন, দালাল, আড়কাঠি, ডুবুরি। ভিড়ে ভিড়ে ভরে উঠল টাকুমে। এ আর কি দেখছ। এখন তো মরশুমের কেবল শুরু। ভাল করে জমেই নি, আসেই নি সবাই। পাঁচশ সাড়ে পাঁচশ ডুবুরি আসে। তা এবার সেখানে এখনও পর্যন্ত শ-তিনেক মাত্র এসেছে।

ভোরের আলো ভাল করে তখনও ফোটে নি। রাত জাগার ক্লান্তি শরীরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। হঠাৎ গোঁ গোঁ চিৎকারে সাইরেন বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ড্যানিয়েলসনও তৈরী হয়ে নিলেন। টেহেই আর টিনোরুয়া আগেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ড্যানিয়েলসন বেরুতেই ওরা গিয়ে টেহেই-এর নৌকোয় উঠলেন। এক একখানা মোটরের পিছনে খান-ষোল নৌকো বেঁধে দেওয়া হল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সব কিছু তৈরী হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন একবার ভোঁপা বাজালেন তাঁর বোটের। তারপর ভট্‌ভট্‌ বোট চলল।

[illegible] একগাল হেসে বলল, মজা মন্দ নয়। খাটুনি নেই, দিব্যি ভেসে চলেছি।

ড্যানিয়েলসন জিজ্ঞাসা করলেন, মোটর বোটে এই যে তোমাদের টেনে নিয়ে চলেছে, তা এর জন্যে সাহেবকে কত দিতে হবে তোমাদের ?

রোজ তিরিশটে করে শুক্তি।

তিরিশটে শুক্তি! বল কি ? নগদ পয়সা দিল কত দিতে হত ?

টেহেই বলল, ওরা তো নগদ পয়সা চায় না, শুক্তি চায়।

ড্যানিয়েলসন আশ্চর্য হলেন। ৩০টে শুক্তির ওজন কম হবে না। কম করেও ৩৩ পাউণ্ড হবে। এই ৩৩ পাউণ্ড শুক্তির বাজার দর ৩৯ টাকা তো হবেই। তাহলে, ড্যানিয়েলসন মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, ১৬ খানা নৌকো টেনে মোটর বোটের মালিক এদের কাছ থেকে দৈনিক সওয়া ছয় শ টাকা বের করে নিচ্ছে।

আধ ঘণ্টা পরে লেগুনের অন্য ধারে একটা সুবিধামত জায়গায় মোটর বোট নৌকোগুলো খুলে দিয়ে চলে গেল।

টেহেই আর টিনোরুয়া আরও কিছুক্ষণ নৌকো বেয়ে বেয়ে একটা জায়গা পছন্দ করল।

টেহেই বলল, প্রথম প্রথম সাবধানে কাজ করাই ভালো। অনেকে করে কি, প্রথমেই গভীর জলে ডুব মারতে চায়। কিন্তু আমার মনে হয়, ও গোয়ার্তুমি না করাই ভাল। প্রথমেই যদি গভীর জলে ডুব দিই তো হাঁপ ধরে আসে তাড়াতাড়ি। তা ছাড়া, হাতে পায়ে খিল লাগবার আশঙ্কাও আছে। আমি তাই প্রথমে অল্প জলে ডুব দিয়ে দিয়ে সইয়ে নিই।

টেহেই কথা বলতে বলতে তৈরী হয়ে নিচ্ছিল। চোখে একটা ধাতব চশমা এঁটে দিল, ডান হাতে পরল এক ক্যাম্বিসের দস্তানা, আর কোমরে বেঁধে নিল একটা জালের থলি। তারপর জলে ডুব

মেরে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে নৌকোটার পাশে ভুস করে ওর মাথা ভেসে উঠল।

টেহেই-এর চোখ খুশীতে চকচক করছে। বলল, নেমে পড়, নেমে পড়। শুক্তির অভাব নেই এখানে। আর জলও বেশী গভীর না। ২৫।৩০ ফুট হবে।

টিনোরুয়া নেমে পড়ল। ড্যানিয়েলসনও একবার নামলেন। তারপর চলল ভুস ভুস ডুব। প্রথমবারের পরই ড্যানিয়েলসন উঠে পড়লেন নৌকোয়। কিন্তু ওদের ডুব সমানে চলল। শুক্তির পর শুক্তি তুলে ওরা নৌকো বোঝাই করতে লাগল।

অল্প জলে কিছুক্ষণ ডুব মারাব পর টেহেই গভীর জলে ডুব মারার যোগাড় করতে লাগল।

বলল, একশ ফুটের নীচে নামতে হলে সাঁতার দেওয়ার মানে হয় না। শুধু শুধু দেরি হয় ওসব ক্ষেত্রে। ভার বেঁধে নামাই ভাল। আমরা তাই করি।

টিনোরুয়া তার জালের থলিতে ভারী সীসে বেঁধে টুপ করে তলিয়ে গেল। মিনিট দেড়েক পর যখন উঠে এল, তখন রীতিমত হাঁফাচ্ছে।

বস জিরোও। টেহেই বলল। দেড় মিনিট ডুবে থাকবে তো, তিন মিনিট জিরোবে। ব্যস্, তাহলে আর বেশী ক্লান্তি আসবে না।

বলে নিজেও নেমে গেল। খানিক পরে ও উঠতেই টিনোরুয়া নেমে গেল। তারপর একবার টেহেই ডোবে আর একবার টিনোরুয়া।

এইভাবে যতই সময় যেতে লাগল, ততই ওদের মুখ চোখ রক্তশূন্য হতে লাগল। হাঁপরের মত হাঁফাতে লাগল দুজনে।

হঠাৎ দূরে একটা নৌকোয় খুব গোলমাল শোনা গেল। জন-কয়েক লোক একজনকে জাপটে ধরে আছে আর সে খুব হাত পা ছুঁড়ছে।

সোরগোল শুনে টেহেই কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল। তারপর বলে উঠল, ও কিছু না। ওর 'তারাভানা' হয়েছে।

তারাভানা ? তারাভানা কি ? ও কিছু না। বেশীদিন ধরে গভীর জলে ডুব দিতে দিতে কারও কারও তারাভানা হয়ে যায়। তখন লোকগুলো সব মজার মজার কাজ করতে শুরু করে।

টিনোরুয়া হি হি করে হাসতে লাগল। কিছুক্ষণ পর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, টাপাভিয়ার একবার তারাভানা হয়েছিল। তখন ব্যাটা করত কি নৌকোটা ডাঙায় তুলে এনে দিনরাত বসে বসে দাঁড় টানত। আমাদের খুব মজা লাগত।

টেহেই বলল, কেন, আমার বাবারও তো একবার তারাভানা হয়েছিল। সে বড় মজার ব্যাপার। বাবাকে যা করতে বলি, বাবা তার উল্টোটা করে বসে। বাবাকে যদি বললাম, বাবা চল যাই মাছ ধরি গে। বাবা অমনি রবিবারের পোশাকটি গায়ে চাপিয়ে গির্জেয় গিয়ে বসে রইল। আবার যেদিন গির্জেয় যাবার কথা সেদিন বাবা কাজের পোশাক পরে নারকেল ছাড়াতে বসে গেল। সব থেকে বড় মজা হত খাবার সময়। বাবা মাছকে কফির পেয়ালা মনে করে তার মধ্যে কফি ঢালতো আর কফির পেয়ালায় মাংসের পুর ভরে তাতে লাগাতো কামড়। বেশ ফূর্তিতে দিন কতক কেটেছিল আমাদের। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, একদিন হঠাৎ ভাল হয়ে গিয়েই বাবা সব মাটি করে দিলো।

দুপুরের দিকে মোটর বোট আবার যখন ফিরে এল এদের তীরে নিয়ে যাবার জন্য, তখন দেখা গেল, কাজ মোটামুটি মন্দ হয় নি। ২১১টা শুক্তি তোলা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটার আকার বেশ বড়ই।

নৌকো কূলে এসে ভিড়তে না ভিড়তেই শুক্তির ব্যাপারীরা এসে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। এই নাও, এই ছাখ, কি সুন্দর সাইকেল। ছাখ, কি সুন্দর গ্রামোফোন, দুটো ভাল রেকর্ডও

পাবে এই সঙ্গে। নাও, পোশাক নাও। একেবারে বিলাতী দর্জির তৈরী। একটার পর একটা চকচকে জিনিস দেখে, আর ডুবুরিরা শিশুর মত লোভে পড়ে যায়। যা পায় তাই কেনে। প্রাণপাত পরিশ্রমে যে শুক্তি সারাদিন ধরে তুলল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে সব ব্যবসায়ীর জাহাজে উঠে পড়ল। বদলে পেল কি? ঝুটো যত বস্তাপচা রাবিশ। ওরা তাতেই খুশী।

পাহোয়া বলল, কেমন, বলেছিলাম কিনা। প্রত্যেকদিনই দেখবে এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

ড্যানিয়েলসন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সেই রক্তমাখা টাকার ব্যাখ্যাটা তো করলে না?

পাহোয়া বলল, শুনবে? বেশ। দেখেছ তো, কিভাবে ওরা ডুব দিয়ে শুক্তি তোলে। সে জন্য ওদের উপর ভয়ঙ্কর চাপ পড়ে। তার ফল হয় মারাত্মক। বেশীদিন ডুবুরিগিরি করলে ওই চাপের জন্য ফুসফুস থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তারপর ঠাণ্ডায় জমে, হাতপায়ে খিল লেগে মরণ তো ঘটছেই হামেশা।

গোটাকতক নৌকো ঘাটে এসে লাগতেই ব্যাবসাদাররা গিয়ে তাদের ছেঁকে ধরল। দরদাম চেঁচামেচি। হৈ-চৈ।

দূরে দাঁড়িয়ে পাহোয়া আর ড্যানিয়েলসন তাই দেখছিলেন। হঠাৎ কে একজন কোথা থেকে চেঁচিয়ে উঠল, মারা গেছে, কে একজন মারা গেছে। ঐ দ্যাখ দূরে, সবাই ফিরে আসছে অসময়ে।

কোন একটা দুর্ঘটনা হলেই সেদিন সবাই কাজ বন্ধ করে দেয়। সত্যিই দেখা গেল নৌকাগুলো ফিরে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে সব হৈ-চৈ বন্ধ হয়ে গেল। নেমে এল গুমোট স্তব্ধতা।

কে মরল? কার স্বামী? কার ছেলে? কার ভাই? বন্ধু? মেয়েরা সার বেঁধে এসে দাঁড়াল তীরে। উদ্‌গ্রীব আশঙ্কায়, অজানা আতঙ্কে সকলের বুক দুর-দুর করতে লাগল। কে ও? কে? কোন বাড়ির? আমার নয় তো, অ্যাঁ। হঠাৎ যেন কে ফুঁপিয়ে কেঁদে

উঠল। ধীরে, ধীরে, সেই কান্না ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। কে ও? ও কে? কে?

গাছে উঠেছিল একটা ছেলে। নিরিখ করে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, পায়ভা। ওটা তো পায়ভার নৌকা।

হ্যাঁ, পায়ভাই বটে, ঘাটে নৌকো ভিড়লে দেখা গেল পায়ভা। নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়েছে গড়িয়ে। শুক্তির গায়েও কি ছিঁটেফেঁটো লাগে নি? শুক্তি মানেই টাকা। রক্তমাখা টাকা।

৮

রারোইয়ার উপকূলে নারকেল গাছের ডগায় কি বড় টিলার চূড়ায় কি উঁচু পাথরের মাথায় চড়ে এক শিশু দিকচক্রবালের দিকে চেয়ে নিবিষ্টমনে বসে আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে। এই দৃশ্য মার্চ মাস থেকে রারোইয়াতে দেখা যাবে হামেশাই।

কি দেখে ওরা? কার প্রতীক্ষা করে?

ভোরের সূর্য সমুদ্রের সঙ্গে রোজ খুনসুটি করে। আচমকা এক মুঠো রাঙা রং (আবির?) সমুদ্রের মুখে ভোর হলেই সে ছড়িয়ে দেয়। একটু থতমত খায় সমুদ্র। পরক্ষণেই রেগে ওঠে। ঢেউ বাড়িয়ে ধরতে যায় দুষ্টুটাকে। আর সে ফিক করে একটু হেসে এক লাফে আকাশে ওঠে। ওকে নাগালের বাইরে যেতে দেখে সমুদ্র আরো চটে যায়। রেগে ফোঁস-ফোঁস করতে থাকে। প্রবল আক্রোশে গোটা কয়েক প্রচণ্ড ঘুঁষি ছুড়ে মারে। কিন্তু বৃথা। নিরাপদ দূরত্বে বসে বসে কিছুক্ষণ সূর্য সমুদ্রের হয়রানি দেখে আর দুষ্টু দুষ্টু হাসে। এই খুশী-হাসির উজ্জ্বল দীপ্তি চরাচরে ছড়িয়ে দিয়ে তারপর পশ্চিম দিকে হাঁটা দেয়। তাই দেখে সমুদ্র আরো চটে যায়। ধরবার উপায় নেই, তাই আকাশপানে ঢেউয়ের মুঠি তুলে তুলে নিরন্তর তাকে ঘুঁষি দেখায়। কোথায় যাবে? কতদূরে পালাবে? সেই সন্ধ্যাকালে তো ফিরতে হবেই, তখন?

সে কায়দাও সূর্যের ভালরকম জানা আছে। যেই বিকেল হয়ে আসে, অমনি চলার গতি কমিয়ে আনে। ধীরে ধীরে পা টিপে পা টিপে এগুতে থাকে তখন। সারাদিনের শ্রান্তিতে ঠিক এই সময় একটু ঢুলুনি আসে সমুদ্রের। সতর্কতা শিথিল হয়ে আসে। চোখের পাতাও বুঝি একটু বোজে। আর সূর্যও সেই ফাঁকে তার সারা মুখে আবির মাখিয়ে টুপ করে এক ডুব মারে। অস্তাচলের পথে। আচমকা ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠতে না উঠতেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তখন হাজার ঢেউয়ে গন্ধকের লণ্ঠন জ্বেলে সমুদ্র সূর্যকে খুঁজে বেড়ায়। আতিপাতি করে। রারোইয়ার শিশু কি অবাক বিস্ময়ে এই খেলা দেখে?

কিন্তু এ তো রোজকার খেলা। মজা লাগলেও দুদিন পরে বিস্ময় যায়। আরেক খেলার খোঁজে তখন তার চক্ষু ব্যস্ত। দূর চক্রবালে সূর্যের খেলা সাঙ্গ হলেও তার চোখ নিবদ্ধ থাকে অন্যত্র।

আরে, ঐ তো। সাদা মেঘের ঝাঁক। না, মেঘ নয়, ও পাখির ঝাঁক। দিকচক্রবাল জুড়ে ঐ যে পরিচিত চিহ্ন। অজস্র সামুদ্রিক চিলের ঐ যে এক উড়ন্ত সমাবেশ।

এসেছে। নারিকেল গাছেব ডগা থেকে রারোইয়া-শিশু চিৎকার করে ওঠে।

এসেছে, এসেছে। উঁচু পাথরের উপর থেকে, বড় টিলার চূড়া থেকে শিশুরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'কোমেনে'র ঝাঁক দেখা গেছে।

হঠাৎ সারা গ্রামে সাড়া জাগে। গ্রামসুদ্ধ সবাই পড়ি কি মরি ছুট লাগায় সমুদ্রের ধারে। তারপর জড় হয় একবারে জলের কিনারে। ততক্ষণে পাখির ঝাঁক স্পষ্ট হয়েছে আরও। জলের বুকেও জেগে উঠেছে মাছের এক বিরাট কালো ঝাঁক। 'কোমেনে' মাছের আমদানী এই শুরু হল।

রারোইয়ার আশেপাশে যেসব লেগুন তাতে মুক্তো নেই। এই

সব লেগুনে শুক্তি জন্মায় না। না জন্মাক ক্ষতি নেই। রারোইয়ার লেগুনে মাছের বসতি। হে ঈশ্বর! সেই বসতি অক্ষুণ্ণ রেখ।

মৎস্যভাগ্যে রারোইয়া যে ভাগ্যবতী, সে কথা অস্বীকার করে কে? প্রবাল-প্রাচীর ঘেরা এইসব লেগুনে ছোট, বড়, মাঝারি কত ঢংয়ের, কত রংয়ের মাছ যে বাসা বেঁধে আছে, ইয়ত্তা নেই তার।

এই সব মাছ খেয়ে পুরুষ পুরুষ ধরে বেঁচে আছে রারোইয়া-বাসীরা। মৎস্য মারিব খাইব সুখে। এই নীতি এখনও রারোইয়ার লোকের মূলমন্ত্র।

হরেক রকম মাছ যেমন, তেমন তার ধরবার কায়দাও। এক দেবতার নৈবিদ্যিতে যেমন আরেকজনের মন পাওয়া ভার, তেমনি এক রকম কৌশলে সব রকম কাজ করবার চেষ্টায় শুধু পরিশ্রমই সার।

মারি তো গণ্ডার। কিন্তু সে সব দিন কি আর আছে? নেই। সে ছিল কর্তাদের আমলে। এই রারোইয়ার বার দরিয়ায় তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব তিমি চরে বেড়াত। বেশী দিন নয়, এই তো দু-পুরুষ আগেও। তা কত্তারা সেসব তিমি মারতেন। অবলীলাক্রমে। এখন সে সব গল্পের কথা। সে তিমিও নেই, সে কত্তারাও নেই। এখন তাঁদের যে সব অধম সন্তান বেঁচে-বর্তে আছে তারা তিমি কী তাই জানে না।

এই তো কিছুদিন আগে, এক ঝড়-বাদলের রাতে কোত্থেকে এক বিরাট প্রাণী রারোইয়ার লেগুনে কেমন করে যেন ঢুকেছিল আর বেরুতে পারে না। অল্প জলে দম আটকে মারা পড়ল। এমন জন্তু রারোইয়াবাসীরা জন্মে ইস্তক চোখে দেখে নি। কি ওটা? দেব না দানব? যক্ষ না রক্ষ? না মাছ? কেউ জানে না। ভয়ে ওদিকে কেউ ঘেঁষল না। পচে গলে তার দেহ যখন পঞ্চভূতে মিশে গেল, তখন একদিন একজনের মগজে হঠাৎ খেলে গেল, অ্যাঁ, এ সেই তিমি নয় তো?

তিমি ? অ্যাঁ, এই তিমি ?

তিমি। হ্যাঁ, তিমিই তো।

এঃ!

তখন শুধু আফসোস। আগে খেয়ালটা হল না। ঘুণাক্ষরেও যদি টের পাওয়া যেত, জানা যেত আগে, তবে কি আর এমন বস্তু অমন অনাদরে পড়ে থাকত। ফোঁকটিয়া এক ভোজের সুযোগ এমন বেঘোরে মাঠে মারা গেল।

এঃ! এঃ!

কি আফসোস!

কিন্তু শুধু আফসোসে পেট ভরে না। তাই ডাঙায় বসে শুধু কপাল চাপড়ায় না রারোইয়াবাসীরা। তিমি জোটে নি, কুছ-পরোয়া নেই। অন্য মাছে মতি দাও।

মাছ ধরবার কায়দা এদের যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই মৌলিক। ড্যানিয়েলসন বহুদিন এদেব সঙ্গী হয়েছিলেন। দেখেছেন এদের কলা-কৌশল। অবাক লেগেছে তাঁর। সময় সময় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছেন।

আর কৌশলও যে এক রকম তা নয়। মাছ ভেদে, এদের মাছ ধরবার কৌশল বদলায়।

এর মধ্যে উৎসবের গন্ধ পাওয়া যায় 'কোমেনে' মাছের মরশুম এলে (যেমন ধরুন ইলিশ)। 'কোমেনে' মাছ সব সময় পাওয়া যায় না। মার্চ মাস থেকে তার 'সিজিন' শুরু হয়। এই ওদের আবির্ভাবের সময়। আর আসে যখন, সমুদ্র কালো হয়ে যায়। এমন বড় ঝাঁক ওদের। যতদূর চাও ততদূর মাছ। মাছ আর মাছ। গিস্‌গিস্ করছে মাছ। সমুদ্রের জলটুকুও যেন মাছ হয়ে গেছে।

গ্রামের লোক নিষ্পলক চেয়ে আছে। দেখছে ঝাঁক ঝাঁক মাছ এগিয়ে আসছে। দেখছে ঝাঁক ঝাঁক সামুদ্রিক চিলও উড়ছে তাদের উপরে। কি উল্লাস তাদের। কর্কশ চিৎকারে আকাশ যেন

চিরে ফেলেছে। সে উল্লাসের ছোঁয়া রারোইয়াবাসীদের চোখে মুখে এসে লাগল।

সে এক দৃশ্য। অদ্ভুত দৃশ্য। দেখতে দেখতে শান্ত নির্জন সমুদ্রতীর এক বিরাট রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক চিল ঝাঁপিয়ে পড়ছে মাছের ঝাঁকের উপর। কর্কশ চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। চিলের আক্রমণে 'কোমেনে'র ঝাঁক ছিন্ন-ভিন্ন ছত্রখান হয়ে পড়ছে। মুহূর্তেই আবার ওরা জড় হচ্ছে একখানে। আবার ওদের উপর আক্রমণ চলেছে আবার ঝাঁক ভাঙছে গড়ে উঠছে।

এইভাবে মাছের ঝাঁক যখন তটের কাছাকাছি এসে গেল, তখন গ্রামের মোড়ল টেকা হঠাৎ একটা কি হুকুম করল।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভোঁ দৌড় দিল গ্রামের দিকে। সমুদ্রতীর ফাঁকা হয়ে গেল। ড্যানিয়েলনসন হতবুদ্ধি হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। মাত্র কয়েক মিনিট। তারপর এক প্রচণ্ড সোরগোল উঠল গ্রামেব দিকে। ড্যানিয়েলসন দেখলেন, ঊর্ধ্বশ্বাসে সবাই আবার ছুটে আসছে। সবার হাতেই রয়েছে দেখা গেল গোটা পাঁচেক করে পাতাসমেত নারকেলের ডগা।

দেখতে দেখতে সবাই এসে জড় হল। আর পটাপট নারকেলের পাতা চিরে তা দিয়ে সবাই নিপুণ কৌশলে পাতার এক একটা মালা তৈরি করে ফেলল। তারপর একটার পর একটা সেই মালা জুড়তে লাগল আর পাক দিতে দিতে সেটাকে লম্বা করতে লাগল। এইভাবে যখন জিনিসটা প্রায় পাঁচ শ ফুট লম্বা হল, তখন সবাই সেটা নিয়ে ঝপাঝপ জলে নেমে পড়ল।

দুদিকে দুজন ষণ্ডা মত লোককে দিয়ে বাদবাকী সবাই ভিতরের দিক ধরে সার বেঁধে এগুতে লাগল ওরা। তারপর ধীরে ধীরে সেই নারকেল পাতার দড়ি দিয়ে ঘিরে ফেলল বিরাট মাছের ঝাঁকটাকে। তারপর দুদিক থেকে দড়িতে দিল টান। টানতে টানতে

মাছগুলোকে তীরের কাছে এনে ফেলল। তখন আর কি, যে যত পার ধর।

মেয়েরা চটপট নারকেল পাতার খালুই বানিয়ে ফেলল। আর খালুইভরা মাছ আর মনভরা তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরতে লাগল।

এক আধ দিন নয়। সিজিন-ভরই এইভাবে চলে রারোইয়া-বাসীদের এই অভিযান। দু মাস ধরে প্রায় প্রত্যহই।

এ তো গেল গুষ্টিসুখের কথা। দিনে দিনের শিকার। এছাড়া রাত্রেও মাছ ধরে ওরা। তবে দল বেঁধে নয়, একা একা।

এক রাত্রে ড্যানিয়েলসন এমনি এক অভিযানের সঙ্গী হয়েছিলেন।

রাত্রি গভীর হয়েছে। বাতাসের সুখস্পর্শ গায়ে এসে লাগছে। পুটাকে আর টিনোকুয়ার সঙ্গে ড্যানিয়েলসন চললেন। তার সঙ্গে মেরী টেবেসাও। পুটাকের পিঠে মস্ত বস্তা। (ও কি এক বস্তা মাছ ধরবে)! একটু হাসি পেল তাঁর।

সেই নিস্তব্ধ রাত্রি, সেই তারা-ফোটা, কেমন দীপ্তিময় উজ্জ্বল আকাশ, সেই নারকেল পাতার অবিশ্রান্ত সর্‌সর্‌ শব্দ আর সীমাহীন সমুদ্রের দূরাগত সেই গর্জন, এই সব কিছু মিলিয়ে যে অপূর্ব অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর মনে, দিন মাস বছরের ব্যবধান কাটিয়ে ড্যানিয়েলসনের মনে আজও তা অক্ষয় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এখনও দৃশ্যটা চোখে ভাসে। পুটাকের হাতে মস্ত এক লণ্ঠন। টিনোকুয়ার হাতেও একটা। তবে তাতে কালি উঠে উঠে ভাল আলো হচ্ছিল না। বাঁ দিকে সমুদ্র। প্রবাল-প্রাচীরে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। প্রবালের গায়ে জল লেগে কখনও-সখনও ঝিলিক মেরে উঠছে আলো। ডানদিকে নারকেল বন। অন্ধকার সেখানে নিশ্চিত আশ্রয়ে ঘন হয়ে যেন গল্প-গুজব করছে। সমুদ্রে জোয়ার এসেছে।

ধীরে ধীরে ওরা দ্বীপের উত্তর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। টিনোরুয়া জলে গিয়ে একবার নামল, পরক্ষণেই উঠে এল। বলল, জলে বড় টান। একটু সবুর করতে হবে। একটু পরেই মাছগুলো উঠে আসবে এই সব কিনারে। ঘুমাতে আসে কিনা।

আকাশের দিকে চাইল টিনোরুয়া। বলল, ঐ যে তারাটা দেখছ, ঐ দক্ষিণে। ঐ তারাটা যখন ধীরে ধীরে দিগন্তে নেমে যাবে, ঠিক সেই সময় মাছরা ঘুমাতে আসবে। এস, ততক্ষণ অপেক্ষা করি।

ক্রমে তারাটা সরতে লাগল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দিগন্তের দিকে। ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন ওঁরা উঠলেন। এইবার সময় হয়েছে।

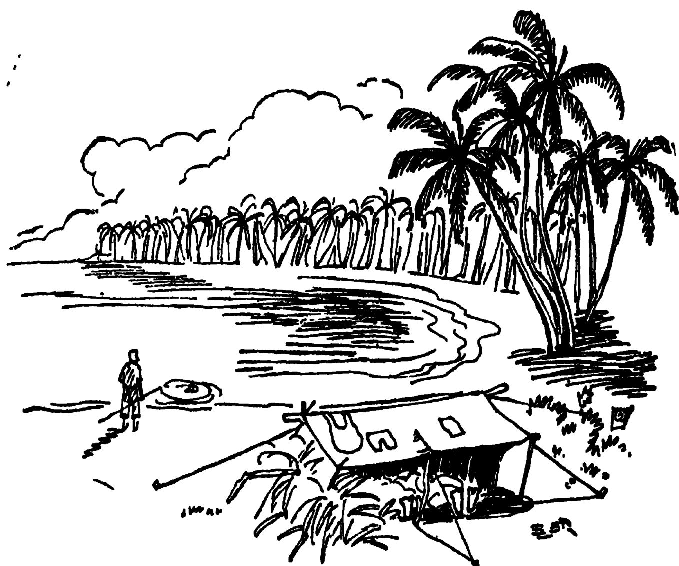
পুটাকে সন্তর্পণে জলে নামল। সাড়া শব্দ না করে বকের মত পা ফেলে এগুতে লাগল। তার এক হাতে উজ্জ্বল লণ্ঠন অন্য হাতে চকচকে একটা ছুরি। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে পুটাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শিকার চোখে পড়েছে তার। ঐ যে একটা মাছ ঘুমাচ্ছে জলের তলে। পুটাকে এগিয়ে গেল। তার পর বিদ্যুতের মত নেমে গেল তার ছুরি। জলে আলোড়ন উঠল। আর একটু পরে মাছটা ভেসে উঠল। টিনোরুয়া বস্তায় পুরে ফেলল সেটা।

এই ভাবে ধীরে ধীরে ওঁরা গ্রামের দিকে এগুতে লাগলেন। ভোরও যখন হল, ওঁরাও তখন গ্রামে পৌছলেন। যাত্রা করবার সময় টিনোরুয়াকে এক বড় বস্তা বয়ে নিতে দেখে ড্যানিয়েলসন হেসেছিলেন। এখন টিনোরুয়া তার ভর্তি বস্তার দিকে ফিরে চেয়ে হাসল।

এ ছাড়া টেহেই আর মাওনোর সঙ্গেও একবার মাছ ধরতে বেরিয়েছিলেন ড্যানিয়েলসন। কি উত্তেজনাই না হয়েছিল সেদিন!

মাওনো একদিন এসে বললে, চল আমাদের সঙ্গে। মাছ মারা দেখবে চল।

প্রথম খণ্ড : স্বর্গ এখানে



স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে তা এইখানে।
এই সফেন সমুদ্রস্নাত পলিনেশিয়ায়, এই লেগুনবেষ্টিত প্রবাল-
প্রাচীরে ঘেরা দক্ষিণ সাগরের দ্বীপপুঞ্জসমূহে।
এই ছোট্ট রারোইয়া দ্বীপে।
রারোইয়াবাসীদের সরল, সহজ, জটিলতাহীন জীবনযাত্রায়
স্বপ্নময় সেই নন্দন-কানন যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।
যেখানে সভ্যতা, আজ সেখানেই তো সংকট। সেখানেই
শুধু আতঙ্ক আর ভয়! দম্ভ আর ভ্রূকুটি। অনিশ্চয়তা আর
অনাস্থা। দ্রুতগামী বিমানের আতঙ্কজনক ঘর্ঘর আর ক্ষমতাউন্মত্ত
পলিটিশিয়ানের ভীতিপ্রদ আস্ফালন। তর্জন আর গর্জন, আর
তেজস্ক্রিয় মেঘরূপী সাক্ষাৎ মৃত্যুর হঠাৎ-হানার আশঙ্কা। কোথায়

স্বস্তি? কোথায় শান্তি? কোথায় দুদণ্ড নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে বসে জিরোবার স্থান?

এস, ভীত ত্রস্ত সশঙ্কিত মন। এস এই দক্ষিণ-সাগর-লালিতা পলিনেশিয়ায়। সভ্যতার স্পর্শলাগা তাহিতিতে নয়, স্বধর্ম-ভ্রষ্ট পাপিতিতে নয়। এস আরও ভিতরে, একেবারে আদিমদের মধ্যে। এই টোয়ামাটু দ্বীপপুঞ্জে এস। চলে এস এই রারোইয়া দ্বীপে। বস এই শান্ত বেলাভূমে। পরম নির্জনে।

রমণীয় বালুর উপরে পরম আলস্যে শরীর বিছিয়ে দাও। শোন ঢেউভাঙ্গা গান।

বাড়ি-ফেরা সাগরপাখির ডানার ভ্রাণে, রারোইয়াবাসিনী পলিনেশীয় কোনও রমণীর দূরাগত গানে কচিৎ হয়ত নিস্তব্ধতা ভেঙে যাবে, নারিকেলের অজস্র পাতায় শুরু হবে বাতাসের মৃদু সঞ্চরণ, লেগুনের জলে লাগবে বৈকালী সূর্যের অজস্র রঙ। তারপর এক সময় রাত্রি আসবে নেমে। গভীর মমতাময় অন্ধকার আবৃত করবে জল-স্থল অন্তরীক্ষকে। আবার আলো ফুটবে, দিন জেগে উঠবে। সময় ধীরে আলস্যে গড়িয়ে যাবে। কারও তাড়া নেই। গতির দ্রুততা নেই। কেউ ব্যস্ত নয় এখানে।

রারোইয়াবাসীদের এই হল বড় বৈশিষ্ট্য। এখানে ব্যস্ততা নেই। জীবন তাড়াহুড়ো করে ফুঁকে দেবার বস্তু নয়। তা যে আস্তে ধীরে চেখে-চেখে উপভোগ করবার, সে কথা এরা জানে।

এই জিনিসটাই সবপ্রথমে ড্যানিয়েলসনের নজরে পড়েছিল রারোইয়াতে এসে। বেংট্ ড্যানিয়েলসন নিজে ইওরোপীয়। স্যুইডেনের লোক। একজন নৃতত্ত্ববিদ।

পৃথিবীতে রারোইয়া দ্বীপের মত এমন জায়গা এখনও আছে, এ না দেখলে ড্যানিয়েলসনের মনে হত গল্প-কথা। রারোইয়াবাসীরাও পলিনেশীয়। তবে প্রাকৃতিক কারণে বাইরের জগতের সঙ্গে এদের যোগাযোগ কম। কম বলেই এখনও এরা অকৃত্রিম আছে।

চললেন ড্যানিয়েলসন। তখন সবে সূর্য উঠেছে। মাওনোর নৌকায় চড়ে লেগুন পাড়ি দিয়ে চললেন তারা। আধ ঘণ্টা পরে প্রবাল-প্রাচীরে ঘেরা চন্দ্রাকার এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন। দূর থেকেই কালো কালো মাছ চোখে পড়ছিল। কাছে এসে দেখলেন, অনেক মাছ ঘোরাফেরা করছে। টেহেই আর মানাও কালো। চশমা বের করে বেশ করে মুছে নিল। তারপর তা চোখে পরে দুজনে দুটো কোঁচ-বর্শা হাতে নিয়ে জলে নেমে পড়ল।

ড্যানিয়েলসন নৌকায় বসে দেখতে লাগলেন। দুজনে যেন মানুষ নয়, দুই জলচর প্রাণী। ভুস ভুস ডুব দিচ্ছে। দমভর বাতাস নিয়ে জলের নীচে তীরের মত ছুটে চলেছে মাছের পিছনে। মাছ কোঁচ বিদ্ধ করছে। কি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা। কি অপূর্ব লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা। ওদের দুজনের কোমরে দড়ি ছিল। মাছ মারছে আর সেই দড়িতে গেঁথে রাখছে। কোমর ভর্তি মাছ যখন মালা হয়ে উঠল, ওরা তখন ক্ষান্ত দিল।

জল থেকে উঠে এল নৌকোয়। ড্যানিয়েলসন হঠাৎ দেখলেন, কিছু মাছ খাওয়া-খাওয়া।

একটু কৌতূহল হল তাঁর। জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি। মাছগুলো খাওয়া কেন ?

টেহেই বলল, ও কিছু নয়। হাঙ্গরের কীর্তি। হাঙ্গরে খেয়ে যায় পিছন থেকে। বড্ড পাজি হয় কিনা ওগুলো।

হাঙ্গরে খেয়ে যায়! সর্বনাশ! হাঙ্গর আছে নাকি ? উত্তেজনায় ফেটে পড়েন ড্যানিয়েলসন।

ঢের আছে। টিনোরুয়া শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়।

হাঙ্গর আছে, আর তোমরা ঐভাবে জলে নাম!

টেহেই হাসে। জবাব দেয়, জলে না নামলে মাছ মারব কোথায় ? নারকেল গাছের মাথায় ? মাছ মারতে গেলে এসব ঝুঁকি নিতেই হয়।

টেহেইকে শুধু মাছ মারার ব্যাপারেই নয়, না[redacted]
নিতে দেখেছেন ড্যানিয়েলসন।

তার মধ্যে সব চেয়ে সেরা হচ্ছে কচ্ছপ শিকার।

জুন মাস কচ্ছপদের ডিম পাড়বার সময়। তখন
ডাঙায় আসতে থাকে ওরা। এক একটা বিরাট। ৩।৪ মণ

এমনি সময় একদিন ড্যানিয়েলসন টেহেইকে দেখেছিলেন
এক কচ্ছপ ধরতে।

সমুদ্রে ভেসে আসছে কচ্ছপ। কালো কালো চেহারা নজরে পড়তেই ওরা নৌকো ভাসিয়ে দিলে।

একটা লোহার বাঁকা বঁড়শি আর লম্বা দড়ি এইমাত্র সম্বল। কচ্ছপের নাগাল পেতেই বঁড়শি হাতে নিয়ে টেহেই লাফিয়ে পড়ল জলে। কচ্ছপও ওকে দেখে মারল ডুব। টেহেইও ডুব দিল চক্ষের পলকে।

দেখতে দেখতে তীব্র গতিতে কচ্ছপ অতলে তলিয়ে গেল। তীব্রতর গতিতে টেহেইও। তারপর সব স্তব্ধ। শুধু নৌকোয় রাখা দড়ির বাণ্ডিল ক্রমেই ছোট হয়ে আসতে লাগল। টেহেই-এর বঁড়শিতে তার একটি ধার বাঁধা। তার সঙ্গেই দড়ি সড়সড় করে নেমে যাচ্ছে। ফুটের পর ফুট। বিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ......

নামছে তো নামছেই। মনে হল যেন অনন্তকাল ধরেই দড়িটা নেমে যাবে। কিন্তু না, হঠাৎ টান পড়ল দড়িতে। এই হল সঙ্কেত। টেহেই পাকড়াতে পেরেছে কচ্ছপটাকে। খানিক পরেই ভুস করে ভেসে উঠল টেহেই। তার মুখ মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু ভাল করে দেখাও গেল না। এক বুক শ্বাস নিয়ে পরক্ষণেই আবার ডুব দিল। নৌকোর উপর যারা ছিল তারা এবার দড়িতে টান দিল। বন্দী হয়েছে কূর্ম অবতার।

কর্তারা তিমি শিকার করতেন। তাঁদের সে বীরত্ব, সেই সব ঘটনা এখন তো রূপকথা। এখন তিমি কাকে বলে এরা তাই

জানে না। না জানুক। তবু এদের দেহে সেই সব বীরদের রক্তই তো বইছে। তার প্রমাণ দিতেই কি এরা, এই দুঃসাহসিক রারোইয়াবাসীরা, এইভাবে জীবন পণ করে কূর্ম শিকারে মেতে ওঠে? কি জানি?

৯

ইহি কাঁদছিল। তার বুকে এক মরা ছেলে। তার মুখে একটানা কান্নার সুর। গ্রামের লোক যারা, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, যারা এসে জড় হয়েছিল খবর পেয়ে, এতক্ষণ ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, সমবেদনা প্রকাশ করছিল, চোখের জল ফেলছিল কেউ কেউ, তারা সব এইমাত্র চলে গেল। তাদের কাজ ফুরিয়েছে, শোকের আমোদ একঘেয়ে লাগতেই তাই তারা চলে গেল। কে আর বসে থাকে? শুধু বসেছিল ইহি। তার কোলে এক মরা ছেলে। ছোট ছেলে। তার একমাত্র ছেলে। ছেলের শোক বুকে বিঁধেছে। ইহি কাঁদছে।

দৃশ্যটি নতুন। রারোইয়ার পটভূমিতে ইহির কান্না কেন যেন খাপ খাচ্ছিল না। ড্যানিয়েলসন ভাবছিলেন, এই বুঝি ইহির কান্না থেমে যাবে। এই বুঝি ইহি হেসে উঠবে খিলখিল করে, এই বুঝি তাকে ঘিরে জমে উঠবে নাচ গান হল্লার এক উৎসব। কেন যে এ কথা ভাবছিলেন ড্যানিয়েলসন, কে জানে? রারোইয়ার বাতাসে কান্না এক অপরিচিত আগন্তুক। এক বছরের উপর ড্যানিয়েলসন কাটিয়ে দিলেন এখানে। কই আর কখনও তো এমন দৃশ্য তার চোখে পড়ে নি। এমন করে আর তো কেউ কাঁদে নি।

কিন্তু আকস্মিকভাবে রারোইয়াতে যে অবস্থা ঘটল তার ফলে নাচ গান স্ফূর্তির পাট বেশ কিছুদিনের মত শিঁকেয় তোলা রইল, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অসুস্থ হয়ে পড়েছে গোটা গ্রাম। মারাত্মক এক মারী ঢুকে পড়েছে গ্রামে।

হামের তীব্র আক্রমণ শুরু হয়েছে। ইহির ছেলে মরেছে। ইহি আক্রান্ত হয়েছে। আরও অনেক অনেক লোকের দেহেও সংক্রামিত হয়েছে এই মারাত্মক ব্যাধি। আতঙ্ক ভয় আর বিভীষিকা বুকে নিয়ে রারোইয়া কাল কাটাচ্ছে। কি ম্রিয়মান, কি জ্যোতিহীন হয়ে গেছে রারোইয়া! প্রাণের যে দীপ্ত দীপশিখা দপদপ করে জ্বলত, দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত ভাবে, এক ফুঁয়ে কে যেন তা নিভিয়ে দিয়ে গেছে। কলহাস্য মুখরিত দ্বীপ হঠাৎ-আঘাতে নির্বাক হয়ে গেছে। নির্বাক ঠিক নয়। কান পেতে রাখ। মনঃসংযোগ কর। ঐ শোন সাগরের ঢেউ-এ, নারকেল পাতার মর্মরে মর্মরে ছড়িয়ে পড়ছে, এক অপরিচিত কান্না। অপ্রত্যাশিত কান্না।

ইহি পুত্রশোকে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে।

সেবার শুক্তির মরশুম শেষ হতে না হতেই হামের আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। খবরটা কানে যেতেই পাপিত্তির শাসকবর্গ এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে লোক যাতায়াত নিষিদ্ধ করে দিলেন।

কিন্তু সে হুকুম মেনে চলবে, ব্যবসাদাররা তেমন মানুষ নয়। বিশেষ করে চীনে ব্যবসাদাররা।

হঠাৎ, এই দিন দুই আগে এক চীনে স্কুনারের মোটরের ফটফটি শোনা যেতেই রারোইয়াবাসীরা অবাক হয়ে গেল। কি ব্যাপার? এই অসময়ে জাহাজের আগমন? এখন তো জাহাজ-ফাহাজ আসা বারণ। গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল সাগরতটে। তখন সন্ধ্যে হয়েছে।

সেই আবছা আলো অন্ধকারে জাহাজের রূপ দেখা গেল না। দেখা গেল মিশকালো তার ছায়াটা। জাহাজখানাকে কেমন ভুতুড়ে ভুতুড়ে লাগছিল। কখনও এমন হয় না, এইবারই, এই প্রথম কারও কারও গা ছমছম করে উঠল।

জাহাজখানা ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কাছাকাছি এল।

কিন্তু কি ব্যাপার? লোকজনের দেখা নেই কেন ডেকে? সাড়াশব্দ নেই কারও। কখনও তো এমন হয় না। পলিনেশিয়ার কোনও দ্বীপে জাহাজ নোঙর করা, সে তো এক উৎসব বিশেষ। যেমন তীরে, তেমনি ডেকে, ভিড় জমে যাবে। হল্লা-গুল্লা শুরু হবে। পরিচিত মুখে হাসির লহরী খেলবে। পরিচিত নামগুলো নিয়ে মুখে মুখে লোফালুফি শুরু হবে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা কি ?

তীরে গ্রামের তাবত লোক এসে জড় হয়েছে। ব্যাপার দেখে এ ওর সে তার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। এখনও ডেকে কেউ উঠল না। জলে ডিঙি নামল না!

ভাবতে না ভাবতেই ছপাৎ, জলে কি পড়ল? সবাই চমকে উঠল। ছপাৎ ছপাৎ। আরো। আরো। একটার পর একটা শব্দ হতে লাগল। আবে ওতো জাহাজের ডিঙি নয়, ডুবুরিদের ডোঙা!

চকিতে সকলের মনে এক চিন্তা খেলে গেল, সর্বনাশ! জাহাজে অসুস্থ লোক নেই তো? বে-আইনিভাবে তাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে না তো? সর্বনাশ। তবে তো ডাহা সর্বনাশ! ও মোড়ল, যাও। এগিয়ে ছাখ। বোঝ, ব্যাটাদের মতলব কি?

প্রথমে ফিসফাস, পরে গুজগাজ, তার পরে কড়া সঙ্কল্প। টেকাকে সবাই চেপে ধবল। কি ব্যাপার মোড়ল, তুমি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণেব মালিক। তুমি চুপ কবে আছ কেন? গিয়ে ছাখ বিষয়টা কি?

ডুবুরিদের ডোঙা একটা ছুটো করে গোটা দশ বারো জলে পড়ল। গোটা-কতক লোককেও জলে নামতে দেখা গেল। তারা ডোঙাগুলোকে ঠেলে ঠেলে ডাঙার দিকে নিতে লাগল।

জাহাজটা কি তবে রাত্রে এখানে থাকবে? মনে তো তাই হয়। না হলে আর ডোঙাগুলো নামাল কেন? কিন্তু এই বা কি

দস্তুর? জাহাজ এখানে নোঙর করতে গেলে মোড়লের অনুমতি নিতে হবে না? কিন্তু কই, কাপ্তান কই? আসছে না কেন সে? সব জিনিসটাই কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে। কেমন যেন সন্দেহের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

অবশেষে টেকাই গেল জাহাজে। ধরতে গেলে তাকে এক রকম ঠেলেই পাঠান হল।

টেকা ফিরে আসতেই সবাই মিলে ছেঁকে ধরল তাকে। কি? কি বিত্তান্ত?

টেকা বলল, কাপ্তান বলল, এইসব ডোঙা এখানেই নামিয়ে দেওয়া হবে। তার জাহাজের যাত্রীদেরও ওরা এখানেই নামিয়ে দেবে। সামনের শুক্তির মরশুম এলে আবার এই জাহাজ এখানে আসবে। এসে এদের তুলে নিয়ে যাবে। কাপ্তান বললে, সে নাকি বিশেষ অনুমতি পেয়েছে সরকারের কাছ থেকে। তাহলে বোধ হয় বেতারে পেয়ে থাকবে অনুমতি।

রোগী টোগী নেই তো?

হ্যা, তা আছে। টেকা বলল। কিন্তু ওবা যখন অনুমতি এনেছে বলছে, তখন আর উপায় কি?

টেকা হতাশ হয়ে পড়ল একটু। কিন্তু ড্যানিয়েলসনের কেমন খটকা লাগল। বিশেষ অনুমতি ওরা পেয়েছে বলছে কিন্তু অনুমতিটা পেল কার কাছ থেকে? কবে? কোথায়? কি ভাবে? এই জাহাজে বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্র তো নেই। তবে? গোটা টুয়ামটু দ্বীপপুঞ্জে এই যন্ত্র মাত্র একটা আছে, আর তাও মারুটিয়া দ্বীপে। ড্যানিয়েলসনের যে সর্টওয়েভ রেডিও সেটটা আছে, তাতে তো তিনি হরবখত মারুটিয়া ধরে বসে থাকেন। কই, তিনি তো এমন কোনও অনুমতির কথা শোনেন নি। আর তা ছাড়া এরা এই চীনে ব্যবসাদাররাই বা কি এমন তালেবর ব্যক্তি যে ওদের জন্য ফরাসী সরকার নিয়ম ভাঙতে যাবেন?

ড্যানিয়েলসন টেকাকে বললেন, ওদের নামতে দিও না। অন্য লোকদের বললেন, তফাত থাকো। খবরদার এই জাহাজের যাত্রীদের ছোঁয়াচ যেন না লাগে।

ইহি তার ছেলে কোলে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখছিল কাণ্ডকারখানা। হাসছিল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। একবোঝা দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক, সংশয়, সন্দেহ যখন রারোইয়াবাসীদের মনে মনে ফিরছিল, পিষে ফেলতে চাইছিল ওদের, তখন ওদের মধ্যে এই মেয়েটিই ছিল নির্ভয়, নিঃশঙ্ক। ওর প্রফুল্লতা দিয়ে, চাপল্য দিয়ে, চটুলতা দিয়ে ও-ই আবহাওয়া সরগরম করে রেখেছিল। রারোইয়ার মুক্তপ্রাণ ওর মধ্যেই বাসা বেঁধেছিল।

ড্যানিয়েলসনের সতর্কবাণী ইহি শুনল। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল। রারোইয়ার পাগলা হাসি সংক্রামিত হয়ে পড়ল জনে জনে। মনে মনে।

জাহাজ থেকে একদল যাত্রী নামল। সাবধান, সাবধান। ছুঁয়ো না। তফাত থাকো। তফাত। সতর্কবাণী। যেন কানে কানে বেজে উঠল। সবাই থমকে রইল কিছুকাল।

টোমানে।

ইহি খুশীর চোটে চিৎকার দিয়ে উঠল। সব নিষেধ তুচ্ছ করে বন্যার মত ছুটে গেল এক যাত্রীর দিকে। তীব্র আলিঙ্গনে তাঁকে বেঁধে ফেলল। আর যাবে কোথায়? সব নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু হল। হৈ-চৈ, চিৎকার, হল্লা, গান আরম্ভ হয়ে গেল। কাদের আমরা তফাত রাখতে চাই? কার কাছে থেকে তফাত থাকতে চাই? ভাইয়ের কাছ থেকে? বন্ধুর কাছ থেকে? এদেরকে কি দূরে ঠেলা যায়? থাকা যায় এদের কাছ থেকে দূরে?

প্রথমে যারা নেমেছিল তাদের সবাই বেশ সুস্থ সবল ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় চালানে যাদের নামাল হল, তাদের দেখে সব ফুর্তি খোঁচা খাওয়া বেলুন-চোবসা হয়ে গেল। আরে বাপ! কি সব

বিকট চেহারা। সর্বাঙ্গে ঘাম বেরিয়েছে ঝেড়ে। নাক মুখ লাল টকটক করছে। ফুলে চৌগুণ হয়ে গেছে। জ্বরের তাপে শরীর হয়েছে তপ্ত খোলা। ধান দিতে না দিতেই যেন পটপট খই ফুটে বেরুবে।

জাহাজ থেকে নামা মাত্রই যাত্রীরা ছুটল গ্রামের দিকে। সেদিকে মিঠে জলের পুকুর। সেদিকে খাবার ভরা দোকান। কতদিন ধরে এরা চান করে নি। খায় নি পেটপুরে।

জ্বরে গা পুড়ে গেছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়েছে। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী হয়েছে ভাজা ভাজা। তবু ওদেরকে চীনেরা জল দেয় নি, পেট পুরে খেতে দেয় নি। মুর্গি হাঁস যেভাবে ঝুড়ি-বন্দী চালান দেয়, এদেরকেও সেই রকম জাহাজের খোল ভরতি করে এনেছে। বাড়ি পর্যন্তও পৌঁছে দিল না। মাঝ পথে, বারোইয়াতে ছেড়ে রেখে সরে পড়বার তাক ওদের।

অথচ শুক্তির মরশুম শুরু হবার আগে কি তোয়াজ, কি খোসামদই না করেছে। চুক্তি ছিল, যেখান থেকে নিয়ে এসেছ, তোমার খরচায় সেখানেই আবার পৌঁছে দিতে হবে। হাঁ হাঁ তাতেই রাজী। মরশুম শেষ হবার সঙ্গেই সঙ্গেই কিন্তু আমাদের পৌঁছে দিতে হবে বাড়ি। বিলক্ষণ, তাই দেব। এ আর বেশী কথা কি।

কথা অল্প। কিন্তু মরশুম শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা ধামা চাপা পড়ে গেল। কাজ নেই, কর্ম নেই। বিদেশ বিভুঁয়ে ডুবুরির দল পড়ে রইল। পুঁজি-পাটায় টান পড়ল। যা রোজগার করেছিল ফুর্তি করে তা উড়িয়ে দিয়েছে। এখন সবার ভিখারীর দশা।

হঠাৎ একদিন সেই জাহাজ ফিরে এল। কি হল? আমাদের পৌঁছে দাও বাড়ি। ওরা সবাই কাপ্তানকে গিয়ে ধরল। কাপ্তান বললে, এ আর বেশী কথা কি? ভাড়াটি ফেল আর জাহাজে গিয়ে ওঠো। ৭।৮ দিনেই বাড়ি পৌঁছে যাবে। ভাড়া! সে কি! ভাড়া!

দেবার কথা তো ছিল না। তোমরাই তো পৌঁছে দেবে কথা ছিল। তা ছিল, অস্বীকার করছি না। তবে অপেক্ষা কর আর কিছুদিন এখানে। ঘুরে আসি আমি। পৌঁছে দেব তখন। কুতকুত করে হেসে চীনে কাপ্তান জ াব দেয়। বাঃ ততদিন আমরা খাব কি? চীনে কাপ্তান তেমনি মোলায়েম জবাব দেয়, ও কথা তো আমার সঙ্গে হয় নি।

তারপর কাপ্তান হঠাৎ উদ্ধারকর্তা প্রভু যীশু বনে যায়। বলে, তোমরা যে বিপদে পড়েছ, বুঝতে পেরেছি। সত্যি, ফিরে এসে তোমাদের নিয়ে যেতে বেশ কিছুদিন দেরি হবে। অথচ আমারও উপায় নেই। যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি, সেখানে না গিয়ে তোমাদের যদি পৌঁছে দিতে যাই তবে আমার বিরাট লোকসান হয়। তাই ভাবছি, কি করা যায়।

চীনে কাপ্তান চোখ বুঁজে একটু চিন্তা করে। তারপর বলে, একটা কাজ করা যেতে পারে। তোমরা যদি আমাকে একটু সাহায্য কর, তাহলে আমার লোকসানটাও বাঁচে, তোমরাও চটপট বাড়ি পৌঁছতে পার।

কি করতে হবে, বল?

আমাকে আরও কিছু শুক্তি তুলে দাও।

আরে বাপ, এই অসময়ে। এখন জল ভারী হয়ে গেছে। এখন এই জলে নামা মানেই তো মৃত্যু।

কিন্তু এই দ্বীপে অনির্দিষ্টকালের জন্য পড়ে থাকার মানে কি?

তার মানে ওদের থেকে আর ভাল কে জানে। ওরা তাই বাধ্য হয়ে রাজী হয়। এখানে ওখানে চুরি করে শুক্তি তুলতে তুলতে জাহাজখানা এগুতে থাকে। হঠাৎ সে অঞ্চলে হামের আক্রমণ শুরু হয়। নিষেধ হয় এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াত। কি করে সংক্রমণ ওদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। তখন জাহাজের কাপ্তান মরিয়া হয়ে ওদের নামিয়ে দেবার চেষ্টা করে। যেখানে

হোক নামিয়ে দিতে চায়। এর আগে আরও কয়েক জায়গায় নামিয়ে দিতে গেছে, কিন্তু পারে নি। যেখানেই যায়, সেখানকার লোক মারমার করে ওঠে। শেষ পর্যন্ত এই রারোইয়ায় নামিয়ে দিল।

কিন্তু এখানে তো চিকিৎসা হবে না। ওদের পাপিতিতে কেন নিয়ে গেল না? পাপিতি কি এখানে? কত পেট্রোল পুড়বে তার হিসেব কষেছ কি? এত পেট্রোল পুড়িয়ে ওদের পাপিতিতে পৌঁছে দিলে ওদের না হয় চিকিৎসা হবে, কিন্তু আমাদের তাতে লাভটা কি হবে শুনি? চীনে ব্যবসাদারের সাফ জবাব শোনা যায়।

আর এইসব ব্যবসাদারদেরই তো পলিনেশীয়ার একচ্ছত্র অধিকার।

এই তাহলে মতলব। এই রোগীদের এখানে ফেলে রেখে, গোটা গ্রামে মারাত্মক রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে, রারোইয়াকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়ে, সরে পড়বে। কাপ্তান এই মতলব করেছে।

উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেলতেই রারোইয়াবাসীরা মরিয়া হয়ে উঠল। অমন যে শান্ত টেকা, সেও অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠল। কাপ্তানের কাছে গিয়ে সটান হুকুম করল, যদি মঙ্গল চাও, তবে অবিলম্বে এদের নিয়ে সরে পড়। কাপ্তান টেকার মূর্তি দেখে আর কোনও প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। কথা হল, আজ রাতটা ওরা সবাই এখানে থাকবে। থেকে, পরদিন ওদের সবাইকে তুলে নিয়ে চলে যাবে।

সে রাত্রে গ্রামে আর হাঁস, মুর্গি, শুয়োর কিছু রইল না। চীনেরা দুগুণ তিনগুণ দামে কিনে ফেলল। যে যা দাম চাইল তার জিনিসের জন্যে, দ্বিরুক্তি না করেই চীনেরা তা দিয়ে দিল। তাড়া তাড়া নোট পেয়ে রারোইয়াবাসীরা খুব খুশী। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফেলার পর দেখা গেল চীনেরা তাসপাশা সব নিয়ে রারোইয়াবাসীদের সঙ্গে খেলতে বসে গেছে। ভোর পর্যন্ত জুয়া

খেলে, চীনেদের কাছে জিনিস বেচে যে কটা টাকা ওরা পেয়েছিল তার শেষ পাইটা অব্দি চুষে নিয়ে, চীনেরা উঠে পড়ল। বলে গেল, ওদের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে তৈরী হতে বল। আমরা জাহাজের মোটরটা ততক্ষণ মেরামত করে নিই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটরের শব্দ শোনা গেল। আর উর্ধ্বশ্বাসে কাকে যেন ঘাটের দিক থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল। বলল, শিগগির, শিগগির এস, ওরা যে চলে গেল।

অ্যাঁ বলিস কি? দৌড় দৌড় দৌড়। কিন্তু বৃথা। পূর্ণবেগে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে ওরা। এরই মধ্যে ডাঙা থেকে অনেকখানি সরে গেছে জাহাজখানা।

দিন ছুয়েকের মধ্যেই সর্বনাশের গাছে ফল ধরল। হামের আক্রমণ মারাত্মকভাবে শুরু হল রারোইয়াতে। অর্ধেকের বেশী লোক আক্রান্ত হল। অনেকে মরল। ইহির ছেলেটাও মরল। ইহি কাঁদল, প্রচুর কাঁদল।

শেষপর্যন্ত কান্না থামাল ইহি। ছেলের শেষ কাজ সম্পন্ন করল। যা ছিল ওর পুঁজিপাটা ছেলেকে সমাধিস্থ করতেই তা ফুরিয়ে গেল।

তারপর ইহি নিজেও মরল ওই রোগে।

এইবার দেখা দিল আরেক সমস্যা। ইহির ছেলে মরলে ইহি তার সমাধির ব্যবস্থা করেছিল। এখন ইহির সমাধি দেয় কে? ইহি বেওয়ারিশ। ও এখানকার মেয়েও নয়। অন্য দ্বীপে জন্ম। রারোইয়ার এক রমণী ওকে পুষ্যি নিয়েছিল। তা সেও তো বিয়ে করে অন্যত্র চলে গেছে। তবে? কে এখন দায়িত্ব নেবে? খরচপত্র যোগাবে কে?

হঠাৎ টেকার মাথায় বুদ্ধি গজাল। ইহি মুক্ত জীবনযাপন করেছে। সুন্দরী বলে নামডাকও ছিল তার। কমসে-কম ডজন-খানেক পুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে সে। এখন তারাই দিক ইহির শেষ খরচা। ফূর্তির ট্যাক্সো।

টেকা হুকুম জারী করল, ইহির পুরুষ যারা ছিলে তারা এস, ইহির সমাধির খরচ দিয়ে যাও।

দেখতে দেখতে সাড়া পড়ে গেল গ্রামে। লোকের পর লোক এল। টাকা দিল। সেই টাকায় চমৎকার এক কফিন কেনা হল। এত সুন্দর কফিন সেই গ্রামের আর কারো ভাগ্যে জোটে নি। রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়ে কফিনটা সাজান হল। কফিন সাজাতে গোটা রারোইয়া ভেঙে পড়ল। ব্যাধির আক্রমণে দেহ জর্জরিত সবার। কিন্তু তা বলে মন কেন পঙ্গু হয়ে পড়বে? এই ইহি, এ ছিল রারোইয়ার মুক্ত জীবনের প্রতীক। রারোইয়ার দুর্দান্ত প্রাণ। আজ সে চলে যাচ্ছে। রারোইয়ার আপদবালাই সব নিয়ে চলে যাচ্ছে। এসো, তাকে রারোইয়ার সম্মানে ভূষিত কর।

ভাল কফিন জুটেছে তার। ভাল জায়গাও চাই।

একটু উঁচুতে একখণ্ড ভাল জমি আছে। একটা লোকেব কফিন ধরতে পারে। তিনদিকে তার পাথরের প্রাচীর। একদিকে সমুদ্র। সেদিক খোলা। তবে জায়গাটা একটু উঁচুতে। কিন্তু এই রুগ্ন শরীরে এই ভারী কফিন অত উঁচুতে তোলা যাবে কি?

টেহেই বলল, হয় ওই জায়গাটা এখানে টেনে নামাতে হয়, না হয় কফিনটা ওইখানে তুলতে হয়। জায়গাটাকে নীচে যখন নামান যাবে না তখন আর বৃথা সময় নষ্ট করা কেন? কফিনটাকেই ওখানে তুলি এস।

রুগ্ন পিঠগুলো আরো দুমড়ে গেল কফিনের ভারে। কিন্তু ইহির কফিনও উঠল। ড্যানিয়েলসন চুপচাপ সব দেখলেন। তারপর মনে মনে বললেন, অদম্য, তোমারই আরেক নাম বোধ হয় রারোইয়া?

১০

সে এক আশ্চর্য সন্ধ্যা। সে এক আশ্চর্য পরিবেশ। এমন একটা লোকের দেখা পাবেন, সত্যিই পাবেন, ড্যানিয়েলসন তা ভাবতে পারেন নি।

জীর্ণ শীর্ণ আসবাব তৈজসহীন ঘরখানার মধ্যে শুয়ে থাকা থুত্থুড়ে এই বুড়োটার দিকে চেয়ে ড্যানিয়েলসনের মনে হল, হ্যাঁ এই সেই লোক। যাকে খুঁজছি। পৃথিবীর জন্মকালেই বোধ হয় এরও জন্ম হয়ে থাকবে।

এই সেই টে ইহো, টাপাকিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করে ড্যানিয়েল-সনের কানে কানে বলল। এই হচ্ছে শেষ 'টাহুঙ্গা', শেষ জ্ঞানী বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ মানে? বল, আদ্যিকালের লোক।

টাপাকিয়া তেমনি চাপা স্বরে সসম্ভ্রমে বলল, ও সব-কিছু জানে।

ড্যানিয়েলসন আশ্বস্ত হলেন। কয়েক মাস ধরে তাঁর খোঁজার আর বিরাম ছিল না। পলিনেশিয়ার ইতিহাস জানে পুরাণ জানে এমন কাউকেই তিনি খুঁজছিলেন।

কিন্তু হায়! পুরনো দুনিয়ার সঙ্গে তার কথা, তার কাহিনী, তার পুরাণ ইতিহাসও বুঝি বিদায় নিয়েছে রারোইয়া থেকে।

ওরা যখন টে ইহোর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে আবছা আলোয় ওঁরা দেখলেন, শ্রীহীন একখানা ছোট ঘর। টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সারা দেওয়ালে সজ্জা বলতে শুধু যীশুর একখানা রঙচঙে ছবি। নিরাভরণ দেওয়ালে উগ্র রঙদার ছবিখানা দেখে ড্যানিয়েলসনের চট করে মনে হল, ওখানা যেন আমেরিকান সিগারেটের বিজ্ঞাপন। ঘরের

এক কোণে কতকগুলো ছেঁড়া চট। মেঝেটা এবড়ো-খেবড়ো। দেখলেই মনে হয়, ঘরের জন্মে কখনও তার গায়ে সিমেন্টের পোঁচ পড়ে নি। সেই ঘরে, একটা খালি জ্যামের টিন মাথায় দিয়ে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাচ্ছে টে ইহো। পক্বকেশ লোলচর্ম এই বৃদ্ধকে দেখে ড্যানিয়েলসনের শ্রদ্ধা হ'ল।

ডাকাডাকি করতেই টে ইহোর ঘুম ভাঙল। ধীরে ধীরে উঠে ঘরের বাইরে তিনি বেরিয়ে এলেন।

ভিতরের আবছা আঁধারে ভাল করে বোঝা যায় নি। বাইরে যেটুকু আলো তখনও ছিল, তাই যথেষ্ট। তাইতেই টে ইহোকে স্পষ্টভাবে দেখা গেল। আর দেখেই চমকে উঠলেন ড্যানিয়েলসন। এ কী! এ যে শ্বেতাঙ্গ! তাঁর রঙ দক্ষিণ ইউরোপবাসীর চেয়ে কালো নয়, তাঁর দাড়ি চুল ধূসর সাদা। চেহারায় একেবারে খ্রীষ্টমাস বুড়ো বলেই যেন তাঁকে মালুম হয়।

ওঁদের দেখে বৃদ্ধ হেসে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর ঘরের দরজায় শান্তভাবে বসে ওঁদের আসবার কারণ জানতে চাইলেন।

ওঁরা বললেন, ওঁরা পুরাকাহিনী শুনতে এসেছেন তাঁর মুখ থেকে।

কিন্তু সে কথা যেন বৃদ্ধ শুনতে পেলেন না, কিংবা শুনলেও যেন তার মর্ম গ্রহণ করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে ওঁদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর অকস্মাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে হেসে উঠলেন। পাগলের মত হাসতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

নিজেকে সংযত করে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, মাফ করবেন, আপনি সাহেব, বিদেশী। আপনি এসে আমার দেশের পুরাণ জানতে চাইছেন। আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আর আমার দেশের লোক এ-বিষয়ে দৃকপাতও করে না। কথাটা মনে পড়তে বড় হাসি পেল। তাই হেসেছি। মাফ করবেন আমাকে।

আবার একেবারে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। টাপাকিয়া চট করে উঠোনে আগুন জ্বেলে আলো করল। সেই আগুনের কম্পিত আলো বৃদ্ধের মুখে নেচে নেচে তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে লাগল।

বৃদ্ধ বলে উঠলেন, এই দেখুন আমার চুল। পাকা শণ হয়ে গেছে। আজ নয়, এই টাপাকিয়া যখন এই এতটুকু ছেলে, নারকোলের মালায় নৌকো বানিয়ে জলে ভাসিয়ে খেলা করত যখন, তখন থেকে। আর আজ ও কত বড় হয়ে গেছে। ওর ছেলেরাই এখন লেগুনের জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটছে। কতদিন যে কেটে গেল!

যেই আমার চুলে পাক ধরল, তখনই আমি ভাবলুম, আমি বুড়ো হয়েছি, বড় দুর্বল হয়ে পড়ছি, কবে আছি কবে নেই, যা জানি, তা ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে যাই। বয়স তো কম হয় নি। এই রারোইয়াকে কবে থেকে দেখছি। সেই পুরনো আমল থেকে। যখন লোকে পুরনো দেবদেবী পুজো করত, পুরনো আচার, সামাজিক বিধি মেনে চলত, সেই তখন থেকে রারোইয়াকে দেখছি। পুরনো তত্ত্ব, পুরনো জ্ঞান এখন এই তল্লাটে মাত্র আমিই জানি। আমি মরলে আমার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো আমলটাও মরবে। তাই ভাবলাম, ছেলে-ছোকরাদের জড় করি, যা জানি, ওদের দিয়ে যাই। ওরা জানুক, ওরা কারা, কোত্থেকে এসেছে, কেমন ছিল ওদের পূর্বপুরুষ। যত পুরনো গান ছিল, নাচ ছিল, সব ওদের শেখালাম। ওরা আগ্রহ করেই সে সব শিখল। কিন্তু যেই বলতে গেলাম, পূর্বপুরুষদের কাহিনী, অমনি ওরা ফুঃ ফুঃ করে তা উড়িয়ে দিল। বললে, তোমার এই প্রলাপ শোনবার সময় আমাদের নেই। সব ভেগে পড়ল। আমার চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। লিখতে পারি নে। জনে জনে ধর্ণা দিলাম, কত মিনতি করলাম, কত বললাম, আয়, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, আমি বলে যাই,

তোরা লিখে রাখ। একজনও এগিয়ে এল না। ভাবলাম, হয়ত বিধাতার ইচ্ছা নয়, এমন জিনিস টি ঁকে থাকে। অনেক অনেক দিন আগে তোমারই মত তিনটে সাহেব একদিন এল। তারাও বললে, তারা আমাদের পুরাণ-কথা শুনতে চায়। তারা বললে, কোথায় যেন যাচ্ছে, ফিরে এসে আমার কাছ থেকে সব জেনে নেবে। কিন্তু তারা গেল, আর ফিরল না। দিন মাস বছর, কত বছর কেটে গেল, কেউ এল না! সাহেবরা আসবে বলে গেছে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আকুল প্রতীক্ষায় কাল কাটিয়েছি। বালিয়াড়িতে বালিয়াড়িতে, সমুদ্রের তীরে তীরে ঘুরে বেড়িয়েছি। সাহেবদের জাহাজ যদি দেখা যায়। বৃথা বৃথা বৃথা। সব মিছে হয়ে গেছে। এখন তুমি এসেছ। কোত্থেকে এসেছ জানি নে। কেমন করে আমার সন্ধান পেলে জানি নে। আমাদের পুরাণ-কথা কেন শুনতে চাও, তাও জানি নে। জানতেও চাই নে। তবে এসেছ যখন, শুনতে চেয়েছ যখন, বিমুখ করব না, শোনাব।

বৃদ্ধ হাসলেন। একটা টিনের কৌটো টেনে নিয়ে তার ভিতর থেকে আধপোড়া সিগারেটের টুকরো একটা বের করে ধরালেন। তারপর চোখ বুঁজে টানতে লাগলেন। স্তব্ধতা নেমে এল। অন্ধকারের মধ্যে সিগারেটটা মাঝে মাঝে জ্বলে উঠতে লাগল। উঠোনের আগুনে আরও কিছু নারকোলের পাতা গুঁজে দিয়ে আগুনটা উস্কে দেওয়া হল। সেই নিস্তব্ধ পরিবেশে, সেই অদ্ভুত পরিবেশে, দেশ কাল পাত্রের সংজ্ঞা যেন মুছে গেল। এই বৃদ্ধ যেন সেই আদ্যিকাল থেকে এই রকম সঙ্গীতময় স্বরে অনর্গল বলে চলেছেন ওঁর কথা। আর ড্যানিয়েলসন সেই আদি থেকেই যেন তা শুনে আসছেন। পলিনেশিয়ার অপূর্ব সৃষ্টি-তত্ত্ব।

বৃদ্ধ চোখ বুঁজে গুনগুন করে, কান্নার মত একঘেয়ে একটানা কী যেন আবৃত্তি করে চললেন। তার মানে আধো বোঝা যায়,

আধো যায় না। যেটুকু বোঝা যায় না, সেটুকু গিয়ে যেন চেতনার বদ্ধ দ্বারে মৃদু করাঘাত করে। আর অজানা অনেক রহস্যলোক এক সঙ্গে হাতছানি দেয়। ক্রমে নিজের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেন ড্যানিয়েলসন। চুপ করে নিস্পন্দ হয়ে শুনতে থাকেন একটানা সঙ্গীতময় ধ্বনি। ব্যঞ্জনাময় অপূর্ব শব্দসমষ্টি।

প্রথমে কিছু ছিল না। শুধু শূন্য। মহাশূন্য। না অন্ধকার না আলো, না ভূমি, না সাগব, না সূর্য, না আকাশ, কিছুই ছিল না। কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। ছিল শুধু শূন্য। অনাদি, অনন্ত অসীম, নিশ্চল, নিশ্ছিদ্র, এক মহাশূন্যের পাথার। যুগের পর যুগ পার হয়ে গেল এইভাবে। কত কোটি কল্প ঠিক নেই। অবশেষে নিশ্চল শূন্যে গতির সঞ্চার হল। ধীরে ধীরে এই মহাশূন্য পরিবর্তিত হল, এক মহারজনীতে। চলল মহা তমিস্রার যুগ। রাত্রি। রাত্রি। রাত্রি। সীমা নেই। শেষ নেই তার। কী ঘন, কী জমাট। কী নিশ্ছিদ্র অন্ধকার! আবার যুগের পর যুগ অতিবাহিত হল। শেষে এই তমিস্রারও একদিন সীমা দেখা গেল। তারপর হল সমুদ্র। শুধু তাই নয়, সমুদ্রের অতল তলে এক নতুন বস্তুর সৃষ্টি হল। বালি। বালি মাটিতে পরিণত হল, আর এই মাটি সমুদ্রতল থেকে ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। অবশেষে এলেন ফাকাহোটু, মাতা ধরিত্রী। ফাকাহোটু নিজেকে বিস্তৃত করলেন। তাই জন্ম হল ভূমির। ফাকাহোটু মাতার উপরে বিরাজ করতে লাগলেন, আটিয়া, আকাশ-পিতা।

কয়েক যুগ কেটে গেল। ওদের দুটি সন্তান হল। টানে আর টাঙ্গারোয়া। তারা দুজনে আটিয়াকে (আকাশ) উপরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। আকাশ মাটির উপর এমনভাবে চেপে আছে যে, তারা দেখল, না পাওয়া যাচ্ছে আলো, না পাওয়া যাচ্ছে জায়গা। তখন তারা বলল, এসো, আমরা আকাশটা মাটির থেকে আলাদা করে ফেলি। আর চেষ্টাও করল খুব।

কিন্তু পারল না। খুব শীঘ্রই রু ভাইদের জন্ম হল। এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আবার একটা চেষ্টা হল আকাশকে উপরে তোলবার। রু ভাইয়েরা একজনের কাঁধে আরেকজন দাঁড়িয়ে আকাশকে শেষ পর্যন্ত খুব উঁচুতে তুলে দিলে। এইভাবে ত্রিলোক সৃষ্টি হল—রাঙ্গি-পো অর্থাৎ পাতাল, রাঙ্গি-মারামা অর্থাৎ মর্ত্য আর রাঙ্গি বেরা অর্থাৎ স্বর্গ। টাঙ্গারোয়া হল সাগরের অধীশ্বর। আর টানে আকাশের গায়ে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাশি বসিয়ে দিল আর শেষ পর্যন্ত আকাশের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করলে।

দেবতার সৃষ্টি হল। পৃথিবী, আকাশ, সাগরেরও সৃষ্টি হল। সাগরে জলজ উদ্ভিদ, জলচর প্রাণী, মাছ প্রভৃতি বাড়তে লাগল। সবই একরকম সৃষ্টি হল, বাকী রইল শুধু মানুষ। তাই টাঙ্গারোয়া টিকিকে জন্ম দিলেন। এই টিকি, ইনিই হচ্ছেন আমাদের আদি পুরুষ। কিছুদিন পরে টিকির আর একা থাকতে ভাল লাগল না। তাই টিকির এক সঙ্গিনী সৃষ্টি করা হল। তার নাম হিনা। টাঙ্গারোয়া একমুঠো বালির থেকে হিনাকে বানিয়ে দিলেন।

টিকি আর হিনা জগতের মানুষ সৃষ্টি করলেন। সময়ের স্রোত তরতর করে বইতে লাগল। দিন রাত্তির ছুটে ছুটে পালাল। এমনি ভাবে কত দিন গেল। কত মাস, কত বছর কাটল। কত মানুষ জন্মাল, কত মানুষ মরল। পুরুষ পুরুষ এইভাবে কাটল। তারপর জন্মালেন মাউয়ি। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এর সমান আর কেউ জন্মান নি। মাউয়ি দেখলেন, সূর্য বড় তাড়াতাড়ি চলে যায়। ফলে দিনগুলোও খুব ছোট হয়ে পড়ে। তাই একদিন করলেন কি, যেই সূর্য তাড়াতাড়ি পালাতে শুরু করেছে, অমনি দড়ির ফাঁস দিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। তারপর তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যাতে সে ধীরে ধীরে চলে, তারপর তাকে ছেড়ে দেন। মাউয়ি মানুষকে কুকুর দিলেন, আগুন দিলেন। কিন্তু তাঁর সব থেকে বড় দান হচ্ছে এই রারোইয়া। তিনিও রারোইয়াকে

। তল থেকে ছিপ দিয়ে গেঁথে তুললেন, আর সৃষ্টিও সমাপ্ত

ইহো বোধহয় এত উৎসাহ এর আগে কখনও বোধ নি। এমন একনিষ্ঠ শ্রোতাও বোধহয় আগে কখনও পান গাই কথা তাঁর যেন শেষ হতে চা·. না। কথা শেষ হলেও দর থাকে। তার রেশ শেষ হতে চায় না।

়থায় এক হাভায়িকি? তাঁদের হারিয়ে যাওয়া পিতৃভূমি। সানাব দেশ। যে দেশ থেকে ওদের পূর্বপুরুষদের বিতাড়িত য়েছিল। টে ইহো জানেন না সে দেশের সন্ধান। তবে যে সেই হারানো পিতৃভূমিকে, হাভায়িকিকে জীবন্ত করে রাখা সেটা তিনি জানেন, সেটা তাঁর কণ্ঠস্থ।

দ্ধ গলা পরিষ্কার করে হাভায়িকির গান ধরলেন। টিনের র্ষার গভীর বাত্রে যেন একটানা বর্ষণ শুরু হল।

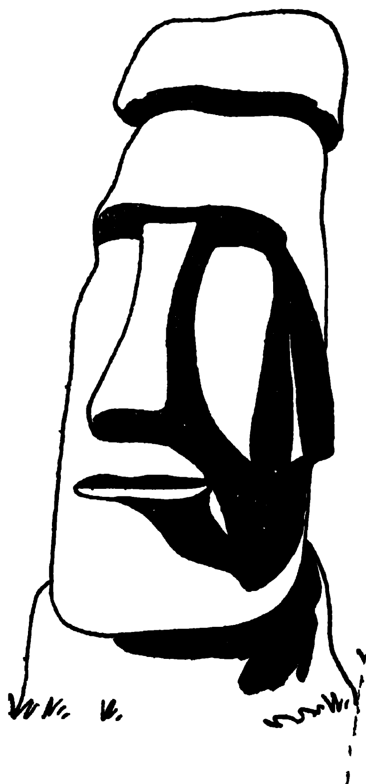
ভায়িকি—টে—এ—রুঙ্গা,
ভায়িকি—টে—এ—রাবো,
ভায়িকি—টাউটাউ—মায়ি,
গায়িকি—টাউটাউ—আটু ·· ··· ···

নকক্ষণ পরে, কতক্ষণ ড্যানিয়েলসনের সে খেয়াল ছিল না, ল, বেশ রাত হয়েছে। বাতাস বইছে নারকেল পাতায় দিয়ে। মনে হচ্ছে এই বৃদ্ধের এক করুণ আকৃতিই যেন র বেড়াচ্ছে। হাভায়িকি—টে—এ—রুঙ্গা···

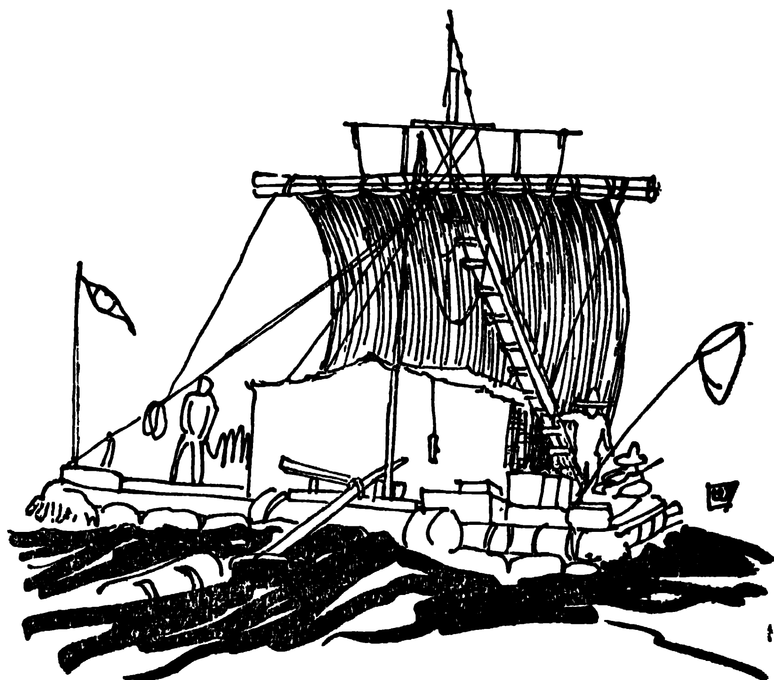
াায় ফেরার সময় হল। ওরা নিঃশব্দে উঠে পড়লেন। বৃদ্ধ র দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি ফেলে বসে রইলেন স্থাণুর মত। দতে আসতে পথের বাঁকে বিরাট এক প্রস্তর-মূর্তি নজরে

াাকিয়া বললে, ঐ যে টিকি। আমাদের আদি পুরুষ। ক। এই—সেই টিকি। বিস্ময় লাগল ড্যানিয়েলসনের।

দু-বছর আগের কথা মনে পড়ল। এই টিকি সম্বল দু-বছর আগে একদিন ওরা বেরিয়ে পড়েছিলেন দক্ষিণ আ(থেকে। ভেলায় করে দুস্তর সাগর পাড়ি মেরে রারে পৌঁছেছিলেন। এক নরওয়েবাসী বৈজ্ঞানিক, থর হেয়ার নেতৃত্বে পৃথিবীর অন্যতম দুঃসাহসিক অভিযান—"কন- অভিযানের শরিক হয়েছিলেন। রারোইয়ার সঙ্গে ড্যানিয়েে পরিচয়ের সেই তো সূত্রপাত।



দ্বিতীয় খণ্ড ঃ স্বর্গের উদ্দেশে



১১

আশ্চর্য, একদিন থর হেয়ারডালকেও এমনি ধারা এক গল্প শুনতে হয়েছিল। এমনি ধারা এক বৃদ্ধ সেদিন তাকে বলেছিল, টিকিই হচ্ছেন আমাদের দেবতা। তিনিই আমাদের প্রভু। আদি পিতা।

হেয়ারডাল কিন্তু এ গল্প রারোইয়াতে শোনেন নি। রারোইয়ার নামও তখন তিনি জানতেন না। এ "কনটিকি" অভিযানের বহু বছর আগের কথা। টোয়ামটু দ্বীপপুঞ্জের কিছু উত্তরে আরেকটি দ্বীপে, ফাটুহিভাতে, এসেছিলেন হেয়ারডাল। জীববিজ্ঞানী তিনি। সস্ত্রীক এসেছিলেন তাঁর স্বদেশ নরওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় এই অঞ্চলের কিছু পোকামাকড়ের নমুনা সংগ্রহ করে উপহার দেবেন বলে।

কে জানত, পলিনেসিয়া তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে? কে জানত, এক জীববিজ্ঞানী পরিণত হবেন এক নৃতত্ত্ববিদে? কে জানত, এই অ্যামেচার নৃতাত্ত্বিকই শেষ পর্যন্ত নৃতত্ত্বের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করে সবাইকে অবাক করে দেবেন? কে জানত, নিজের তত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্য মরিয়া হয়ে এই দুঃসাহসী ৪৩০০ মাইল অজানা সাগর পাড়ি দেবেন মাত্র এক কাঠের ভেলায় ভেসে? পৃথিবীর দুঃসাহসিকতম এক অভিযানের নায়ক হবেন তিনি, তা কি থর হেয়ারডাল সেদিন সেই ফাটুহিভা দ্বীপের সমুদ্রোপকূলে এক উপত্যকায় কাঠখড় কুড়িয়ে জ্বালা আগুনের সামনে বসে এক অতি বৃদ্ধ পলিনেসিয়ের মুখ থেকে তাদের পূর্বপুরুষের গল্প শুনতে শুনতে নিজেও ভাবতে পেরেছিলেন?

পাশে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। সামনে আগুন। আগুনের ওপারে সেই বৃদ্ধ। বৃদ্ধের পিছনে সমুদ্র। প্রশান্ত মহাসাগর। হাজার হাজার মাইল জল। শুধু জল। এই জলের পরে যে ডাঙার

সীমানা তার হদিশ সেই বৃদ্ধ জানত না। হেয়ারডাল জানতেন। জানতেন এই বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপারে যে মস্ত বড় ভূখণ্ড তার নাম দক্ষিণ আমেরিকা।

হু হু করে বাতাস বইছিল। ঢেউগুলো বিপুল উল্লাসে মাতামাতি করছিল। আছড়ে প-ছিল ফাট্টুহিভার কঠিন তটভূমিতে। কোথা থেকে কোন মাটি ছুঁয়ে আসছে এই বাতাস? কত দূর থেকে কোন তট স্পর্শ করে আসছে এই তরঙ্গ? বাতাসের গতি যেদিক থেকে বইছে, যেদিক থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে, সেইদিকেই তো দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল ভূখণ্ড। এক নয়া দুনিয়া। তবে কি এই বাতাস, এই ঢেউ সেখান থেকেই আসছে? এই দুস্তর ব্যবধান, জলের এই বিশাল নিষেধ ডিঙিয়ে সেই বাতাস এই দ্বীপে, এই নারকেল বনে, তাদের চুলে স্নেহস্পর্শ বুলাতে এসেছে? এক পুরনো সভ্যতার জননী, আজটেক, মায়া, ইনকা সভ্যতার জন্মভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার কূল ছুঁয়ে কোল ছুঁয়ে আসছে এই যে তরঙ্গরাশি, সতত ভেঙে পড়ছে পলিনেসিয়ার দ্বীপগুলোর তটে তটে, তারা আসছে কোন আবহমানকাল থেকে? সৃষ্টির প্রাগুষা থেকে কি? কত যুগ ধরে? কে জানে? কে তার হিসেব রাখে? তবে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে যে চলা শুরু হয়েছে এদের তা মুহূর্তের জন্যও থামেনি কখনও। গতির তীব্রতা কখনও কিছু কমেছে, কখনও কিছু বেড়েছে। কখনও ধীর পদ-সঞ্চারে, বাণিজ্যবায়ুর সওয়ার হয়ে নবজলদকান্তি বিনোদের বেশে মৃদু মৃদু হেসে তার আগমন হয়েছে। আবার কখনও ভীম ভয়াবহ বেগে ভ্রূকুটি কুটিল কালবৈশাখীর খ্যাপা ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে হৈ হৈ করতে করতে ভাঙতে ভাঙতে মুহূর্তে মিলিয়ে গেছে আরেক দিগন্তে।

বাতাসের গতিপথের উৎসের দিকেই চেয়ে ছিলেন ওরা তিনটি প্রাণী। থর হেয়ারডাল, তাঁর স্ত্রী আর পলিনেসিয়ার সেই বৃদ্ধটি। পুরনো মহিমার অতি বৃদ্ধ সাক্ষীটি। কারও মুখে কথা ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে অবাধ সমুদ্রের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই সেই বৃদ্ধ অতি গম্ভীর স্বরে (ঢেউয়ের গর্জনের ঘাটের সঙ্গে তার স্বর সে যেন বেঁধে নিয়েছে, অন্তত শুনতে শুনতে হেয়ারডালের তাই মনে হচ্ছিল) বললে, ঐ টিকি, উনিই আমাদের দেবতা, আমাদের প্রভু, আমাদের আদিপুরুষ। আমি লেখাপড়া জানিনে, মুখ্যু লোক। বেশী কথা বলতে পারব না। তবে যা শুনেছি বাপ দাদার কাছ থেকে তাই বলি। কর্তারা বলতেন, এই টিকিই কয়েক পুরুষ আগে আমাদের বাপ দাদাদেরও বাপ দাদাকে, নাকি এই সব জায়গায় আনেন। তার আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা থাকতেন বিরাট এক দেশে। সমুদ্রের ঐ অপর পারে।

সেদিন সেই জোর বাতাসের শব্দ, ঢেউ-এর ক্রুদ্ধ গর্জন, বৃদ্ধের সেই আশ্চর্য গম্ভীর কণ্ঠস্বর, এসব মিলিয়ে এক মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেই পরিবেশে বসে শোনা টিকির কাহিনী থর হেয়ারডালের মনে এমন গভীর ছাপ ফেলল, যা মুছে ফেলা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হল না। টিকি। টিকি। টিকি। এই নামটি যেন থর হেয়ারডালকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল।

সে রাত্রিতে হেয়ারডালের ঘুম আর আসতে চায় না। নিষ্প্রদীপ ঘরে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে এলোমেলো একরাশ চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়েন হেয়ারডাল। আর ঐ সব অস্পষ্ট, অজানা রহস্যের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে একটি চেনামুখ যেন বার বার তাঁর নজরে পড়ে। টিকি। কে এই টিকি? কি তাঁর পরিচয়? কোথায় তাঁর দেশ? কেমন করে হল তাঁর এখানে, এই পলিনেসিয়ায় আগমন?

রাত্রি বাড়ছে। প্রতিদিনের মত বাতাসের বেগ বাড়ছে। ফাটুহিভার তটে এসে শত তরঙ্গ তরল কলরবে আছড়ে পড়ছে। টিকি। হেয়ারডালের সমগ্র চিন্তা জুড়ে সমগ্র সত্তা আচ্ছন্ন করে বিরাজ করছে ঐ একটি অস্তিত্ব। টিকি। এই অশান্ত বাতাসে

প্রশান্ত মহাসাগর যেমন চঞ্চল, যেমন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, তেমনি চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে হেয়ারডালের মনে। টিকি। কে এই টিকি? কি তাঁর পরিচয়? কোথায় তাঁর দেশ? কেমন করে নামহীন, গোত্রহীন, মূল ভূখণ্ডেব সঙ্গে সংযোগ বিহীন হাজার হাজার মাইল সমুদ্র দিয়ে ঘে া এই দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, এই পলিনেসিয়ায়, এসে বসতি স্থাপন করলেন।

হেয়ারডালের স্ত্রী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, বাতাস আর ঢেউয়ের এই যে দ্বৈত-সঙ্গীত, এ বড় অদ্ভুত লাগে। কি বল?

অন্যমনস্কভাবে হেয়ারডাল জবাব দেন, হুঁ।

আচ্ছা, এই সঙ্গীত তো দ্বীপটার ওধারে শোনা যায় না? শুধু এদিকটাই দেখি সর্বদা চঞ্চল। ব্যাপার কি বল তো?

এদিকটা বাণিজ্যবায়ুর গতিপথে পড়ে কি না, তাই—

অভ্যাসবশে হেয়ারডাল জবাবটা দেন। আরও কিছু হয়ত বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ গভীর অন্ধকারে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। চমকে উঠলেন, উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হেয়ারডাল। আর শুয়ে থাকতে পারলেন না। বিছানার উপর উঠে বসলেন। বাতাসের তেজী গান যেদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল, সেই দিকেই মুখ ফিরিয়ে বসলেন। বাণিজ্যবায়ুর মোহময় গান শুনতে লাগলেন বসে বসে। মনে মনে ভাবলেন, এই বাণিজ্যবায়ু, এ যাত্রা করছে পূর্ব থেকে। বয়ে চলেছে পশ্চিমে। চন্দ্র-সূর্যেব গতিপথের যেমন পরিবর্তন নেই, যেমন পরিবর্তন নেই পৃথিবীর আবর্তনের, তেমনি এই বাণিজ্যবায়ু, এরও কোনও পরিবর্তন নেই চলার। সৃষ্টির প্রথম সূর্যোদয় থেকে আজ পর্যন্ত বয়ে চলেছে সুস্থির, ধ্রুব, সেই এক লক্ষ্যে, এক গন্তব্যে। পশ্চিমে। পূব থেকে পশ্চিমে।

এই ফাটুহিভা। এর যে তটে বাণিজ্যবায়ু এসে আছড়ে পড়ে, তার পূবে সমুদ্র। সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগর। হাজার হাজার মাইল জল। শুধু জল। আর তারপর? আবার এক উত্তেজনার

প্রবাহ হেয়ারডালকে ধাক্কা মারে। তারপর যে ডাঙা, সে তো দক্ষিণ আমেরিকা। বোধ হয় পেরুর উপকূল।

ধীরে ধীরে অন্ধকার যেন ফিকে হয়ে আসে। কয়েক বছর আগে ঐ সব অঞ্চলে ঘুরেছিলেন হেয়ারডাল। ইনকা-ভারতীয়দের সম্পর্কে কিছু খোঁজখবরও নিয়েছিলেন। পলিনেসিয়ার এই সব পিরামিড, এই সব বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তির সঙ্গে ইনকাদের দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলোর কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে বলে হেয়ার-ডালের মনে হতে লাগল।

হেয়ারডাল তাঁব স্ত্রীকে ডাকলেন, শুনছ?

ঘুমজড়িত তাঁর স্ত্রীর কণ্ঠ অভ্যাসবশে সাড়া দিল, উঁ?

ছাখ, এদের এই টিকির মূর্তিগুলোর মত মূর্তি আমি যেন দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়ে জঙ্গলে দেখেছি। সেগুলো অতীত এক সভ্যতার সাক্ষী। দুয়েব ভিতর আশ্চর্য মিল আছে কিন্তু।

হেয়ারডালের স্ত্রী আর কোনও সাড়া দিলেন না। তবে সেই মুহূর্তে বিরাট এক ঢেউ বেশ শব্দ করে আছড়ে পড়ল। সে আওয়াজ হেয়াবডালের কানে গেল। তাঁব মনে হল, তিনি যেন এক পরম উৎসাহী শ্রোতার সমর্থন পেলেন। শুধু তাই নয়, হেয়ারডালের কেন যেন মনে হল, এ সোৎসাহ সমর্থন টিকিরই।

১২

থর হেয়ারডাল ফিরে এলেন তাঁর স্বদেশে, নরওয়েতে। বিশ্ব-বিদ্যালয় সংগ্রহশালায় উপহার দিলেন নানা বোতল-বয়ামে ভরা অজস্র পলিনেসীয় কীটপতঙ্গ পোকামাকড়। নানা জীব। নানা প্রাণী। নানাপ্রকার মাছ।

হেয়ারডাল পলিনেসিয়া ছাডলেন। কিন্তু পলিনেসীয়দের আদিপুরুষ টিকি তাঁকে ছাড়ল না। যে সব প্রশ্ন ফাটুহিভাতে

থাকবার সময় তাঁর মনে উদয় হয়েছিল, যে রহস্য আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে, তা হেয়ারডালকে সুস্থির থাকতে দিল না।

হেয়ারডাল স্থির করলেন, এ রহস্যের সমাধান করতে হবে। কিন্তু নরওয়েতে থাকলে কোন সুবধে পাওয়া যাবে না। তাই ঠিক করলেন, নিউইয়র্কে যাবেন। সেখানে বড় বড় গ্রন্থশালা আছে। সর্বাধুনিক সংগ্রহশালা আছে। পলিনেসীয়রা কোন্ দেশ থেকে এসেছে, কোথায় তাদের আদি পিতৃভূমি তার হদিশ হয়ত ঐসব জায়গায় মিলবে।

হেয়ারডাল জীবতত্ত্বের সাধনায় আপাতত ইস্তফা দিলেন। গ্রহণ করলেন নূতন পেশা। নৃতত্ত্ব। নরওয়ে ছেড়ে আমেরিকা এলেন। তারপর চলল তাঁর অক্লান্ত অনুসন্ধান।

পলিনেসীয়দের মুখে মুখে তাদের পূর্বপুরুষেব যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে আন্দাজ হয় যে, দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপগুলিতে এদের আগমন ৫০০ খ্রীষ্টাব্দেব আগে হয়নি। আর এরা একবারে কেউ আসেনি। এসেছে দলে দলে। বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ বছর পরে পরে। ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের পর আর কোন দল এসেছে কিনা, তার হদিশ আর পাওয়া যায় না।

পলিনেসিয়ার আয়তন নিতান্ত কম নয়। উত্তরে হাওয়াই, দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড, পশ্চিমে সামোয়া আর পূর্বে ইসার দ্বীপ। এই হল পলিনেসিয়ার সীমানা। এই সীমানার মধ্যে বিরাট বিশাল সমুদ্রের জলরাশি। ইওরোপের মত চারটে মহাদেশকে এক সঙ্গে এই জলে ডুবিয়ে রাখা যায়। আর সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে মধ্যে ছড়ান রয়েছে অজস্র দ্বীপপুঞ্জ। পলিনেসিয়া। সারা দুনিয়া গড়ার পর বিধাতার হাতের আঙ্গুলে যে ছিটেফোঁটা কাদামাটি লেগে ছিল, হাত ঝেড়ে বিধাতা তা বোধ করি এই অঞ্চলে ফেলেছিলেন। আর তাতেই হয়ত এই পলিনেসিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

একটি দ্বীপের সঙ্গে অন্যটির সংযোগ নেই। জলের দুস্তর ব্যবধান। এই ব্যবধান জগতের থেকেও এদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

কিন্তু তবুও আশ্চর্য এই যে, পলিনেসিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে যে অজস্র দ্বীপ, সেইসব দ্বীপ-বাসীরা মোটামুটি একই ভাষা বলে, একই উপাস্যের পূজা করে (অন্তত খ্রীষ্টীয় প্রচারকরা এসব দেশে পা দেবার আগে তা-ই করত)। কাহিনী, পুরাণ উপকথা, গাথা প্রভৃতিও এদের এক।

এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় না-কি, যে এই পলিনেসীয়রা যেখান থেকেই এসে থাকুক না কেন, তারা এসেছে সব একই জায়গা থেকে? অন্তত হেয়ারডাল যে তথ্য জোগাড় করতে পারলেন, তাতে তিনি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলেন। যেখান থেকেই আসুক, এদের এই পলিনেসীয়দের উৎপত্তি একই জায়গায়।

তাহলে, সে জায়গা কোথায়? কোন্ দেশে?

এ বিষয়ে হেয়ারডাল দেখলেন, নানা মুনি নানা কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন, এদের আদি বাসভূমি মালয়ে, কেউ বলেছেন, ভারতে, কেউ বলেছেন, চীনে। জাপান, আরব, মিশর, ককেশাস, আটল্যান্টিস, জার্মানী, এমন কি নরওয়েকেও রেহাই দেননি পণ্ডিতরা। নিজের তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য তাঁরা যে সব যুক্তি তথ্য হাজির করেছেন তার মধ্যে যে ফাঁক আছে, তা আর কেউ ভরাট করতে পারেন নি।

যুক্তি যেখানে পিছিয়ে পড়ে, সেখানে কল্পনা আসে এগিয়ে। কেউ কেউ বলেছেন এই পলিনেসিয়া, এ চিরদিন এইভাবে জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ছিল না। বড় বড় মহাদেশের সঙ্গে কোনও না কোনও সূত্রে সংযুক্ত ছিল। তারপর হয়ত কোনকালে এক বিরাট ভূমিকম্প হয়ে থাকবে, যার ফলে মাঝখানের ভূমি সমুদ্রগর্ভে গেছে তলিয়ে। আর পলিনেসিয়াও গেছে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কিন্তু ভূতাত্ত্বিক যাঁরা,

যাঁরা জীবতত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন তারা এইসব উটকো তত্ত্বে কান দেন না। তাঁরা এইসব দ্বীপে যে সব নমুনা পেয়েছেন তাতে তাঁরা বুঝেছেন, এইসব দ্বীপপুঞ্জ অনন্তকাল ধরে এমনি বিচ্ছিন্ন হয়েই আছে।

থর হেয়ারডালের সিদ্ধান্তও তাই। তিনি খোঁজখবর করে যেসব তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করলেন তাতে তার ধারণা দৃঢ় হল যে, এইসব পলিনেসিয়রা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এই দ্বীপগুলোতে এসেছে বাইরে থেকে।

আরও একটা বিষয় হেয়ারডালের নজরে পড়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, পলিনেসিয়ায় যারা এসে বসতি করেছিল, সভ্যতা বিস্তার করেছিল, তারা প্রস্তরযুগের লোক। তখনকার বিরাট বিরাট মূর্তিতে, স্মৃতিস্তম্ভে, পিরামিডে যে সভ্যতার স্বাক্ষর রয়ে গেছে, তা প্রস্তরযুগের সভ্যতাই। ওরা লোহার বা ব্রোঞ্জের ব্যবহার আদৌ জানত না।

এরা যদি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে শেষবারের মত পলিনেসিয়ায় এসে থাকে, তাহলে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে তখনও প্রস্তরযুগের সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। সেটা কোন্ দেশ? দক্ষিণ আমেরিকা। ওখানে বহুদিন পর্যন্ত প্রস্তর যুগীয় সভ্যতা ছিল।

স্পেনীয় পর্যটকরা যে সময় পেরুতে এলেন, তখন সেখানে ছিল ইনকাদের বিরাট সাম্রাজ্য। বিরাট বিরাট পাথরের মূর্তি, পিরামিড, স্মৃতিস্তম্ভ চারিদিকে অজস্র ছড়ান আছে দেখে স্পেনীয়রা অবাক হয়ে যান। ইনকাদের মুখেই ওরা শোনেন, যে ওসব তাদের তৈরী নয়। ইনকাদের আগে সেই অঞ্চলে আরেকটি জাতির রাজত্ব ছিল। তারা দেখতে সুপুরুষ। রং ফর্সা, লম্বা চেহারা, সুন্দর দাড়ি গোঁফ। তারা ছিল নির্বিরোধী। সভ্য। এই ইনকাদের পূর্ব পুরুষরা তাদের কাছ থেকেই চাষবাস শেখে। মূর্তি গড়া শেখে। আচার আচরণ সহবত, সব কিছু তাদের কাছ থেকেই শেখা। একদিন হঠাৎ

তারা যে কোথায় উধাও হয়ে গেল, কেউ জানে না। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল থেকে একদিন তারা নাকি ভেসে পড়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরের জলে। যাত্রা করেছিল পশ্চিমদিকে। তারপর তাদের কি হল কেউ জানে না।

বহু বছর পর, ইওরোপ থেকে বিভিন্ন জাতি নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় দিগ্বিদিকে জাহাজ ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তাদের কোন কোন দল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে পৌঁছে, অবাক হয়ে লক্ষ্য করলে, তাঁদের দেখে যে সকল দ্বীপবাসী কৌতূহলী হয়ে তটভূমিতে এগিয়ে এসেছিল, তারা সবাই গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, উন্নতনাশা, লোহিত কেশ। চেহারায় একেবারে প্রায় সেমেটিক। তারা বলত, তাদের পূর্বপুরুষরা এখানে এসেছে এক বিরাট দেশ থেকে। সে দেশ সূর্যকরোজ্জ্বল। সে দেশ পর্বতময়। সে দেশ পরম রমণীয়। তাদের দেবতা হচ্ছেন, টাঙ্গারোয়া, কানে (কোনও কোনও জায়গায় টানে) আর টিকি।

হেয়ারডালের গবেষণা চলতে লাগল। বছরের পর বছর তিনি কাটিয়ে দিলেন নিউইয়র্কের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, সংগ্রহশালায় আর পেরুর পর্বতে প্রান্তরে।

অবশেষে হেয়ারডাল যা চাইছিলেন, যে হারানো সূত্রের সন্ধানে মরীয়া হয়ে ঘুরেছিলেন, তা অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেলেন। পেরুতেই পেলেন।

ইনকাদের একটা উপকথা হেয়ারডাল একদিন সংগ্রহ করলেন। এটা এক সূর্যরাজ বীরকচের কাহিনী। যে 'শ্বেত জাতি' পেরু থেকে অকস্মাৎ একদিন অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল এই বীরকচ ছিলেন তাদের রাজা।

বীরকচ নামটা ইনকাদের দেওয়া। বীরকচের আসল নাম হচ্ছে টিকি। কন্-টিকি বা ইল্লান টিকি অর্থাৎ সূর্য-টিকি বা অগ্নি-টিকি। ইনকারা যাদের 'শ্বেতজাতি' বলে, 'গুরু' বলে মান্য করে,

দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে, কন্-টিকি ছিলেন তাদের প্রধান পুরোহিত, তাদের সূর্যরাজ। টিটিকাকা হ্রদের তীরে তাঁর রাজধানী ছিল। সেখানে এখনও বহু ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। কন্-টিকি সুখে স্বচ্ছন্দে রাজ্য করছিলেন, এমন সময় কোকুম্বু উপত্যকার কারি নামে এক দলপতি কন্-টিকির রাজ্য আক্রমণ করে। ভীষণ যুদ্ধ হয় টিটিকাকা হ্রদের তীরে। কন্-টিকির নিদারুণ পরাজয় হয়। তার বহুলোক মারা যায়। শুধু কন্-টিকি তাঁর অন্তরঙ্গ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কোনরকমে সমুদ্রে ভেসে পড়েন। তারপর ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্তে অন্তর্হিত হয়ে যান।

এই কন্-টিকিই পলিনেসিয়ার প্রথম আবিষ্কর্তা। ওখানে তিনিই প্রথম বসতি স্থাপন করেন। ইনিই পলিনেসীয়দের আদিপুরুষ টিকি। টিকি রহস্য ভেদ হল এতদিনে।

পেরু থেকে দুস্তর সাগর পাড়ি দিয়ে পলিনেসিয়ায় কন্-টিকিই শুধু একা আসেন নি। তারপর বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দলের পর দল এসেছে পলিনেসিয়ায়। কেউ আশ্রয় প্রার্থী, কেউ বা আক্রমণকারী। প্রথম আগন্তুক সাদা মানুষদের সঙ্গে পুরুষ পুরুষ ধরে চলেছে নানা রঙের মিশ্রণ। আর তারই ফলে আধুনিক পলিনেসীয়দের সৃষ্টি।

না, আর সন্দেহ নেই। হেয়ারডাল নিঃসন্দেহ হলেন, এই পলিনেসীয়দের আদিপুরুষেরা এখানে এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকেই। পেরু অথবা তার সংলগ্ন অঞ্চলই ওদের আদি বাসভূমি। টিকি বা কন্-টিকির আদি সাম্রাজ্য ছিল এই অঞ্চলেই।

হেয়ারডাল এ-বিষয়ে বই লিখতে শুরু করলেন। এ এক নূতন তত্ত্ব। বিষয়টা এমন সামগ্রিকভাবে বিচার করে আর কেউ দেখেনি।

কিন্তু কাজ আরম্ভ করতে না করতেই রণদামামা বেজে উঠল ইওরোপে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধ-দেবতার প্রলয় নাচনে কোথায় পালাল টিকি আর তার পলিনেসিয়া!

তারপর একদিন সেই যুদ্ধও থামল। হেয়ারডাল ছুটি পেলেন সৈন্যবাহিনী থেকে। মিলিটারী পোশাকের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে আবার জেগে উঠল অমিত উৎসাহী এক বিজ্ঞানীর মুখ।

হেয়ারডাল ফিরে এলেন আমেরিকায়। নিউ ইয়র্কে। শেষ করলেন তাঁর রচনা। তারপর পরম উৎসাহে পাণ্ডুলিপি বগলে ক'রে পণ্ডিতদের দরজায় দরজায় ঘুরতে লাগলেন।

বদলে জুটল ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ। কেউ তাঁর কথা কানে তুললেন না। কেউ খুলে দেখলেন না একটি পাতাও। দূর, যত আজগুবি! স্রেফ গাঁজা। কোথায় পেরু আর কোথায় পলিনেসিয়া। বলে কি না পেরু থেকে বসতিকাররা গেছে পলিনেসিয়ায়। এ ছেলের হাতের মোয়া কিনা! ব্যাটা পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজ। আবার যাঁরা একটু সহৃদয়, তাঁরা আর অত কঠোর মন্তব্য করলেন না। আড় চোখে চেয়ে, ঠোঁটে অনুকম্পার হাসি টেনে বললেন, পাগল। লোকটা বদ্ধ পাগল। এসব নিছক পাগলামি।

পাগলামি? নিছক পাগলামি এই সব? এই এত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, এই সব প্রমাণপত্র, এই সব তথ্য, সবই ভুয়ো? সব মিথ্যে? তবে সত্য কি? হেয়ারডাল ভাবলেন বিজ্ঞান যদি মিথ্যে, যুক্তি যদি জোচ্চুরী, তবে সত্য কি? পণ্ডিতদের আকাশ-চুম্বী অবজ্ঞা, তাঁদের পর্বত-স্থাণু গোঁড়ামি? সত্য কি তবে ঐসব?

তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইলেই সত্যকে উড়ান যায় না। হেয়ারডালের অভিজ্ঞতা, তাঁর সত্যসন্ধ মন, তাঁর জ্ঞান, তাঁর বিজ্ঞানশুদ্ধ বুদ্ধি যা সত্য বলে জেনেছে, প্রমাণ করেছে, মেনেছে, তা ক'জন অবুঝের ফুঁয়ে এমনিভাবে উড়ে যাবে?

হেয়ারডাল ভাবেন আর ভাবেন। কিছু কূল-কিনারা পান না। কার কাছে যাবেন? কে তাঁর তত্ত্ব ধৈর্য ধরে শুনবে? মনে পড়ল এক বৃদ্ধের কথা। নৃতত্ত্বে পাণ্ডিত্য তাঁর অগাধ। বিশ্বময় তাঁর খাতির। ইনি নিশ্চয়ই উন্নাসিক নন। হেয়ারডাল ভাবলেন। নিশ্চয়ই এঁকে

বোঝাতে পারব। হেয়ারডালের আশা দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠল। তাঁর মন বলল, ইনি ফিরিয়ে দেবেন না। উড়িয়ে দেবেন না। আশা যেন তাঁকে সাহস দিল, ভয় কি, যাও না এঁর কাছে। যাও।

অনেক কুণ্ঠা, অনেক দ্বিধা জয় করে হেয়ারডাল শেষ পর্যন্ত হাজির হলেন বৃদ্ধের কাছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে যে কয় মুহূর্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হল, সেই কটি মুহূর্ত যেন আর ফুরোবে না বলে মনে হল। দরজা খুলল ঘরের। ভিতরে ঢুকলেন হেয়ারডাল।

যত আশা নিয়ে ঢুকেছিলেন তিনি, ততটাই নিরাশ হয়ে ফিরলেন।

আর তবে আশা কি? আর তবে ভরসা কাকে? তাঁর নাম নেই, পরিচয় নেই নৃতাত্ত্বিক সমাজে। একজন নবিশের মুখে নূতন কথা, এক দুঃসাহসিক তত্ত্ব কে শুনবে? ইনি মুখে মুখে সব শুনলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা ছুঁয়েও দেখলেন না। কপালে জুটল ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ।

তুমি কি গোয়েন্দা কাহিনী শোনাতে এসেছ ছোকরা?

খনখনে স্বরটা এখনও হেয়ারডালের কানের মধ্যে ঘুরপাক দিচ্ছে। এক বিষাক্ত পোকা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। এমনি জ্বালা।

কিন্তু সে জ্বালা হজম করে ধীরভাবে হেয়ারডাল জবাব দিলেন, আপনি আমার যুক্তিগুলো তো দেখেন নি। দেখলে বুঝতেন—

যুক্তি! নৃতত্ত্বের সমস্যা কি ডিটেকটিভ গল্পের রহস্য ভেদ করা?

কিন্তু আমার যুক্তিগুলো তো সব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করা। বিজ্ঞানকে তো মানতে হবে।

বিজ্ঞানের কাজ হল অনুসন্ধান। স্রেফ নির্ভেজাল অনুসন্ধান। অতি ধীরভাবে বৃদ্ধ পণ্ডিত বললেন, বিজ্ঞান গোয়েন্দা কাহিনী রচনা করতে চেষ্টা করে না।

একটু থেমে বৃদ্ধ বললেন, অবিশ্যি এটা সত্যি যে দক্ষিণ আমেরিকা অনেক পুরনো সভ্যতার জন্মভূমি। তবে সেই সভ্যতার জনকরা যে কারা ছিল, বা ইনকাদের তাড়া খেয়ে অকস্মাৎ কোথায়

যে অন্তর্ধান করল, তা আমরা জানিনে। তবে এটা নিশ্চিতভাবে জানি যে, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে একটি প্রাণীও প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোন দ্বীপে যায় নি। কেন জান?

তীব্র দৃষ্টিতে তিনি হেয়ারডালের দিকে চাইলেন। বললেন, এর জবাব সোজা। অতি সোজা। তারা কখনও সেখানে পৌঁছতে পারত না। তারা নৌকো কাকে বলে তা-ই জানত না।

হেয়ারডাল দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন, তা ঠিক। তবে তারা ভেলা কাকে বলে তা জানত। বালসা কাঠের ভেলায় করে তারা সমুদ্র পাড়ি দিত বলেই আমার ধারণা।

বালসা কাঠের ভেলায় চড়ে সমুদ্র পাড়ি, অ্যাঁ। বৃদ্ধ কুপ কুপ করে কিছুক্ষণ হেসে নিলেন। তারপর বললেন, তা বেশতো, ঐ পথে তুমিও ভেসে পড় না।

বিদ্রূপের তীক্ষ্ণধার ছুরিটা বৃদ্ধ যেন আমূল বসিয়ে দিলেন হেয়ারডালের মর্মে। কি জ্বালা! কি অপমান!

রাস্তায় নেমে হেয়ারডালের নজর পড়ল তাঁর পাণ্ডুলিপির উপর। কি যত্ন করে নামটা লিখেছিলেন, 'পলিনেসিয়া আর দক্ষিণ আমেরিকার সম্পর্ক'। জ্বল জ্বল করছে নামটা। কানে বাজছে বৃদ্ধ অধ্যাপকের ব্যঙ্গোক্তি, ঐ পথে তুমিও ভেসে পড় না।

হেয়ারডালের ইচ্ছে হল, পাণ্ডুলিপিটা ছুঁড়ে ফেলে দেন ডাস্টবিনে। কিন্তু কেন? পরক্ষণেই মনে হল, কেন? তি- ভুল করেছেন তা তো কেউ প্রমাণ করেন নি। কেউ তো পড়ে তাঁর রচনা। শুধু শুধু ব্যঙ্গ করেছেন। বিদ্রূপ করেছেন। এর সমুচিত জবাব দিতে না পারলে তাঁর জন্মই বৃথা।

পলিনেসীয়দের পূর্বপুরুষ টিকির নেতৃত্বে দক্ষিণ আমে- থেকেই যাত্রা করেছিল। আর কাঠের ভেলা করেই। বা- বায়ু আর সামুদ্রিক স্রোত তাদের নিয়ে ফেলেছিল পলিনেসিয়- এ বিষয়ে কোন সন্দেহ কোন দ্বিধা হেয়ারডালের নেই।

বেশ, তবে তাই হোক। বৃদ্ধের ব্যঙ্গই সত্য হয়ে উঠুক। হেয়ারডাল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এ তত্ত্ব প্রমাণ করতে আমাকে যদি দরিয়া পাড়ি দিতে হয়, বালসা কাঠের ভেলায় চড়ে, দেব। পেরু থেকে পলিনেসিয়ায় যেতে হয়, যাব। যাবই।

১৩

অতএব যাত্রা হল শুরু। এখন তুফানই উঠুক আর বাতাসই ছুটুক, পিছনে ফেরা নয়। শুধু এগিয়ে যাওয়া। বাণিজ্য-বায়ুর উপর নির্ভর করেই এগিয়ে যাওয়া। সমুদ্র স্রোতের নির্দিষ্ট গতিপথকে অবলম্বন করে এক দুস্তর লক্ষ্যে নিজেদের ছেড়ে দেওয়া।

এ ছাড়া আর করবারই বা কী আছে। পারহীন, সীমানাহীন অকূল মহাসমুদ্রে ভাসমান এই ছোট্ট কাঠের ভেলার আশ্রয়ে থেকে আর কী করতে পার তুমি? ছয়জন সঙ্গী দিবারাত্রকে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছেন। চার ঘণ্টা করে হাল ধরে বসে থাকতে হবে প্রত্যেককে। একজন যখন হালে গিয়ে বসবে, তখন তোমরা কী করবে? তোমরা আর পাঁচজন? কেন? রান্না করবে কেউ, কেউ ইচ্ছে করলে মাস্তুলে চড়ে বসতে পার, ইচ্ছে করলে গিটারও বাজাতে পার। বাতাসের গতি মাপতে পার, বেতার যন্ত্রটি চালাতে পার, ইচ্ছে করলে কাঠের পাটাতনের উপর শুয়ে চিত হয়ে বইও পড়তে পার। যা খুশি কর, বাধা কেউ দেবে না। তোমরা ছয়জন তো মাত্র প্রাণী।

না আরও একজন আছে। হেয়ারডাল নিজের ভুল তাড়াতাড়ি শুধরে নিলেন। তার নজরে পড়ল ভেলার চালে ঝোলান তোতা-পাখিটার উপর। একটা বড় ঢেউ লাগল ভেলায়। বেশ দুলুনি। তোতাটা পাখা ঝটপট করে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়টাতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ঠোঁট দিয়ে খাঁচার বেড়াটা ঠুকরে দেখতে লাগল তার তাকত কত।

হেয়ারডাল সেদিকে চেয়ে মনে মনে বললেন, ও-ওতো আছে। তাহলে তাঁরা সাতজন। ন'খানা বালসা কাঠের গুড়ি সম্বল করে পাড়ি মারছেন দরিয়া। পেরু থেকে মাটি ছেড়েছেন। লক্ষ্য হচ্ছে পলিনেসিয়া।

ভাবতে কত সোজা। যত সহজে ভাবা যায়, কাজ অত সহজে সমাধা করা যায় না। ভেলার উপর শুয়ে শুয়ে হেয়ারডাল সেই সব কথাই ভাবছিলেন।

এই তো সেদিন, নভেম্বরেও, তিনি লোকের দরজায় দরজায় ধর্না দিয়েছেন তাঁর পাণ্ডুলিপিটি বগলে করে করে। জুতোর তলা ক্ষইয়ে ফেলেছেন হেঁটে হেঁটে। কিন্তু কেউ শোনেনি তাঁর কথা। কেউ পাতা উল্টে পড়ে দেখেনি তাঁর লেখা। না পড়েই না শুনেই তাঁর তত্ত্বের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন সব বিখ্যাত বিশেষজ্ঞেরা। বিদ্রূপে ব্যঙ্গে জর্জরিত করেছেন তাঁরা হেয়ারডালকে। বারবার তাঁর মনে পড়ছে নিউইয়র্কের সেই বৃদ্ধ অধ্যাপকের বিদ্রূপাত্মক উক্তিটি। ইনকারা বালসা কাঠের ভেলায় চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিত শুনে যিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, কাঠের ভেলায়! তুমিও তাহলে ও পথে একবার চেষ্টা করে ছ্যাখ না।

তাই তো দেখছি। হেয়ারডাল মনে মনে বললেন। তাই তো ভেসে পড়েছি, এই অকূল দরিয়ায়। কী করছেন এখন, সেই বৃদ্ধ অধ্যাপক? হেয়ারডাল চোখ বুঁজে তাঁর মুখটা মনে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। খবরের কাগজে তাঁদের এই অভিযানের কথাও ফলাও করে ছাপা হয়েছে। নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে তাঁর। কফির পেয়ালায় চুমুক মারতে মারতে অভ্যাস বশে খবরের কাগজের পাতায় তাঁর দৈনন্দিন চক্ষু পরিক্রমা নিশ্চয়ই সারা হয়েছে। পড়েছেন কাঠের-ভেলা সম্বল ছয়জন অসমসাহসিকের প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেবার রোমাঞ্চকর খবুরে কাগজি বিবরণ। 'কী মনে হয়েছে তার তখন? ভারি জানতে

ইচ্ছে হয় হেয়ারডালের। এখানে, এই ভেলাটার উপর শুয়ে, অস্থির চঞ্চল জলরাশির উপর ভাসতে ভাসতে কেন জানিনে হেয়ারডালের চোখে বার বার ভেসে উঠতে থাকে সেই বৃদ্ধ অধ্যাপকের ব্যঙ্গবঙ্কিম মুখখানি। এখনও কি তাঁর ঠোঁট ব্যঙ্গে বেঁকে আছে তেমনি ?

তবু সেই অধ্যাপক কত নিশ্চিন্ত। কারণ তাঁর পদতলে দৃঢ় মাটি। শক্ত কঠিন জমি। তাঁর মাথার উপরে কংক্রিটের ছাত। চারপাশে দেওয়াল। কত নির্ভয় তিনি। কত তাঁর খ্যাতি! কত প্রতিপত্তি।

আর হেয়ারডালের ? তিনি একবার চারপাশে চেয়ে দেখলেন। পদতলে জল। তল কতদূরে কে জানে ? উপরে আকাশ। চারিপাশে ধূ ধূ শূন্য। কী ভর দিয়ে দাঁড়াবেন ? কী আঁকড়ে ধরবেন ? কার উপর নির্ভর করবেন ? শূন্যের উপর ?

বিরাট একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল ভেলার উপর। সমুদ্র যেন মহাক্রোধে একটা থাপ্পড় মারল ভেলাটার গালে। হেয়ারডালের মনে হল সেটা যেন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। প্রচণ্ড ধাক্কায় যেন সেটা ভেঙে পড়বে। মচমচ করে উঠল দড়ির বাঁধন। ঢেউয়ের গুঁতোয় ভেলা-সুদ্ধ নাকানি-চুবোনি খেয়ে হেয়ারডাল ভাবলেন, ঠিক হ্যায়, কূল যদি কোথাও না পাই, না-ই পাই, তল পাব তো তবু। তাহলেও হবে।

তাহলে কী হবে ? চার মাস আগে, নিউ ইয়র্ক শহরের উপকণ্ঠের এক বাসায় উইলহেলম তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, যদি ভেলা-সুদ্ধ তলিয়ে যাও, তাহলে কী হবে ?

হেয়ারডাল একটু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই ডুবে মরব।

তার মানে শুধু তুমিই মরবে না, সঙ্গে সঙ্গে তোমার তত্ত্বটাকেও ডুবিয়ে মারবে।

হেয়ারডাল সে কথার জবাব দেননি। নিউ ইয়র্ক থেকে আসবার সময় সেদিন যে ম্যাপখানা কিনে এনেছিলেন, নিবিষ্টচিত্তে সেদিকেই শুধু চেয়েছিলেন।

এই হচ্ছে পেরুর উপকূল আর এই তো পলিনেসিয়া। কতকগুলো কালো কালো ফুটকি। এই তো মার্কুয়েসাস, টুয়ামটু, তাহিতি, ইস্টার দ্বীপ। পেরু থেকে পলিনেসিয়ায় তখনকার দিনে কেউ যায়নি। কেন? না-যেতে পারত না। কেন? না-মাঝখানে দুস্তর দরিয়া। তাদের নৌকো ছিল না। জাহাজ ছিল না। যাবে কী করে? সকলের মুখেই এই এক কথা। মাঝখানের এই মহাসাগর পাড়ি দেবে কী করে? শুনতে শুনতে হেয়ারডালের কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে। কেন, ভেলায় চড়ে যেতে পারত। ভেলায় চড়ে? ভেলায় চড়ে! ফুঃ ফুঃ। শোনা মাত্র কথাটা সবাই ফু দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে।

উইলহেলম তাঁর বন্ধু। একজন ঝানু নাবিক। তাঁকে যখন হেয়ারডাল প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন, পেরু থেকে পলিনেসিয়ায় ভেলায় চড়ে যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? কী মনে করেন তিনি? উইলহেলম হেয়ারডালের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। কিছুটা অবাকও হয়ত হয়ে থাকবেন।

তারপর পরিষ্কার জবাব দিয়েছিলেন, না, একেবারে অসম্ভব হবে কেন? বরং সম্ভব বলেই আমি মনে করি। তোমার তত্ত্বের এই অংশটুকু যুক্তিপূর্ণ বলেই আমার মনে হয়েছে। পলিনেসীয়দের আদিপুরুষরা ঝানু নাবিক ছিল, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

উইলহেলম পাকা নাবিক। উইলহেলম বলে কী? সায় দিচ্ছে তাঁর কথায়? অ্যাঁ। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল হেয়ারডালের মন।

তবে তুমি যদি তাদের অনুসরণ করতে যাও তো সেটাকে আমি পাগলামি ছাড়া আর কিছুই বলব না।

কেন, পাগলামি কেন?

উইলহেলম বললেন, দ্যাখ, সেই যুগে যারা ভেলা ভাসিয়ে যাত্রা করেছিল, তারা তো একা যায় নি। দলে দলে গিয়েছিল। আর তাদের সবাই যে পৌঁছেছিল, এমন কথা নেই। অনেকে ডুবে

মরেছে। কেউ কেউ পৌঁছে গেছে। এমনও তো হতে পারে যে দশটা ভেলার মধ্যে একটা হয়ত গিয়ে পৌঁছেছে।

ঠিক কথা।

তবে? আর তুমি যাচ্ছ একা, মানে ভেলা হচ্ছে একটা। সেটার যে বিপদ-আপদ হবে না, তা কে বলতে পারে। আর তুমি যদি তলিয়ে যাও, পৌঁছাতে না প.র পলিনেসিয়ায়, তবে বুঝতে পারছ কী দুর্দশা হবে তোমার তত্ত্বের? তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোমার তত্ত্বেরও মৃত্যু ঘটবে। তা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হবে।

না, তা হবে না, হেয়ারডাল দৃঢ়স্বরে বললেন। কারণ দশটার মধ্যে একটা যে পৌঁছাতে পেরেছিল, অন্তত পৌঁছান যে সম্ভব, সে কথা তুমিও স্বীকার করেছ। কিন্তু আমার সামনে আর দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। অনেক ভেবেছি। এইভাবে না পারলে আমার কথা কেউ শুনবে না। তাই আমাকে যেতেই হবে। তুমি শুধু একটা উপকার আমার কর। মোটামুটি একটা হিসেব কষে দাও যে, পেরু থেকে পলিনেসিয়ায় যেতে কতদিন লাগতে পারে।

উইলহেলম বিনা বাক্যব্যয়ে চার্টটা টেনে নিলেন। অঙ্ক কষতে বসলেন। তারপর কিছুক্ষণ পরে বললেন, মোটামুটি সাতানব্বই দিন। তবে মনে রেখ, এটা নিছক একটা আন্দাজী হিসেব। আবহাওয়া যদি ভাল থাকে, স্রোতের গতি, বাতাসের বেগ যদি ঠিক ঠিক হিসেব মত থাকে, তবে সাতানব্বই দিনের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত।

সাতানব্বই দিন। ঢেউএর দোলায় দুলতে দুলতে হেয়ারডালের মনে পড়ল সাতানব্বই দিন লাগার কথা। তার মধ্যে মোটে তো দুদিন কাটল। এখন আরও পঁচানব্বই দিন বাকী। শুধু প্রকৃতির শক্তির উপর ভরসা করে থাকতে হবে। হামবোল্ড সমুদ্রস্রোতই তাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক।

ভেলা নৌকো নয়। তাকে নিজের ইচ্ছে মত চালান যায় না।

তার ইচ্ছার উপরই তাঁদের নির্ভর করতে হবে। একটা পাল আছে, তাতে বাতাস লাগবে। একটা হাল আছে, বাতাসের গতিপথ থেকে যাতে বিচ্যুত না হয় ভেলা, স্রোতোপথ যাতে হারিয়ে না ফেলে, হালটা দিয়ে নিরন্তর সেই চেষ্টা করতে হবে।

হামবোল্ড স্রোতোপথ যদি কোন রকমভাবে হারিয়ে যায়, তাহলে আর রক্ষে নেই। এই অকূল, অসীম, দরিয়া থেকে বের হবার কোন আশাই থাকবে না। তাই হুঁশিয়ার হয়ে সূর্য তারার গতিপথ লক্ষ্য করে তাঁদের চলতে হবে।

কিন্তু একী! হেয়ারডাল এক নজর সূর্যের দিকে চেয়েই চমকে উঠলেন। সূর্য যেখানে থাকবার কথা সেখানে যেন নেই বলে তাঁর সন্দেহ হল। সর্বনাশ! তবে কি স্রোতোপথ চ্যুত হলেন তাঁরা?

১৪

ঠিক যাচ্ছি তো? হারিয়ে ফেলি নি তো দিশা?

এ সন্দেহ একা হেয়ারডালেরই হয় নি। তাঁর সঙ্গীদেরও হয়েছে। এই অকূল সমুদ্রের একমাত্র নির্ভর হামবোল্ড স্রোতোপথ যদি কোনোগতিকে হারিয়ে ফেলেন তাঁরা, তবে তার সুনিশ্চিত পরিণতি কি হতে পারে, কি হবে, সে সম্পর্কে তাঁদের একজনেরও কোনও দ্বিতীয় ধারণা নেই। তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন, এই স্রোতোপথ বিচ্যুত হওয়া মানেই তাঁদের ভেলার গতি রুদ্ধ হওয়া। স্রোতের টান ছাড়া এক চুলও নড়বে না তাঁদের ভেলা। শুধু ভাসবে। যতদিন বালসা কাঠ না জীর্ণ হয়ে পড়বে, যতদিন ভাসবার ক্ষমতা অটুট থাকবে বালসা কাঠের, ততদিন তাঁরা ভেসে থাকবেন। ঢেউয়ের দোলায় দোল খাবেন। বাতাসের খেয়াল খুশি মত ইতস্তত এদিকে সেদিকে পাক মারবেন কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কোনও লক্ষ্যে তাঁরা কখনও পৌঁছতে পারবেন না। এই মহা অকূলে লক্ষ্য যে কোথায় কোনদিকে, তা কি তাঁরাই জানেন?

হামবোল্ড স্রোতে গা ভাসিয়েছেন তাঁরা, নিজেদের ছেড়ে দিয়েছেন তারই মর্জির উপর। যেখানে সে নিয়ে যায়, সেখানেই তাঁরা যাবেন। এখন এই শেষ ভরসার কৃপা থেকে যদি তাঁরা বঞ্চিত হন, তবে কি হবে তাঁদের পরিণাম?

কেন, তা কি জান না? শীতল সমুদ্রই যেন জিজ্ঞাসা করে তাঁদের। ছ-টা মন যেন একই সঙ্গে জবাব দিয়ে ওঠে, কে বললে জানি নে। খুব জানি। যতদিন বালসা কাঠের শক্তি অটুট থাকবে, ভাসব। যতদিন খাবার থাকবে, পানীয় জল থাকবে, বাঁচব। এই মহাসমুদ্রের গোলক ধাঁধায়, এই অজস্র তরঙ্গের জীবন্ত মহামরুতে ঘুরে বেড়াব, উদ্দেশ্যবিহীন, লক্ষ্যহীন, একান্ত অসহায়। তারপর একদিন খাদ্য ফুরাবে, অনাহারে মরব। পানীয় জল ফুরাবে, তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে মরব। কিংবা খাদ্য পানীয় থাকবে, আয়ু ফুরাবে ভেলার। জীর্ণ হবে বালসা কাঠ। তার কোষে কোষে ঢুকবে লোনা জল। পচবে। ভারী হয়ে উঠবে পাষাণের মত। তারপর একদিন আত্মসমর্পণ করবে সমুদ্রতলের নিবিড় আকর্ষণের কাছে। জীবন্তেই সলিল সমাধি পাবেন তাঁরা। তা তাঁরা জানেন।

আরও জানেন, যে পথ ধরে তাঁরা যাচ্ছেন, সে পথে জাহাজ চলাচল করে না। কোনওদিন করে নি। সে পথের ম্যাপ নেই, চার্ট নেই। কাজেই কোনও জাহাজ এসে দৈবাৎ যে তাঁদের উদ্ধার করবে সে সম্ভাবনাও নেই।

জাহাজ না আসুক, প্লেন তো আসতে পারে। তোমাদের কাছে বেতার প্রেরণ যন্ত্র আছে, তাইতে তো খবর পাঠাতে পার অনায়াসে? তাঁদের একটা মন আশা যোগায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মন বলে ওঠে খবর তো অনায়াসেই পাঠাতে পারি। কিন্তু প্লেন কি করে খুঁজে পাবে আমাদের? দেখলে না সেদিন? পারল আমাদের খুঁজে বার করতে?

সত্যিই পারে নি। এই তো দুদিন আগেকার কথা। হঠাৎ ওদের বেতার যন্ত্রে বেজে উঠল এক কণ্ঠস্বর। "এই যে, আমি এক বিমানের রেডিও অপারেটর বলছি, আপনাদের দেখতে এসেছি। আমেরিকার রাষ্ট্রসভা পাঠিয়েছেন আপনাদের খবর নিতে। কোথায় আপনারা?" ওঁরা যত বলেন, এই যে, এখানে। এত ডিগ্রি উত্তর-পূর্বে। অমুক অক্ষাংশে। তমুক দ্রাঘিমায়। কিন্তু বৃথা। ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে হয়রান হয়ে গেল প্লেনখানা। পারল না খুঁজে বার করতে। কি করে পারবে? বিরাট সমুদ্রে তাঁদের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভেলা যেন বিচালির গাদায় সুঁচ, কি হিমালয়ে এক উইয়ের ঢিপি। এ কি কেউ খুঁজে বের করতে পারে? "কোথায় আপনারা? কোথায়?" বেতার তরঙ্গ জিজ্ঞাসা করে। "এই যে আমরা। এই যে।" আরেক তরঙ্গে জবাব যায়। কখনও খুব কাছাকাছি আসে, স্বর দুটো জোরে বাজে। আশা হয়, এই বুঝি দেখা মিলবে। উত্তেজনায় ছ-টা হৃৎপিণ্ড ধ্বক-ধ্বক করতে থাকে। পাগলের মত তাদের বেতার প্রেরক বলতে থাকে, "এই যে। এই যে। এই যে।" হঠাৎ আরেকটা স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। প্লেনখানার বেতারপ্রেরক হতাশভাবে বলতে থাকে, "কোথায় কোথায়? কই?" তারপর আর শোনা যায় না কিছু। নাঃ। পারল না। চলে গেল। সমুদ্র ওঁদের এই ব্যর্থতায় খুশী হয়। উল্লাসে গর্জন করতে থাকে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাতামাতি শুরু হয়। বাতাস এসে ভেলার পালে লাফ দিয়ে দিয়ে পড়তে থাকে।

কোনও পরিত্রাণ নেই। তাঁরা জানেন। যদি হামবোল্ড স্রোতো-পথ তাঁদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ে তবে আর উদ্ধার নেই, অমোঘ বিপর্যয়ের হাত থেকে। তা তাঁরা জানেন। প্রত্যেকেই জানেন।

জানেন, তাই প্রত্যেকেই সচেতন। প্রত্যেকেই সজাগ।

হেয়ারডাল দেখলেন, হারমান ভেলার একেবারে সম্মুখে গিয়ে কি যেন করছেন। তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

হারমানের হাতে কয়েকটা কাঠের টুকরো। হেয়ারডালকে দেখে হারমান হাসলেন। বললেন, "দেখছি, পথ হারালাম নাকি? হামবোল্ড স্রোতের বাইরে চলে গেলে মহা কেলেঙ্কারী হবে। তাই ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা যাচাই করে নিচ্ছি। আমি এই টুকরোটাকে ভেলার একেবারে মাথা থেকে ছাড়ছি। তুমি ছাখ শেষ পর্যন্ত ওটা ভেলার সঙ্গে সমান্তরালভাবে যায় কিনা। যদি যায় তবে ভয় নেই, ঠিক যাচ্ছি। নাও, এই ছাড়লাম।"

হারমান ছেড়ে দিলেন টুকরোটা। বুক-ঢিপ্-ঢিপ্ উত্তেজনা চেপে হেয়ারডাল তার গতি লক্ষ্য করতে লাগলেন। টুকরোটা জলে পড়ে খানিকটা ঘুরপাক খেয়ে নিল। তারপর ভেলাটার গায়ে এসে লেগে রইল। আর নড়েও না চড়েও না। কি মুশকিল। না, নড়েছে। একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় সরে গেল টুকরোটা। এই যে পিছিয়ে পড়ছে ক্রমে। যাক্। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ···মনে মনে হেয়ারডাল গুনতে লাগলেন।··· কুড়ি···পঁচিশ···পঁয়ত্রিশ·· সমান্তরালই তো যাচ্ছে। এই মাঝামাঝি এল। বেঁকল বেঁক···নাঃ ঠিকই যাচ্ছে।···চল্লিশ, একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ···এসে গেছে······সাতচল্লিশ, আটচল্লিশ, উনপঞ্চাশ, পন্···হুর্‌রে, হুর্‌রে। হেরারডাল হঠাৎ আওয়াজে চমকে চেয়ে দেখেন ট্রস্টিন হাল ধরে উল্লাসে চেঁচাচ্ছে। হুর্‌রে হুর্‌রে। ঠিক আছে ভেলা। দিকভ্রষ্ট হয় নি। উল্লাসে তিনিও গলা মেলালেন। হুর্‌রে হুর্‌রে। ওদিক থেকে কৃনুট, বেঙ্গট্, এরিক আর পিছন থেকে হারমানও চেঁচিয়ে উঠল, হুর্‌রে। খুশীর দমকায় দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা সব তুলো-ফুল হয়ে উড়ে গেল। ওঁরা থামতেই ভেলার চাল থেকে তোতাটাও যোগান দিল, হুর্‌রে। ওঁরা হেসে উঠলেন। এরিক তার দিকে চেয়ে বললেন, সাবাস! ব্যাটা জিতা রহ।

এত সহজে তাঁদের দুর্ভাবনা কেটে যাবে, তা ভাবতে পারেন নি হেয়ারডাল। কিন্তু তা যখন কাটল তখন আর আফসোস করে

হবে কি? অ্যাডভেঞ্চারটা মাঠে মারা গেল? ঘটল না তেমন কোনও বিপদ। সবুর। বিপদের দেখা পাবার জন্য এত তাড়া কেন। তৈরী থাক। সাবধানী মন সতর্ক করে, তৈরী থাক।

তাঁরা তৈরীই আছেন। সর্বদাই হুঁশিয়ার আছেন তাঁর বন্ধুরা। সত্যি, কি চমৎকার সঙ্গীই না তিনি পেয়েছেন। যেমন এরা খাটিয়ে, তেমনি সাহসী। আবার তেমনি ফুর্তিবাজ। আপদবিপদের গন্ধ পেয়েছে কি হাজির হয়েছে আপন জায়গায়। বিপদ কেটেছে কি হাসি গল্পে তামাসায় মশগুল হয়ে আছে।

এই তো এরিক এরই মধ্যে তাঁর গীটার নিয়ে উঠে গেছেন মাস্তুলে। বেছে বেছে ঐ জায়গাটা কেন যে তাঁর পছন্দ, তিনিই বলতে পারেন। সারাক্ষণ মাস্তুলে বসে গীটার বাজাচ্ছেন। ট্রস্ট্রিন হালে বসে সুর মেলাচ্ছে। কৃনুট চলে গেছে ছইয়ের ভিতরে। খুটখাট আওয়াজ আসছে সেদিক থেকে। উঁকি মার। দেখবে একমনে বেতার-সেট নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে। বেঙ্গ্ট্ এক মুখ দাড়ির মধ্যে কটা চুরুট গুঁজে বইয়ের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে নিজেকে। আর হারমানকে ছাখ। বাতাসের বেগ মাপবার যন্ত্রটা হাতে করে ধরে আছে। ·কি সব অঙ্ক দেখছে আর লিখে রাখছে খাতায়। সব কত সহজে হয়ে যাচ্ছে। হেয়ারডাল দেখেন আর অবাক হন। ভাবতেও পারেন নি, এদের তিনি সঙ্গী হিসাবে পাবেন। এদের মধ্যে তিনি এরিককে ছোটবেলা থেকে চিনতেন। এরিক হেসেলবার্গ তাঁর বন্ধু। কৃনুট্ হগল্যাণ্ড আর ট্রস্ট্রিন রাবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় যুদ্ধের মধ্যে। ওঁরা একই সঙ্গে জার্মানদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। কৃনুট্কে তিনি ১৯৪৪ সনে ইংলণ্ডে প্রথম দেখেন। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। যে নরওয়েজীয় প্যারাসুট বাহিনী প্রাণান্ত সংগ্রাম করে জার্মানদের এটম বোমা ফেলবার পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়, এই কৃনুট্ ছিল তার অয়ারলেস অপারেটর। কৃনুটের সঙ্গে তাঁর যে সময় দেখা

হল, তার কিছু আগেই কৃনুট্ জার্মান বাহিনীর গায় আরেক খাবলা মেরে এসেছেন। গেস্টাপো তাঁকে ধরেও ফেলেছিল। অস্‌লোর এক প্রস্তুতি সদনের চিমনির মধ্যে তখন থাকতেন কৃনুট্। আর ছোট্ট এক বেতার প্রেরক যন্ত্রে শত্রুপক্ষের খবরাখবর নির্ভুলভাবে পৌঁছে দিতেন মিত্র বাহিনীকে। সেই সময় গেস্টাপো তাঁকে আবিষ্কার করে ফেলল।

কৃনুট্ কতদিন যে গল্পটা তাঁদের কাছে করেছেন তার সঠিক হিসেব নেই। গল্পটা বলতে বললেই কৃনুট্ লাজুক লাজুক হেসে নেয় খানিক। তারপর শুরু করে, ব্যাটারা তো ঘিরে ফেলল বাড়িটা। একেবারে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য যেন আমদানি করলে। অন্যদিকে আমার ব্যাটালিয়ন তো আমি একাই। বোঝ ব্যাপার। বিলক্ষণ ফ্যাসাদে ফেলেছিল। মৃত্যু তো অবধারিত। কিন্তু কপালে আছে অকূল সমুদ্রে ভেলায় চড়ে ঢেউয়ের দোলায় দোল খাওয়া। অত আগে আমায় মারে ব্যাটাদের সাধ্যি কি? ওরা তো বাড়ি ঘিরে, মেসিন গান বসিয়ে সঙ্গীন উঁচিয়ে খাড়া। তাড়া খেয়ে আমি বেরুব আর ওরা দমাদম গুলি মেরে আমার খুলি উড়িয়ে হাতের সুখ করবে। আরে, আমি তেমন সুপুত্তুর। আমার হাতে ছিল পিস্তল। সেলার ফুঁড়ে রান্নাঘরের পিছনে গিয়ে উঠলাম। তারপর পাঁচিল টপকে একেবারে হাওয়া হয়ে গেলাম। ব্যাটারা কয়েক ঝাঁক গুলি ছুঁড়েছিল, কিন্তু নাৎসী বুলেটের এই বাজে খরচের দামটা নিশ্চয়ই ওদের মাইনে কেটে আদায় করা হয়েছে।

ট্রস্টিনের সঙ্গেও হেয়ারডালের প্রায় এই সময়েই আলাপ হয়। এই যুদ্ধের মধ্যেই। সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায়। হেয়ারডাল ভাবেন, আশ্চর্য, তাঁর স্মৃতি যেন একখান স্টীমার। ভেসে চলেছে কালের মহানদীর পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে। মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলবেন তাকে, কিন্তু অতীত বড় মায়াবী। সে এক সোনার হরিণ তাকে ধরা যায় না।

হেয়ারডাল প্যারাস্যুট সৈন্যের তালিম নিয়েছিলেন যুদ্ধে। তালিম শেষ হল তাঁর। এবার তাঁদের পরিকল্পনা হল, অস্লোর কাছে নর্ডমার্কে তাঁরা লাফিয়ে পড়বেন। প্ল্যান প্রোগ্রাম সব যখন ঠিক, সেই সময় একদল রুশ সৈন্য কির্কেন অঞ্চলে ঢুকে পড়ল। তাদের হাত থেকে অধিকৃত অঞ্চলের ভার নেবার জন্য একটা ছোট নরওয়েজীয় সৈন্যদল স্কটল্যাণ্ড থেকে ফিনমার্কে পাঠান হল। হেয়ারডাল এই দলটির সঙ্গেই ফিনমার্ক পৌছলেন। আর সেই-খানেই আলাপ হল ট্রস্টিনের সঙ্গে।

উত্তর মেরু অঞ্চলের সেই কনকনে ঠাণ্ডা দিনটির কথা চিরকাল মনে থাকবে হেয়ারডালের। তাঁরা সবে পা দিয়েছেন সেই বিধ্বস্ত অঞ্চলে। যেদিকে চাও ভাঙা। যেদিকে চাও পোড়া। যুদ্ধের কামড়ে সব শেষ হয়ে গিয়েছে। ফারের কোট পরেও শীত মানছে না। মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে পড়ছে শীত। আশ্রয়ের সন্ধানে যখন ইতস্তত ঘুরছেন, সেই সময় একটা নিচু কুঁড়েঘর থেকে এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। এক গাল হেসে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। তারপর বলল, চলে আসুন ভেতরে। বেশ গরম। বেশ আরাম।

এ-ই ট্রস্টিন। ট্রস্টিন র‍্যাবি। সে প্রথমে ইংলণ্ডে পালিয়ে যায়। সেখানে ওয়ারলেস অপারেটরের কাজ শেখে। তারপর তাকে গোপনে আবার নরওয়েতে পাচার করে দেওয়া হয়। এক জার্মান যুদ্ধ জাহাজে সে চেপে বসে। দশ মাস সেখানে লুকিয়ে ছিল। দশ মাস ধরে সে সেখান থেকে তার ছোট বেতার প্রেরক যন্ত্র দিয়ে প্রতিদিন খবর পাঠিয়েছে ইংলণ্ডে। জাহাজের খুঁটিনাটি সব খবর। তার খবরের উপর নির্ভর করেই ব্রিটিশ বোমারু সেই জাহাজখানার বারটা বাজিয়ে দেয়।

তাই হেয়ারডাল যখন এই অভিযানে বেরুবেন বলে উদ্যোগ আয়োজন করছেন, পরামর্শ করছেন হারমানের সঙ্গে, সেই সময়

হারমান একদিন বললেন, বেতার বার্তা পাঠানোয় ওস্তাদ এমন সঙ্গী পাওয়া গেলে খুবই ভাল হয়। কারণ যে পথ দিয়ে আমরা যাব, তার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনে। আবহাওয়া, ক্লাইমেট, এসব সম্পর্কে আমরা অনেক নূতন তথ্য পাব বলে আমার বিশ্বাস সেগুলি যদি বেতারযোগে ইওরোপ আমেরিকার আবহাওয়া অফিস-গুলোয় পৌঁছে দিতে পারি তো অশেষ উপকার হবে লোকের।

তক্ষুনি হেয়ারডালের মনে পড়ল কৃনুট্ আর ট্রস্টিনের কথা। বেতারে বার্তা পাঠানোয় এদের চেয়ে ওস্তাদ আর কে আছেন হেয়ারডালের তা জানা নেই।

হারমানকে ওদের সম্পর্কে বলতেই তিনি তক্ষুনি ওদের আসবার জন্য হেয়ারডালকে টেলিগ্রাম করে দিতে বললেন।

হেয়ারডাল ট্রস্টিন আর কৃনুট্‌কে তার পাঠালেন, দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা পেরু থেকে গিয়েছে, এই তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য একটা কাঠের ভেলায় করে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছি। আসবে নাকি? কিছুই দিতে পারব না, তবে পেরু থেকে দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত একটা ফিরি ট্রিপ পেতে পার। আর তোমার যে টেকনিক্যাল জ্ঞানটুকু আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের একটা সুযোগ পেতে পার। সত্বর জানাও।

এই তার এরিক হেসেলবার্গকেও পাঠানো হল। কিন্তু সব্বার আগে সাড়া দিলেন ট্রস্টিন। দুটো কথা লিখলেন শুধু, আসছি। ট্রস্টিন।

এরিক আর কৃনুট্‌ও ঐ জবাব দিলেন।

বেঙ্গ্‌ট ড্যানিয়েলসনকে কিন্তু আমন্ত্রণ জানাতে হয় নি। এক মাথা টাক আর এক মুখ দাড়ি নিয়ে তিনি নিজেই হাজির হয়েছিলেন হেয়ারডালের দরজায়। সে কথা মনে পড়লে হেয়ার-ডালের লজ্জা হয়। কেউ জানে না সে কথা, বেঙ্গট্‌কে দেখে প্রথমে তাঁকে বুঝতে পারেন নি তিনি। প্রথমটায় ভেবেছিলেন,

ইনিও বুঝি আরেকজন পণ্ডিত। তাঁর তত্ত্বটাকে উড়িয়ে দিতে এসেছেন। এসেছেন অভিযান থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে।

তাঁরা তখন পেরুতে। লিমায় ভেলা বাঁধবার কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সাজ-সরঞ্জাম রসদ যোগাড় হয়ে গেছে। সঙ্গীরা এসে হাজির। তাঁরা পাঁচজন হয়েছেন। একটিমাত্র আসন খালি। একটিমাত্র মনোমত লোক পেলেই তাঁরা যাত্রা করতে পারেন। সে-লোক আর পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ একদিন তাঁদের এই অভিযানের কথা লিমার খবরের কাগজে বেরিয়ে গেল। যে কাগজে ওঁদের খবর ছাপা হল সেই কাগজে সেইদিনই আরেকটা খবরও বের হল। আমাজন অঞ্চলের ভারতীয়দের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানেব জন্য যে সুইডিশ-ফিনিশ অভিযাত্রী দলটি গিয়েছিল তাঁদের দুইজন সদস্য সেইদিন লিমায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের একজনের নাম বেঙ্গ্‌ট্ ডানিয়েলসন। তিনি আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক। সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন যে, মিঃ ড্যানিয়েলসন এইবার পেরুর পার্বত্য অঞ্চলে যেসব ভারতীয় থাকে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন। হেয়ারডাল খবরটা পড়লেন। ড্যানিয়েলসন সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলও হল। খবরটা কেটে রাখলেন।

হঠাৎ তার দরজায় কে যেন ঘা মারল। হেয়ারডাল দরজা খুলে দেখেন একজন লম্বাটে রোদে-পোড়া অপরিচিত লোক। সকলের আগে নজরে পড়ে তার মাথাজোড়া টাক আর মুখভরা দাড়ি। মাথায় চুল নেই, দাড়িতে বাবরি, এই ধরনের কথা ইয়ারদার ছোকরারা প্রায়ই বলে থাকে। হেয়ারডাল দেখলেন, কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়তো!

কেন জানি নে, হঠাৎ তাঁর মনে হল, লোকটা বেঙ্গ্‌ট্ ড্যানিয়েলসন নয় তো?

আমি বেঙ্গ্‌ট্ ড্যানিয়েলসন।

তা বুঝতে পেরেছি। কিছু বিরক্ত হলেন হেয়ারডাল। এই আরেকজন নৃতত্ত্ববিদ। আরেক পণ্ডিত। ভেলার কথা শুনেছে নিশ্চয়ই।

এইমাত্র আমি আপনাদের ভেলার কথা শুনলাম। শুনেই চলে আসছি। বেঙ্গ্‌ট্‌ বললেন।

হুঁ, এইবার নস্যাৎ করবে আমার তত্ত্ব। হেয়ারডাল এক অবশ্যম্ভাবী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য নিজেকে তৈরী করতে লাগলেন। এইবার পাগল বলবে তাকে। বিদ্রূপ করবে। ব্যঙ্গ করবে। এইসব পণ্ডিতদের তিনি ঢের দেখেছেন। কিন্তু যাই বলুক ও, সব সহ্য করবেন তিনি। কিছুতেই ভেঙে পড়বেন না। কিছুতেই না।

কিন্তু হেয়ারডালের সব প্রতিরোধ বেঙ্গ্‌টের একটি কথায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

বেঙ্গ্‌ট্‌ বললেন, "আমি যদি যাই আপনাদের সঙ্গে আপত্তি হবে কি?"

এই সুইডিশটা বলে কি? ঠিক শুনেছেন তো হেয়ারডাল? তাদের সঙ্গে যেতে চায়! তার মানে হেয়ারডালের তত্ত্বের উপর আস্থা আছে ওর।

বেঙ্গ্‌টের মুখের দিকে হেয়ারডাল চেয়ে রইলেন ফ্যাল-ফ্যাল করে। কিন্তু বেঙ্গ্‌টের মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি, আপত্তি আছে?

আপত্তি! কথার জবাব না দিয়ে আবেগভাবে ডানিয়েলসনের হাতদুটো হেয়ারডাল চেপে ধরলেন।

১৫

আর হারমান? কোথায় ছিল সে এই ক-মাস আগেও? কি করে যে হারমান জড়িয়ে গেলেন তাঁর ভাগ্যের সঙ্গে সে কথা হেয়ারডাল আজও ভাল করে বুঝে উঠতে পারেন নি।

গত নভেম্বরেও হেয়ারডাল হারমানকে চিনতেন না। ভাগ্যিস তিনি ব্রুকলিনে এসেছিলেন। ভাগ্যিস বাসা নিয়েছিলেন এই নরওয়েজীয় নাবিকদের আড্ডায়। তাই তো হারমানের মত এক বন্ধু পেলেন। বন্ধুর মত বন্ধু। হারমান এই অভিযানের একেবারে গোড়ার থেকে আছেন। যখন হেয়ারডালের মনেও এই অভিযানের পরিকল্পনা স্পষ্ট করে কোন চেহারা নেয় নি হারমান আছে তখন থেকে।

বিভিন্ন জায়গায়, জ্ঞানী গুণী নানা জনের কাছে তিনি তখন পাণ্ডুলিপি পাঠান। তখনও তার আশা কেউ না কেউ পড়বেই, আকৃষ্ট হবেই। কারো না কারো কাছ থেকে একটু জবাব পাবেনই। আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছেন একটা চিঠির। এদিকে পকেটের অবস্থা সঙ্গীন। বাড়ি ভাড়া বাকী পড়ে গেছে। যা ছিল জমান পুঁজি, সব ধীরে ধীরে খতম।

অবশেষে একদিন একখানা চিঠি পেলেন হেয়ারডাল। না, কোন পণ্ডিত তাকে চিঠি লেখেন নি। চিঠি পাঠিয়েছে হেয়ারডালের ব্যাঙ্ক। জানিয়েছে, আর তাঁর আমানতে টাকা নেই।

এখন উপায়? হেয়ারডাল চোখে অন্ধকার দেখলেন। এ অবস্থায় নিউইয়র্কে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তবে কোথায় যাবেন? কোথায় থাকবেন? মনে পড়ল ব্রুকলিনের এই নরওয়েজীয় নাবিক-গৃহটির কথা। খাস নরওয়েজীয় রান্না যদি খেতে চাও তবে এখানে এস। এ তিনি জানতেন। আর এও জানতেন তাঁর রেস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা জুটবে, তাতে মাসখানেক থাকা চলবে সেখানে।

ভাবা মাত্রই তোরঙ্গ বিছানা গুটিয়ে হাজির হলেন একদিন এই নরওয়েজীয় নাবিকদের আড্ডাটায়। ঘর একখানা জুটল তিন তলায়। তবে তাঁকে খেতে হত নীচের খানাঘরে। এতে হেয়ার-ডালের ভালই হল। বহু নাবিকের সঙ্গে তার আলাপ হল। নানা আকারের, নানা মেজাজের সব লোক। কিন্তু এক জায়গায়

এদের সকলের এক অত্যাশ্চর্য মিল আছে, সমুদ্রকে এরা সবাই ভাল মত চেনে। এদের কাছে হেয়ারডাল সমুদ্র সম্পর্কে অনেক তথ্য পেলেন। তিনি জানলেন সমুদ্র গভীর হলেই ভয়ঙ্কর হয় না। জানলেন ডাঙার কাছে সমুদ্র যত উত্তাল, যত অশান্ত, দূরে, বাহির সমুদ্রে তত নয়। উপকূলের কাছাকাছি থাকলে ঝড় তুফানে যত কাবু হতে হয়, সমুদ্রের মধ্যে থাকলে ততটা নাস্তানাবুদ হতে হয় না। আরও নানা আশ্চর্য খবর পেলেন হেয়ারডাল। নাবিকরা গল্পে গল্পে জানাল, সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের কাছে বড় বড় জাহাজই বরং কাত হয়ে পড়ে কিন্তু ছোট ছোট ডিঙি দিব্যি বেঁচে যায়। তার কারণ, বড় জাহাজ ভারী। ঢেউকে তা প্রতিরোধ করে। কিন্তু ছোট্ট ডিঙি হালকা। তা অনায়াসে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বসে।

তবে ভেলার কথা কেউ বিশেষ কিছু বলতে পারল না। কারণ ভেলাকে লোকে একটামাত্র কাজেই ব্যবহার করে। আত্মরক্ষার কাজে। নিরুপায় না হলে কেউ ভেলায় ভাসে না। জাহাজ ডুবি হয়ে ওদের কেউ কেউ ভেলায় ভেসেছে বটে, তা সে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই। অবিশ্যি ভেলাটা একেবারে হেলা-ফেলার জিনিসও নয়। একটি নাবিক জানালে যে, সে একটা ভেলায় তিন সপ্তাহ ভেসে ছিল। জার্মান টর্পেডো তাদের জাহাজ ঘায়েল করবার পর অন্য উপায় না দেখেই ভেলায় ভাসতে হয়েছিল তাকে। তা সেই ভেলা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। ডুবে যায় নি। তিন সপ্তাহ পরে অন্য একটা জাহাজ তাকে ত্রাণ করে।

তবে ভেলায় করে কেউ কখনও কোনও গন্তব্যে পৌঁছেছে, এমন বিত্তান্ত নিতান্ত ঝানু নাবিকটিও শোনে নি।

"ভেলার সব থেকে অসুবিধা কি জান?" নাবিকটি বললে, "ওর তো হাল বৈঠা কিছু থাকে না। ওকে চালান যায় না। কখনও সামনাসামনি যায়, কখনও পিছু হটে, কখনও পাশাপাশি যায়, কখনও ঘুরপাক খায়। বাতাস যেমন নাচায়, সে তেমনি নাচে।"

তবে হেয়ারডাল জানেন যে প্রাচীনকালের ভারতীয়রা পলিনেসিয়দের আদিপুরুষেরা ভেলা বাইতে জানত। তাদের ভেলায় একটা মস্ত হাল থাকত, আর থাকত পেল্লায় একখানা চৌকো পাল। এ সম্পর্কে তিনি যত পুঁথি-পত্তর ঘেঁটেছেন সব তাতেই এই একই কথা লেখা আছে। প্রাগৈতিহাসিক লোকেরা এমন অনেক বিছে জানত যা আমরা জানি নে, আর আমরা যা জানি নে তাই আমাদের কাছে অসম্ভব, আজগুবি আর অবিশ্বাস্য!

হেয়ারডাল দেখলেন, এই নাবিকদের আড্ডায় দানা ধরনের লোক আসা-যাওয়া করে। তাদের মধ্যে একটি লোককে তিনি প্রায়ই দেখেন খানা-ঘরে। লোকটি প্রায় নিয়মিতই খেতে আসে ওখানে। এক টেবিলে বসেও কতদিন খেয়েছেন। তাঁর সমবয়সীই হবে লোকটি। কিন্তু হেয়ারডাল তখন নিজের চিন্তায় এমনই নিমগ্ন যে, আলাপ পরিচয় হয় নি তার সঙ্গে। তবে তাগিদটা ও পক্ষেরও ছিল। সেই লোকটিই একদিন যেচে আলাপ করলে। হেয়ারডাল দেখলেন ও নাবিক নয়। ট্রণ্ডেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা এক ইঞ্জিনিয়ার। নাম হারমান ওয়াৎজিঙ্গার, দু-জনে বেশ ভাব হল। হারমান হেয়ারডালকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি করেন। হেয়ারডাল বললেন সব কথা।

হারমান ধীরভাবে সব শুনলেন। হেয়ারডালের কথা শেষ হলে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর হারমান বললেন, "আপনি তাহলে যাবেন বলেই ঠিক করে ফেলেছেন?"

হেয়ারডাল তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই।"

হারমান শান্তকণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে যাবেন, তা কিছু ঠিক করেছেন?"

"না, তা ঠিক করিনি। তবে যত শিগ্‌গির হয়, যাব।"

হারমান আর কিছু বললেন না। খাওয়া-দাওয়া চুকলে চুপচাপ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এর পরেও কয়েকবার দেখা

হয়েছে হারমানের সঙ্গে, কিন্তু এ বিষয়ে আর কোনও কথা, কোনও আলোচনা তুজনের মধ্যে হয় নি। হেয়ারডাল নিজের চিন্তায় মগ্ন, হারমান ব্যস্ত নিজের কাজে। তিনি আমেরিকায় এসেছেন রেফ্রিজারেটারের কাজ শিখতে। তুজনেই নিজের ধান্ধায় ঘুরছেন।

নিউইয়র্কের ২৭নং স্ট্রীটে, সেন্ট্রাল পার্কের কাছে একটা ক্লাব আছে। খুবই মুষ্টিমেয় ক-জনের এই ক্লাব। দরজার পাশে এক নামের প্লেট লাগান। গোটা কয় কথা শুধু লেখা আছে। "এক্সপ্লোরার্স ক্লাব"। অর্থাৎ ক্লাবটা আবিষ্কারকদের। দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে, তুমি আর নিউইয়র্ক শহরে নেই। হয় মরুপ্রদেশে, নয় গভীর জঙ্গলে, নয় অত্যাশ্চর্য কোনও জিনিসের সন্ধানে কোনও তুর্গম অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছ। ক্লাবটার যা পরিবেশ তাতে এই কথাই মনে হবে তোমার। অন্তত হেয়ারডালের তো মনে হয়। বার বার হয়েছে। ক্লাবের ঘরগুলো ম্যাপে, চার্টে, নানা জিনিসের মডেলে ভর্তি। এখানে সিংহ শিকারের সরঞ্জাম, ওখানে মরুভূমি পার হবার আতপনিয়ন্ত্রিত আধুনিক পোশাক, মেরু অঞ্চলে ব্যবহৃত নানাপ্রকার যানবাহনের নমুনা, নতুন ধরনের বেলুন, রবারের ডিঙি, সমুদ্রের জলে ভেসে থাকবার পোশাক। মেঝের উপর, তাকে, ছাত থেকে ঝোলান হুকে, দেয়ালের পেরেকে কিছু পড়ে আছে, কিছু ঝুলছে। হিপোপটেমাসের চামড়া, শিংঅলা হরিণের মাথা, আদিম মানুষদের বর্শা, তাদের রণদামামা, ভারতের কার্পেট, দেবদেবীর মূর্তি, জাহাজের মডেল, নানাবিধ পতাকা, অজস্র ফটো গাদা গাদা পড়ে আছে।

ঝানু আবিষ্কারক যাঁরা, পৃথিবীজোড়া যাঁদের নাম, তাঁরাই শুধু এই ক্লাবের সদস্য হতে পারেন। মার্কুইসাস দ্বীপ থেকে ফিরে আসবার পর হেয়ারডালকেও এই ক্লাবের সভ্য করে নেওয়া হয়েছিল।

ধ্য মধ্যে নানাবিধ নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে বক্তৃতা হত
।
দিনও বক্তৃতা হচ্ছিল। বক্তৃতা দিচ্ছিলেন কর্নেল হাস্কিন।
হাস্কিন বিমান যুদ্ধে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম দপ্তরের ল্যাবরে-
একজন কর্মী। ওদের ল্যাবরেটরীতে কতকগুলো জিনিস
চ হয়েছে। সে-সবের গুণাগুণ সম্পর্কেই তিনি বক্তৃতা
ন। হেয়ারডাল নিজের চিন্তাতেই মগ্ন। কিছু কথা
ানে ঢুকছিল, কিছু ঢুকছিল না। বক্তৃতার পরে গরম
না শুরু হল। কর্নেল হাস্কিনের আবিষ্কার কেউ
দিলেন ফুঁয়ে। কেউ আবার সমর্থন জানালেন। হেয়ারডাল
। সব কিছুই তাঁর নজরে পড়ছিল। কিন্তু কোনও
পাচ্ছিলেন না। কেন এরা খামাখা এত তর্ক করছে?
তর্কে কোথায় পৌছাতে চাইছেন এইসব সাবধানী
বরেরা?

যানের উপযোগী সরঞ্জামগুলিকে সামনে এগিয়ে ধরলেন
স্কিন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে বললেন,
যদি আপনাদের সন্দেহ হয় তো আসুন, এসে এগুলিকে
রে দেখুন। শুধু তা-ই নয়, যদি কোনও সদস্য কোনও
। বেরুতে চান এই সব সরঞ্জাম সম্বল করে, আমরা তাঁকে
রতে রাজী আছি।

রডালের বুকের রক্ত উৎসাহে ছলাক করে উঠল।

া তাঁকে এইসব সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ করব।
াস্কিন বলতে থাকেন, বিনামূল্যে। তবে তাঁর সঙ্গে
শর্ত থাকবে, তিনি ফিরে এসে এইসব জিনিসপত্রের
ম্পর্কে আমাদের একটা রিপোর্ট দেবেন।

র বসে বসেই উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন
। এ-কী অযাচিত আহ্বান! এ-কী অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি!

চাইলেই তো জিনিসগুলি পেয়ে যান হেয়ারডাল। এক্ষুনি। মুখের কথা খসালেই।

ধীরে ধীরে ঘর পাতলা হয়ে গেল। সদস্যেরা বেরিয়ে গেলেন রজা দিয়ে। সিগারেট চুরুটের ধোঁয়া বেরুল ঘুলঘুলি দিয়ে, ানালা দিয়ে। হেয়ারডাল একা বসে রইলেন। কর্নেল হাস্কিনের লিষ্ঠ আহ্বান আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে লাগল তাঁর মগজে। াশ্চর্য! আশ্চর্য! অতি আশ্চর্য এই যোগাযোগ। যে যে রাঞ্জামের কথা কর্নেল হাস্কিন বললেন, তার অনেকগুলোই হয়ারডালের দরকার। যে অভিযানের কথা তিনি এঁচে রেখেছেন নে, তার পক্ষে এই সব সরঞ্জাম অতি প্রয়োজনীয়।

সেদিন খানাঘরের টেবিলে বসেও এইসব কথাই তাঁর মনে রপাক খাচ্ছিল। কখন যে হারমান এসে বসেছে তাঁর টেবিলে খয়াল নেই।

হারমানের কথায় সংবিৎ ফিরে এল তাঁর। একটু লজ্জা পেলেন য়ত।

হারমান তা লক্ষ্য করলেন কিনা বোঝা গেল না। স্বভাবসিদ্ধ াস্ত কণ্ঠে বললেন, তাহলে, আপনার যাওয়া ঠিক?

হেয়ারডাল বললেন, নিশ্চয়ই।

হুঁ। চুপ করে গেলেন হারমান। হেয়ারডালও চুপ। দুজনে ঃশব্দে খেতে লাগলেন।

হঠাৎ হারমান জিজ্ঞাসা করলেন, কজন লোক নেবেন ঠিক রেছেন?

ছয় জনের কথাই ভেবেছি। ছয়জন হলেই সুবিধে। তাহলে ত্যেকে চার ঘণ্টা করে হাল ধরতে পারবে রোজ। ছয়জন থাকলে ঘেঁয়েমির হাত থেকেও বাঁচা যাবে।

হুঁ। আবার দুজনে চুপ করে খেতে লাগলেন। শেষ হল ওয়া। রুমালে মুখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন হারমান। তারপর

মৃদুস্বরে বললেন, এই···মানে আমাকে সাথী করতে আপত্তি আছে আপনার ?

হেয়ারডাল এই আচমকা প্রশ্নে হতবাক হয়ে গেলেন।

হারমান বললেন, আপনার তত্ত্ব প্রমাণ করতে হলে নির্ভুল সব তথ্যের প্রয়োজন। বাতাস, ঢেউ, স্রোতের গতির সঠিক হিসেব দরকার। মনে রাখবেন, যে পথে আপনি যেতে চাইছেন, তার সবটাই অজানা। আবহাওয়া-বিজ্ঞান, স্রোতোবিজ্ঞান সম্পর্কে নানা নতুন নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে। আমাকে সঙ্গে নিলে এইসব ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমার থার্মো-ডাইনামিক্স ছিল কিনা। বিদ্যেটা তাহলে কাজে লাগতে পারে।

হেয়ারডাল অবাক হয়ে কথাগুলো শুনে গেলেন। খুশী হলেন। খুব খুশী হলেন তিনি। বললেন, কিন্তু আপনার চাকরি ?

জাহান্নমে যাক চাকরি। ও আমি কালকেই ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছি।

ব্যাস্, জুটে গেল হারমান। তিনি ছাড়া হারমানই একমাত্র লোক যে এই অভিযানের সেই গোড়া থেকে আছে। কী পরিশ্রমই না করেছে হারমান। দৈত্যের মত খেটেছে। খাটছেও।

১৬

হেয়ারডাল বসে বসে ডায়েরি লিখছিলেন।

১৭ই মে। আজ নরওয়ের স্বাধীনতা-দিবস। আদিগন্ত সমুদ্র। ঢেউ। আথালি-পিথালি ঢেউ। বাতাস অনুকূল। আমার আজ রান্নার পালা। ভেলার উপর সাতটা উড়ুক্কু মাছ এসে পড়ে আছে। বাঁশের ছই-এর উপর আরও একটা। আর একটা মাছ ঢুকে আছে ট্রস্টিনের ঘুমোবার থলির ভিতরে। এ-মাছ আগে কখনও দেখিনি।···

এই পর্যন্ত লিখে হেয়ারডাল থামলেন। বাঁ দিকে চাইলেন।

চারপাশে। ছোট মাঝারি, হলদে, সবুজ, সাদা, কাল, লালচে, নানা রঙের মাছ, নানা আকারের মাছ। ওরা যেন ভেলাটাকে ঘিরে শোভাযাত্রা করে চলেছে।

একদিন হারমান আর বেঙ্গট্ হালে ছিলেন। হঠাৎ তাঁরা চেঁচিয়ে উঠলেন, এই হাঙ্গর। হাঙ্গর? কই? কই? সব এসে বাইরে জড় হলেন, আরে তাইতো! প্রায় আট ফুট লম্বা হবে হাঙ্গরটা। ধীরেসুস্থে জমিদারের নায়েবের গদাই লস্করি চালে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভেলার চার পাশে। কখনও সবুজ পিঠ ভাসিয়ে, আবার কখনও থলথলো সাদা পেট দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঃ বাঃ। বেশ খেল দেখায় তো? আনো হারপুনটা আনো। দিই ব্যাটায় ভবলীলা সাঙ্গ করে। কিন্তু মতলবটা বোধ হয় বুঝে ফেলল হাঙ্গরটা। তাই হারপুন আনতে আনতেই ভুস করে এক ডুব দিয়ে পালিয়ে গেল।

পরের দিন আর এক দল এল। রকমারি একদল। অদ্ভুত সব মাছ। অদ্ভুত আকৃতি। টানি মাছ, বনিটো মাছ আর ডলফিনের ঝাঁক এল ভেলাটার সঙ্গে মোলাকাত করতে। ওদের চোখেও নিশ্চয় 'কিম্ভুত-কিমাকার' ভেলাটা বিস্ময় এঁকে দিয়েছিল। এটা আবার কি? এ আবার কে? ঠারে-ঠোরে এ ওকে সে তাকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

আর তারও কয়েকদিন পর দেখা গেল উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক। যতই ভেলাটা বিষুব বৃত্তের কাছাকাছি হতে লাগল, ততই এই উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক বাড়তে লাগল।

ভারি সুন্দর দেখতে লাগে এদের। যতদূর চোখ যায় সমুদ্র। হঠাৎ দেখা গেল জল থেকে তীরের মত উঠে আসছে এক ঝাঁক রুপোলী মাছ। সমুদ্রের গুণ ছেড়ে যেন এক ঝাঁক রুপোলী তীর ছুটে বেরিয়েছে। যতক্ষণ ওদের পাখার জোর না ফুরোয়, ততক্ষণ ওরা ওড়ে আর তারপর ঝপ করে লাফিয়ে পড়ে জলে।

কুম্মুটের একদিন ভারি মজার এক অভিজ্ঞতা হল। বাঁশের ছই-এর বাইরে ওদের রাঁধবার জায়গা। সেদিন কুম্মুটের রান্নার পালা। আপন মনে রাঁধছিলেন কুম্মুট। পেট্রোম্যাক্স স্টোভ জ্বেলে প্যানে একতাল চর্বি সবে ঢেলেছেন। মাছ ভাজবার ইচ্ছে। ধাঁ করে তাঁর ডান হাতের উপর কি একটা সজোরে আছড়ে পড়ল। হঠাৎ চমক খেয়ে 'ব্বাপ' বলে লাফিয়ে উঠলেন কুম্মুট

তাঁর চিৎকারে সবাই হুড়মুড় করে ডেকের উপর এসে জড় হলেন। কি ব্যাপার? কি বিষয়? কি বিত্তান্ত? সকলের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা।

কিন্তু আসল ব্যাপার দেখে হেসে সবাই লুটোপুটি। একটা মাছ উড়ে এসেছিল। কুম্মুটের হাতে ধাক্কা খেয়ে ডেকে পড়ে ছটফট করছে।

এরিক বললেন, আহা, কি বিবেচনা। ভার্জিত হবার জন্য একেবারে প্যান পর্যন্ত উড়ে এসেছে স্বেচ্ছায়। মূর্খ মানব-সন্তানটির মূর্খামির জন্য বেচারার তাকটি ফসকে গেল। কি আফসোস!!

১৮

মাছ, মাছ আর মাছ। এত মাছও আছে জগতে? এত রং ওর? এত বিচিত্র আকারের? এমন অদ্ভুত আকৃতির?

প্রকাণ্ড রাজহাঁসের মত অনায়াসে জল কেটে চলেছে তাঁদের ভেলা—'কনটিকি'। আর 'কনটিকি'কে ঘিরে চলেছে রকমারী মাছের ঝাঁক। ছোট ঝাঁক, মাঝারী ঝাঁক, বড় ঝাঁক।

মাঝে মাঝে ওঁরা চমকে চেয়ে দেখেন, সমুদ্রের জল হঠাৎ যেন ঘন হয়ে আসছে, গাঢ় হয়ে আসছে, রঙ বদলে যাচ্ছে তার। যতদূর ওদের দৃষ্টি যায় ততদূরের অবস্থাই তাই। কি ব্যাপার? না, ভয়ের কিছু নয়। ওটা মাছের ঝাঁক। ওঁরা বেশ ঠাহর করে দেখেন, হ্যাঁ, মাছের ঝাঁকই বটে।

এই খাবার সংগ্রহের জন্যে তো পাগলের মত এর ওর তার কাছে ধর্না দিতে হয়েছে।

খাদ্য সমস্যাটি তুচ্ছ করবার নয়। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবারও নয়। তিন মাসের রসদ অন্তত যোগাড় করা চাই। কিন্তু কেমন করে করবেন? কে সাহায্য করবে?

ভেবে ভেবে হেয়ারডাল আর হারমানের কত রাত যে বিনিদ্র কেটেছে তার ঠিক নেই।

আচ্ছা, কনটিকি কি করেছিলেন? সমস্যাটি তো তাঁর সময়েও ছিল। এমনি তীব্রই ছিল। ওঁরা কি করে এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন? এ বিষয়ে কোনও দলিলপত্র পাওয়া যায় নি অবিশ্যি, তবে যতদূর মনে হয়, পুঁথিপত্র ঘেঁটে হেয়ারডাল যা পেয়েছেন তাতে মনে হয়, ওঁরা লামা-র মাংস আর শুকনো কুমারা আলুর উপরই নির্ভর করতেন। লামা পেরুরই জীব। ছোটখাট উটের মতই অনেকটা। কুমারা আলুও ইনকাদের খুব প্রিয়। কাজেই সাধারণ বুদ্ধি অনুসারেই এটা বোঝা যায় যে, ওঁরা এই দুটো খাদ্যের উপর নির্ভর করে থাকতেন। এ ছাড়া তাজা সামুদ্রিক মাছের সদ্ব্যবহারও তাঁরা নিশ্চয়ই করেছেন। উড়ে আসা, কাছে কাছে ভাসা মাছের ঝাঁক নাগালের মধ্যে পেয়েও তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন, এমন আহাম্মক বলে সেই সব দুঃসাহসীদের ভাবতে ইচ্ছে করে না। আর তেষ্টা মেটাতেন কি দিয়ে? নিশ্চয়ই বৃষ্টির জলে।

কিন্তু বুড়ো লামা-র মাংস কি শুকনো কুমারা আলুতে হেয়ারডালের রুচি নেই। দেখা গেল হারমানেরও নেই। যান হিসেবে ওঁরা ইনকাদের ভেলাটাই বেছে নিয়েছেন। কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, বালসা গাছের গুঁড়ির শক্তির পরীক্ষা নেওয়া। তাতে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সম্ভব কি না, তারই পরীক্ষা নেওয়া। লামা-র মাংস কি কুমারা আলুর স্বাদ চাখা তাঁদের প্রাণপণ করে সমুদ্র পাড়ি দেবার উদ্দেশ্য নয়। তাই ভাবিত হলেন। কি রসদ

যাক, একটা দুশ্চিন্তা গেল। ওঁরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করেন। যাক, বাঁচা গেল। সঙ্গীর জন্যে আর চিন্তা নেই। এখন আর তাঁরা মাত্র সাতটি প্রাণীই নন, আরও অজস্র সঙ্গী জুটে গেছে তাঁদের। আর কিছু না হোক, অন্তত মাছের মুখ দেখেও সময়টা কাটবে। মাঝে মাঝে একঘেয়েমির ক্লান্তি নামানো যাবে ঘাড় থেকে এদের জলকেলী দেখে। ওঁরা খুশি হলেন খুব।

শুধু কি চোখের সুখ দিল বলেই ওঁরা এত খুশি হয়ে উঠলেন? জিভের সুখটার কথা কে বলবে? কেন, রাঁধুনী যে সেই বলবে। রকমারী মাছ মানেই তো রকমারী খানা। এ তো পাগলেও বোঝে। এর আর বলাবলি কি।

যাঁর যে-দিন রাঁধবার পালা, ঘুম ভেঙে তাঁর প্রথম কাজই হল ভেলাটার চারদিকে একবার টহল মেরে আসা। ভেলার পাটাতনে উড়ুক্কু মাছ পড়ে আছে গোটা কয়। ব্যস্, কুড়িয়ে আন, স্টোভ জ্বাল, বানাও ফিশ-ফ্রাই। সকালের ভোজনটি ভালই জুটল। প্রাতর্ভোজন সমাধা হলেও সব মাছ খরচ হল না। হবে কি করে? ঐ হৃষ্টপুষ্ট মাছগুলোর গোটা দুই হলেই তো তাঁদের সংসারের এক বেলার সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু দৈনিক অন্তত ৬।৭টা মাছ ওঁরা পাবেনই। একদিন তো ছাব্বিশটে মাছ এসে পড়েছিল। সব তো আর একবারে খেতে পারেন না। তাই দুপুরের জন্য রাখেন কিছু। দুপুরেও যদি শেষ করতে না পারেন তো রাত্রের জন্যে রেখে দেন। আর সে রাত্রেও যদি শেষ করতে না পারেন, তবে বাধ্য হয়েই ফেলে দিতে হয় উদ্বৃত্ত মাছ। না ফেলে উপায় কি? কি করবেন ঐ বাসী মাছ দিয়ে? ওঁরা জানেন সকাল হলেই তো নতুন চালান পেয়ে যাবেন।

এখন মনে হয়, যাত্রার আগে খাবার সমস্যা নিয়ে বৃথাই মাথা ঘামিয়েছেন তাঁরা। বৃথাই এর দোরে তার দোরে ছুটোছুটি করেছেন। বিশেষ করে হারমান আর হেয়ারডালকে এর জন্যে,

কূল নেই, কিনারা নেই, অবাধ জলরাশি। ঐ দূরে একটা ঢেউ উঠল। বিরাট ঢেউ। গড়াতে গড়াতে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে ঢেউটা। কী তার গর্জন। হিস্‌স্‌স্‌ হিস্‌স্‌স্‌স্‌ হিস্‌স্‌স্‌স্‌স্‌। আকাশ-ছোঁয়া ঢেউ আসছে এগিয়ে, এসেছে, এইবার সজোরে আছড়ে পড়বে ভেলাটার উপর। দারুণ আঘাতে আর্তনাদ করে উঠবে ভেলা। পট্‌পট্‌ ছিঁড়ে যাবে তার দড়ির বাঁধন। মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে গাছের গুঁড়িগুলো। বালসা গাছের এই নয়টা গুঁড়ি। তলিয়ে যাবে বাঁশের তৈরী নগণ্য এই ছইটুকু। আর তার তলে পরম নির্ভয়ে বাসা বেঁধে আছে যে কয়টি প্রাণী—ছয়জন মানুষ আর একটি টিয়া পাখি—তারা? কী হবে তাদের? .

কিন্তু না। ভেলাকে খতম করতে পারলে না ঐ বিরাট ঢেউ। হেয়ারডাল রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে দেখলেন ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল। কিন্তু তাঁদের বালসা কাঠের ভেলা (হেসেলবার্গ আদর করে নাম রেখেছে "কন্‌টিকি") চরম তৎপরতায় অবলীলাক্রমে সেই ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বসল। মুহূর্তের মধ্যে ঢেউ আকাশে ছুঁড়ে দিল ভেলাটাকে। কিন্তু ভেলাটা আরও পাকা খেলোয়াড়। ঢেউয়ের ঝুঁটি ধরে বসে রইল। তাই দম ফুরনো ঢেউ আবার আস্তে ভেলাটাকে নীচেয় নামিয়ে লজ্জায় সরে পড়ল। নতুন বিক্রমে আরেকটা ঢেউ এবার ছুটে এল। আবার তর্জন-গর্জন। ক্রুদ্ধস্বরে আবার ফোঁস্‌-ফোঁসানি। প্রচণ্ড আক্রোশে ভেলার উপর আবার আছড়ে পড়া। আবার সেই ভেলাটাকে আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া। সেই একই ক্রিয়ার বার বার পুনরাবৃত্তি। প্রতিবারই ঢেউয়ের বিক্রম দেখে ওদের মনে হয়, এইবারই বুঝি শেষ। কিন্তু ভেলাটিও নাছোড়বান্দা। ঢেউয়ের ঝুঁটি সে ছাড়ে না। ঢেউয়ের ঘাড় থেকে নড়ে না। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সে একবার আকাশে ওঠে, একবার পাতালে নামে। এক একটা ঢেউয়ের আস্ফালন শেষ হয় আর তাঁদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। হেয়ারডাল ভাবেন, যাক, একটা ফাঁড়া কাটল।

হেয়ারডাল নিশ্চিন্তমনে বাঁ দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ডাইনে ফেলেন। বাঁশ আর পাতায় ছাওয়া এক ছই। ছইয়ের মধ্যে বিভিন্ন কাজে রত জন কয়েক লোক। সকলের আগে নজরে পড়ে বেঙ্গ্‌ট্‌ ড্যানিয়েলসনের উপর। তাঁর মাথায় প্রকাণ্ড টাক। মুখে চাপ দাড়ি। ছইয়ের বেড়ার গায়ে খালি পা ছুটি বেশ আরাম করে রেখে চিৎপাত হয়ে পবম নিশ্চিন্তে একমনে গ্যেটে পড়ে চলেছেন। তাঁকে দেখে মনে হয় ওটি যেন তাঁর বৈঠকখানা। জন্ম থেকে আজ ঐ অবধি বাঁশের কুঁড়েটাতেই তিনি মানুষ। ঐ জায়গাটি ছাড়া তিনি যেন আর এক পা-ও কোথাও নড়েন নি।

হেয়ারডালের বেশ অবাক লাগে। সাবধানী লোকেরা কত কি বলেছিল। কত উপদেশ দিয়েছিল। কত রকম ভয় দেখিয়েছিল।

বিপদ-আপদ যে হয় নি তা নয়। মুশকিলে যে পড়তে হয় নি তা নয়। হয়েছে। তবে এখন, যখন সে-বিপদ কেটে গেছে, তাকে কত তুচ্ছ বলে মনে হয়।

ওঃ, প্রথম প্রথম কী কষ্টই না গিয়েছে। প্রথম তিন চারদিন আনাড়ি হাতে ভেলা চালাতে গিয়ে কী নাকানি-চুবানিই না খেয়েছেন। মনে পড়লে গা এখনও শিউরে ওঠে। সব থেকে মুশকিলে পড়তে হয়েছিল ওদের, হাল ধরা নিয়ে। উনিশ ফুট লম্বা হাল, পুরনো পুঁথিপত্তরে যেমন বর্ণনা আছে, ঠিক তেমনিভাবে তৈরী। পুঁথির কাজ পুঁথি করেছে। পুঁথি মিলিয়ে ভেলাও তৈরী হয়েছে। কিন্তু সে-ভেলা বাওয়া শেখায় কে? যারা জানত এ-বিদ্যে, সেই কন্‌টিকির নাবিক বংশধররা, তারা কবেই ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। কাজেই ঠেকে শেখা ছাড়া উপায় কি? আর এ যে কী বিষম ঠেকা তা জানে একমাত্র ভুক্তভোগী।

ছুটো গোঁজের মধ্যে এই বিরাট হালখানা আটকানো। অশান্ত সমুদ্রে এই বিরাট হাল সামলাতে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হল। ঢেউয়ের ঝাপটায় হাল উঠে যায়। বাতাসের ঝাপটায় হালবিহীন

ভেলা বোঁ-বোঁ করে পাক খায়। নাস্তানাবুদের চরম হয়ে গেল। হালকে বাগে রাখতে ওদের হাতের তেলোয় অজস্র ফোস্কা পড়ল। শরীরের হাড় মটমট শব্দে ভেঙে পড়বার উপক্রম।

হঠাৎ তাঁদের মাথায় এক ফন্দি গজাল। হালটাকে দড়ি দিয়ে ভেলার দুদিকে টান টান করে বেঁধে দিলেন ওঁরা। ফলে হালটার আর ইচ্ছেমত এদিকে ওদিকে যাবার ক্ষমতা রইল না। হালের উনিশ ফুট লম্বা, লোহার মত ভারী আর মোটা ডাণ্ডা সামলানো যায় না। হাতের মধ্যে ঘুরে যায়। আচ্ছা, তবে ঐ বড় ডাণ্ডার ডগের দিকে আড়াআড়িভাবে বাঁধ এক ছোট ডাণ্ডা। এইবার ঐটে ধরে ঘুরোলেই, দেখ, হাল বশে এসে যাবে।

আর শেষ পর্যন্ত ভেলাটাকে ওঁরা বশে এনে ফেললেনও। হেয়ারডালের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই প্রথম সন্ধ্যাটির চেহারা। হঠাৎ বাতাস উঠল জোরে। শান্ত সমুদ্র হঠাৎ উঠল জেগে। এক বিরাট দৈত্যকে কে যেন খোঁচা মেরে জাগিয়ে দিয়েছে। সহস্রফণা বাসুকীকে কে যেন আঘাত করেছে। অথবা অসময়ে কার চপলতায় ধ্যান ভেঙেছে এক মহারুদ্রের। ধীরে ধীরে সমুদ্র ফুলে উঠতে লাগল। ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাতামাতি শুরু হল। হিস্‌স্‌স্‌ হিস্‌স্‌স্‌স্‌ হিসস্‌স্‌স্‌স্‌ হিস্‌স্‌স্‌স্‌। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ কী তীব্র গর্জন।

পুরো বাতাস পালে লেগেছে। তীব্র বেগে ছুটেছে তাঁদের ভেলা। তিনজন অভিযাত্রী প্রাণপণে পালের দড়ি ধরে বসে আছেন। বাতাসের গতি অনুসারে পালটা টেনেটুনে ঠিক করে দিচ্ছেন। আর তিনজন ধরে আছেন হাল। সেই অশান্ত সমুদ্রে হাল ঠিক রাখা কি সোজা?

বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। কখনও একটা আবার কখনও পরপর দুটো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওঁরা নিজের কোমরে দড়ি বেঁধে রাখলেন। তারপর সেই দড়ি ভেলার খুটোয় বাঁধলেন। যদি ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে যান তবে এই দড়িই তাঁদের বাঁচবে।

বাণিজ্য-বায়ুর পথে তাঁরা এসে পড়েছেন। তাঁদের ভেলার বিরাট চৌকো পাল ফুলে উঠেছে পুরো বাতাস গিলে। আর পিছনে ফেরার উপায় নেই। ইচ্ছে থাকলেও নেই। এখন একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে পাল খাটিয়ে বসে থাকা। খোলা হাওয়া পালে লাগিয়ে, শক্ত করে কাছি ধরে বসে থাক।

সেই খোলা হাওয়া পালে লেগেছে। ক্রমেই তাঁরা কূল থেকে অকূলে, বাহির সমুদ্রে গিয়ে পড়ছেন। এ কয়দিন চোখে ভাসছিল পেরুর পর্বতমালা। সেটা অস্পষ্ট হয়ে একটা নীলাভ রেখা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার দিগন্ত তাকেও গ্রাস করে ফেলল।

তাঁদের ভেলা বেশ দ্রুতই চলেছে। যতই তাঁরা ভেতরে ঢুকছেন সমুদ্রের, ততই তাঁদের গতির বেগ বাড়ছে। বুঝলেন দ্রুতবাহী হামবোল্ড স্রোতে তাঁরা এসে পড়েছেন। জল এখানে সবুজ। জল এখানে শীতল। জল এখানে সর্বত্র। সামনে, পিছনে, বাঁয়ে, ডাইনে, নীচে, এমন কি কখনও কখনও সন্দেহ হয় উপরেও বুঝি জল।

তিন দিন তিন রাত্রি সমানে লড়াই চলল মানুষে আর প্রকৃতিতে। সমুদ্রের ভয়ঙ্কর আক্রমণ অম্লানবদনে প্রতিরোধ করল তাঁদের ভেলা। অতি কষ্টে তাঁরা গতিপথ ঠিক রাখলেন। সঙ্গে ছিল পুরনো এক কম্পাস। এরিক তা দিয়ে অতি কষ্টে দিক ঠিক করতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেই রাত্রে, সেই মসীকৃষ্ণ গাঢ় অন্ধকারে বোঝা গেল না তাঁরা কোথায় আছেন। আকাশে তারা নেই। আকাশ ঢাকা পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘে। আর দিগন্ত হারিয়ে গেছে ঢেউয়ে, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে। তাহলে আর কি করা। কারো শরীরই আর বইছে না। তাই শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষগুলি আর উপায় না দেখে, শরীর এলিয়ে দিল ভেলার পাটাতনে। পাল গুটিয়ে, হাল তুলে নিঃসাড়ে পড়ে রইল মানুষ ক-টি পাশাপাশি। তিন দিন তিন রাত্রির অমানুষিক পরিশ্রমের ফল।

গভীর রাত্রে একজনের ঘুম ভেঙেছিল। তার চোখে এসে পড়েছিল বহু দূর দিয়ে ভেসে যাওয়া এক জাহাজের আলো। মানুষের সান্নিধ্যে আসার কল্পনায় উল্লসিত হয়েছিল মন। উত্তেজিত হয়েছিল। কিন্তু দেহে সামর্থ্য ছিল না। দাঁড়াতে পারে নি উঠে। ধীরে ধীরে তাঁর চোখের উপর দিয়ে সে-আলো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল অজস্র ঢেউয়ের মাঝে। সে শুধু বিড়-বিড় করে বললে, বিদায়, বিদায়, অজানা অচেনা বন্ধু! বিদায়!

১৭

হালকা রোদ, হলদে রোদ, নরম রোদ লঘু পাখায় ভর দিয়েই যেন ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এল আকাশ থেকে। বসল এসে ভেলার ছই-এর উপর। কিন্তু তাতে ঘুম ভাঙল না ছটা মানুষের। গত কয়েক রাত্রের দারুণ পরিশ্রমের পর অপরিসীম অবসাদ এসেছে তাঁদের দেহে। তাঁরা পাশাপাশি পড়ে আছেন। ঘুমে অচেতন। রোদ প্রথমে বসল ছই-এর চালের উপর। তারপর উকিঝুকি শুরু করল। ফাঁক পেয়ে এক এক লাফে ভিতরে ঢুকে গেল। বসতে লাগল এখানে ওখানে সেখানে। ট্রস্টিনের ঘুমবার ব্যাগে, এরিকের গীটারে, হারমানের টুপিতে, বেঙ্গটের দাড়িতে, ভেলার পাটাতনে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়তে লাগল। ওদের হুটোপুটি বেশ নিঃশব্দেই চলছিল। হঠাৎ একটা রোদ কোন খেয়ালে টিয়া পাখিটার গায়ে লাফিয়ে পড়ল। আর অমনি সে ডানার ঝাপট মেরে চ্যা-চ্যা শব্দে চেঁচিয়ে ভেলা মাথায় কবে তুলল। ঘুম ভাঙল ওদের। সকলের। ভেলার বাইরে চোখ পড়তেই—আরে বাঃ! খুশিতে ওদের মন ভরে উঠল। সমুদ্র শান্ত হয়েছে। গত কয়েক দিনের চোখ রাঙানি, ফোঁসফোঁসানি, তর্জন-গর্জন সব স্তব্ধ। রোদ এসে লুটোপুটি খাচ্ছে। সমুদ্রের মুখে হাসি ফুটেছে। মনে হচ্ছে যেন সমুদ্র ওদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। তরঙ্গের মর্মরে যেন

বলছে, হে দুঃসাহসী, ভয় যখন পেলে না, তখন এস, এবার মিত্র হই।

চোখ খুলতেই সমুদ্রের এই প্রসন্ন মূর্তি নজরে পড়ল। ঢেউ আর আগের মত রুদ্র ভয়ঙ্কর নেই। বরং তার চলাফেরায় যথেষ্ট সৌজন্যই যেন প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হল। তিন দিনের ক্ষ্যাপা সমুদ্রের ঢেউ-এর ধাক্কায় তাঁরা বহুদূর এসে পড়েছেন উপকূল থেকে।

এরিকের হঠাৎ খেয়াল হল, তাইতো কোথায় এসে পড়লেন তাঁরা? কোনদিকে চলেছেন এখন? জানা দরকার। পেরুর উপকূল ধরে নানা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তাঁদের প্রয়োজন অন্যকে নয়, আপাতত হামবোল্ড স্রোতকে। এই হামবোল্ড স্রোত বেয়ে তাঁরা উত্তরপশ্চিমে প্রবাহিত দক্ষিণ বিষুবীয় স্রোতো-পথে পড়তে চান। এই স্রোত বিষুব বৃত্তের দক্ষিণ দিয়ে তার কোল ঘেঁষে ক্রমেই পশ্চিমে বয়ে চলেছে। এই দুটি স্রোতোপথই তাদের একমাত্র আশ্রয়। বাণিজ্য-বায়ু যদি ঠিকভাবে প্রবাহিত হয়, তাঁদের ভেলার গতিপথ যদি পরিবর্তিত না হয়, যদি বালসা গাছের গুঁড়ি তার ভাসবার ক্ষমতা অটুট রাখতে পারে, তবে তাঁরা ক্রমেই পশ্চিমদিকে ভেসে যেতে পারবেন। আর একদিন না একদিন মহাসাগরের বুকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পলিনেশীয় দ্বীপমালার কোনও একটিতে গিয়ে ভেসে উঠবেন। উঠবেনই।

কিন্তু ভেলা যদি পথ ভুল করে? স্রোত ভুল করে? তবে? পেরুর উপকূল ছুঁয়ে শুধু তো এক হামবোল্ড স্রোতই প্রবাহিত হচ্ছে না। আরও কয়েকটা শক্তিশালী স্রোতোপথ আছে। গ্যালাপাগো স্রোতের কথাই ধর। হামবোল্ড আর গ্যালাপাগো স্রোত কিছুদূর পর্যন্ত একই দিকে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর পেরু থেকে কিছুটা উত্তরে গিয়ে হামবোল্ড পশ্চিমদিকে মোড় নিয়েছে। কিন্তু গ্যালাপাগো স্রোত সোজা বয়ে গেছে উত্তরে। গ্যালাপাগো দ্বীপপুঞ্জের দিকে।

এরিক চট করে উঠে পড়লেন। দিগদর্শন যন্ত্র আর সেক্‌সট্যাণ্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। হিসেব কষলেন অনেক। কিন্তু-মন তাঁর প্রসন্ন হল না। ঠিক বুঝতে পারলেন না কোনদিকে তাঁরা ভেসে চলেছেন। উত্তরপশ্চিমে না উত্তরে? পলিনেশিয়ার দিকে না গ্যালাপাগোর দিকে? তবে তাঁদের গতিপথ নির্দেশ করতে গিয়ে হিসেবমত চার্টের যেখানে দাগ দিলেন সে স্থানটি খুব শুভ নয়। এরিকের মনে হল, উত্তরপশ্চিমে নয়, তাঁদের ভেলা বরং যেন একটু উত্তর দিকে চলেছে। তাই কি? এরিকের মনে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা দেখা দিল।

তিনি বললেন, মনে হচ্ছে যেন, আমরা গ্যালাপাগোর দিকে চলেছি।

গ্যালাপাগোর দিকে! হারমান যেন আর্তনাদ করে উঠলেন।

গ্যালাপাগো। হেয়ারডাল চিন্তিত হলেন।

গ্যালাপাগো? কৃনুট অতি সতর্কভাবে মানচিত্রখানার উপর চোখ বুলিয়ে বললেন, গ্যালাপাগো জায়গাটা কি ভাল?

সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। হেয়ারডাল জবাব দিলেন। বললেন, যাঁরা যাঁরা গেছেন সেখানে, কেউ তো ভাল কথা বলেননি দ্বীপটা সম্পর্কে। কলম্বসের আমেরিকায় আসবার আগে ইনকাদের এক নেতা দ্বীপটাতে গিয়েছিলেন, তবে তিনি বা আর কেউ সেখানে বসতি করতে পাবেন নি তার কারণ এখানে পানীয় জলেব বড় অভাব।

কৃনুট বললেন, গ্যালাপাগো তবে জাহান্নামে যাক। আমরা আব ওদিকে ঘেঁষছি নে।

হেয়ারডাল জবাব দিলেন না।

কৃনুট চুপচাপ চেয়ে রইলেন মানচিত্রখানার দিকে। এরিক নিঃশব্দে সেক্সট্যাণ্ট আর দিগদর্শন আর খাতা আর পেন্সিল নিয়ে নিমগ্ন হয়ে গেলেন জটিল অঙ্কের গোলক ধাঁধায়।

সবাই চুপ। এমন কি টিয়াপাখিটা চুপ। শব্দ যা কিছু শোনা যাচ্ছিল তা সমুদ্রের, তা ঢেউ-এর। ঢেউ, অজস্র ঢেউ। কাছে, দূরে এপাশে, ওপাশে, সামনে, পিছনে শুশুকের মত ভুস-ভুস করে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ঢেউ, গড়াতে গড়াতে ফেনা ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে আসছে, ভেঙে পড়ছে। ঢেউ ভাঙার অদ্ভুত শব্দ, একটানা ছপাছপ আর মর্মর আর গুঞ্জন বাতাসে ভাসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার এই শব্দ উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে আবার। বিরাম নেই। বিশ্রাম নেই।

'কনটিকি'র পালে বাতাস লেগেছে। পালের উপর এরিক যত্ন করে এঁকে দিয়েছে 'কনটিকি'র দাড়িওয়ালা মুখের এক ছবি। বাতাসে সে মুখ ফুলে উঠেছে। এগিয়ে রয়েছে ভেলার থেকে। যেন সেই মুখখানাই ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু কোন পথে? গ্যালাপাগোয় না পলিনেশিয়ায়? তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। তবে গ্যালোপাগোব দিকে যাওয়া মোটেই সুলক্ষণ নয়, এটা তাঁরা সকলেই জানেন। ওদিকে এগুবার সব থেকে বড় বিপদ হচ্ছে, পরস্পরবিরোধী দিকে ধাবমান অজস্র স্রোতের আবর্তে গিয়ে পড়া। ঐ খপ্পরে পড়লে আর নিস্তার পেতে হবে না ওদের। এটা ওরা ভালভাবেই জানেন। কিন্তু উপায় কি? ভেলার গতি পরিবর্তন করবার সাধ্য তাদের নেই। যেমন বাতাসের উপর, যেমন সমুদ্রের উপর তাঁদের কোনো হাত নেই। প্রকৃতির নিয়মের অধীন ওগুলো। তেমনি এই ভেলাও। এই অনাদি অনন্ত মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কখনও কখনও তাঁদের মনে হয় তাঁরাও যেন পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছেন।

তাদের কাছে ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডের ব্যবধান কবে লুপ্ত হয়ে গেছে। সূর্য ওঠে, তখন তাঁদের কাছে এক নতুন দিনের আবির্ভাব ঘটে। সূর্য অস্ত যায়, অন্ধকার নেমে আসে। তাঁদের কাছে তখন রাত্রি আসে।

এইভাবে তাঁরা প্রকৃতির অন্তরঙ্গ হন। সমুদ্র তাঁদের আপন করে নেয়।

দিনে তাঁরা নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। সময়টা এক রকম কেটে যায়। কিন্তু রাত এলেই কেমন যেন অসহায় অসহায় লাগে। রাজ্যের দুশ্চিন্তা সারাদিন তাঁরা সজাগ থাকেন বলে কাছে ঘেঁষতে পারে না, ভেলার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ফাঁক খুঁজতে থাকে, রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে তারা টুপটাপ কেমন করে ঘাড়ে চেপে বসে, সে এক আশ্চর্য রহস্য। রাত্রে সমুদ্রের সব কিছুই রহস্যময় লাগে। তারা শুয়ে শুয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করেন, তাঁরা কোথায় আছেন? সমুদ্রতল থেকে কত উপরে আছেন? কত তুচ্ছ এক বস্তু আশ্রয় করে ভেসে আছেন? কী হবে এখন যদি ভেলাটা তলিয়ে যায়? কী অবস্থা হবে তাঁদের?

ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ভেলার উপর। ঢেউ-এর ধাক্কায় দড়িগুলো পটপট করে ওঠে। এই যাঃ, তবে কি ছিঁড়ে গেল! ইনকারা প্রাচীন কালে যেমনভাবে ভেলা বানাত, ওঁবাও অবিকল সেইভাবে বানিয়েছেন ভেলাটা। তখন লোহাব ব্যবহার লোকে জানত না। তাই তাঁরাও পেরেক, গজাল কি তার ব্যবহার করেন নি। যে বনজ লতার আঁশ থেকে ইনকারা দড়ি তৈরি করত এরাও সেই আঁশ পাকিয়ে দড়ি বানিয়েছেন, আর সেই দড়ি দিয়ে ভেলা বেঁধেছেন। কিন্তু সেই দড়ি কি টেঁকসই হবে? সমুদ্রের ধকল সইতে পারবে তো? এক একটা ধাক্কা আসে ঢেউ-এর, পটপট করে ওঠে দড়ি, অমনি চমকে ওঠেন তাঁরা। যাঃ, পটাং করে দড়িটা বুঝি ছিঁড়ল।

ভেলায় নয়টা গুঁড়ি। নয়টার একটাও কখনও সুস্থির নেই। একটা উপরে উঠছে তো পাশেরটা নীচে নামছে। অমনি তার পাশেরটা ঠেলে উঠছে। অনবরত চলেছে গুঁড়িগুলোর এই ওঠা আর নামা। নামা আর ওঠা। কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ির

অনবরত ঘর্ষণ হচ্ছে। অভিজ্ঞ লোকেরা বলেছিল, বড় জোর পনের দিন। তারপর ঘষায় ঘষায় ক্ষয়ে যাবে দড়ি। জলে ভিজে ভিজে পচে উঠবে। তারপর দিন পনের পর একদিন হঠাৎ পট্টাং—যাবে দড়ি ছিঁড়ে। নয়খানা গুঁড়ি নয়দিকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। তখন বুঝবে মজা। কাঠের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে নোনা জলে চুবুনি খেতে খেতে টের পাবে গোয়াতুর্মির কি সাজা। তাই গভীর রাত্রে ঢেউ-এর ধাক্কায় ভেলার দড়ি যখন কঁ্যাচকোঁচ শব্দ করে, আর্তনাদ করে, তখন যদি কেউ জেগে থাকেন, সেই শব্দ যদি কানে যায় তাঁর, অমনি বুকখানা ধুকপুক করে ওঠে। এই বুঝি সর্বনাশ হল। এই বুঝি দড়ি ছিঁড়ল।

কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিল বালসা গাছের গুঁড়ি। অদ্ভুত কেরামতি দেখাল বনজ লতার দড়ি। সাবধানীদের সব ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ করে বহাল তবিয়তে টিঁকে রইল দুটোই।

ভোরবেলা উঠেই হারমানের প্রথম কাজ ছিল দড়িগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা। শুধু ভেলার উপরেই নয়, জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দেখত নীচের অবস্থাটা কী? না ভালই। যাক বাবা। নিশ্চিন্ত। জল লেগে দড়িগুলো ফুলে উঠল, তারপর বালসা গাছের গুঁড়িগুলোর গা কেটে ভিতরে ঢুকে গেল। ব্যস্, একেবারে ওয়াটারপ্রুফ হয়ে রইল। আর, পচবার ভয় অন্তত থাকল না।

একটা দুশ্চিন্তা গেল। একটা কেন, আরেকটা দুশ্চিন্তাও গেল। কয়েক দিন পর এরিক লক্ষ্য করলেন, ওঁদের ভেলার মুখ ফিরেছে। তার গতি আর ঠিক উত্তরমুখী নেই। এখন উত্তর পশ্চিম দিকেই চলেছে। ওঁরা বুঝলেন, এতদিনে ওরা উপকূলবর্তী স্রোতের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। গ্যালাপাগোর দিকে ভেসে যাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই।

হঠাৎ একদিন মাছের ঝাঁক দেখা দিল তাঁদের ভেলার

নেবেন, কোথায় পাবেন, এই চিন্তাই তাঁদের মাথায় ঘুরতে লাগল।

হেয়ারডাল যখন যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তখনই সামরিক রসদের মর্ম বুঝেছিলেন। এই রসদ স্বাস্থ্যসম্মত। খেতে সুবিধে যেমন, তেমন বয়ে নিতেও। কাজেই ওঁর লক্ষ্য ছিল সামরিক রসদ সংগ্রহের উপর। কি করে তা যোগাড় করা যায়, এই হল ধ্যান-জ্ঞান, প্রতি দিবসের জপমালা।

হেয়ারডাল জানতেন, আমেরিকার সামরিক বিভাগ থেকে এক নতুন ধরনের 'ফিল্ড র‍্যাশান' বের করা হয়েছে। ওঁরা তাঁর গুণাগুণ পরীক্ষা করতে চাইছেন। এই একটা সুযোগ, যদি গ্রহণ করা যায়। হেয়ারডাল ভাবেন। কিন্তু সে সম্ভাবনা যে সুদূর পরাহত। আমেরিকার সমর বিভাগ তাঁকে পাত্তা দেবে কেন? কে তাঁকে চেনে? কে? কাকে ধরে, এই কাজটা উদ্ধার করা যায়? কাকে?

হয়েছে। মনে পড়েছে। তাইতো, বিয়র্ন তো এখন ওয়াশিংটনে এসেছে, নরওয়েজীয় রাষ্ট্রদূতের সামরিক সহকারী হয়ে। বিয়র্ন যদি কিছু করতে পারে। পারবে কি? কেন পারবে না? বিয়র্ন এখন বড় বড় মহলে ঘোরাফেরা করে। ওর সঙ্গে মার্কিন সমর বিভাগের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। হেয়ারডাল ভাবলেন, কিন্তু সে কাজটা করবে কি? করবে না! বিয়র্নের সাধ্যের মধ্যে কোনো কাজ থাকলে তা হেয়ারডালের জন্য করবে না! এতদিনের বন্ধুত্ব মুছে ফেলবে! তাও কি হয়?

কিন্তু কি হয় আর কি হয় না সে সম্পর্কে আগে থেকে ভেবে লাভ কি? তার চেয়ে বিয়র্নকে বরং ব্যাপারটা জানানই যাক। হেয়ারডাল তাঁকে লিখলেন।

হেয়ারডালের মনে আছে, ঠিক দুদিন পরেই বিয়র্নের কাছ থেকে জবাব এল। ওয়াশিংটন থেকে বিয়র্ন সরাসরি ফোন করেই

জানালেন, তিনি মার্কিন সমর বিভাগের বৈদেশিক সংযোগরক্ষা-কারী এক বড় অফিসারের নাগাল ধরেছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন, এ অভিযানের উদ্দেশ্য কি ?

আর কোনো কথা নয়। ইষ্টনাম স্মরণ করে হেয়ারডাল আর হারমান পরের প্লেনেই ওয়াশিংটন উড়লেন। আর ওয়াশিংটনে নেমেই চললেন সোজা বিয়র্নের আফিসে।

বিয়র্ন বললেন, মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা হয়ে যাবে। ওরা বিমান বাহিনীর জন্য এক ধরনের রসদ তৈরি করেছে। সেটা পরীক্ষা করতে চায়। কাল আমাদের বৈদেশিক সংযোগরক্ষাকারী দপ্তরে যেতে হবে। যাবার আগে কর্নেলের কাছ থেকে একটা পরিচয়পত্র নিতে হবে।

কর্নেল মানে কর্নেল অটো মান্থে-কাস। ওয়াশিংটনের নরওয়েজীয় রাষ্ট্রদূত। তিনি ব্যাপারটা শুনে খুবই উৎসাহিত হলেন। পরিচয়পত্র অবশ্যই দেবেন বললেন।

পরদিন পরিচয়পত্র আনতে ওঁরা যখন রাষ্ট্রদূতাবাসে গেলেন তখন কর্নেল বললেন, লেখার দরকার কি ? বরং নিজেই সঙ্গে যাই না কেন ?

এ একেবারে আশাতীত। বিস্ময়ের ঘোর না কাটতেই ওঁরা দেখলেন, ওঁরা কর্নেলের গাড়িতে মার্কিন সমর দপ্তরে পৌঁছে গেছেন।

তারপরের ব্যাপারগুলো সংক্ষেপে বলাই ভাল। অন্তহীন কড়িডরে ঘুরপাক খেয়ে, কামরার পর কামরা পেরিয়ে ওরা অবশেষে একটা কামরায় গিয়ে বসলেন। বড় বড় মাথাওয়ালারা এলেন। রুদ্ধ-দ্বার আলোচনা হল। একান্ত গোপনীয় ফাইলে সে-সবের রেকর্ড রাখা হল। তারপর তাঁদেরকে 'এয়ার মেটিরিয়াল কম্যাণ্ডের' দপ্তরে পাঠান হল। সেখান থেকে পাঠান হল 'কোয়াটার মাস্টার জেনারেলের' পরীক্ষামূলক বীক্ষণাগারে। সেখানে বিভিন্ন শাখায়

ঘোরান হল। অজস্র জিনিস দেখান হল। অবাক বিস্ময়ে ওরা দেখলেন, যে-সব সামগ্রী ওদের দরকার, যা ওরা চান, তার মধ্যে সব কটি জিনিসই আছে ওখানে। কি চাই? ফিল্ড র‍্যাশান? রোদে পোড়ার মলম? ঢেউ নিরোধ ঘুমোবার ব্যাগ? নতুন ধরনের প্রাইমাস স্টোভ চাই? না কি জলের পাত্র? বিশেষ ধরনের বুট চাই না রসুই বানাবার বাসন? না কি এমন ছুরি চাই যা জলে ডোবে না?

হেয়ারডাল হারমানের দিকে চাইলেন। হারমানও যেন হার মেনেছে। ছেলে লেবেঞ্চুষ চাইলে বাবা যদি তাকে মনোহারীর দোকানে ছেড়ে দেন, তখন সেই ছেলেটির যে অবস্থা হয়, হারমান আর হেয়ারডালের অবস্থাও যেন তাই হল।

যা হোক, ওঁরা যা যা দেখালেন, যেটা যেটা চাইলেন, একটি কেরানি সে-সব টুকে নিলেন খাতায়।

ওঁরা যখন বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন তখন একজন অফিসার বললেন, এবার আমাদের কর্তার কাছে চলুন। তিনিই বলতে পারেন, এ-সব জিনিসপত্র আপনাদের দেওয়া চলতে পারে কি না।

—বেশ, চলুন।

অফিসার কর্তাটির সামনে ওদের হাজির করে সব বৃত্তান্ত জানালেন। তারপর বললেন, আমরা ওদেরকে এই সব জিনিস দিচ্ছি আর তার বদলে ওঁরা আমাদের দেবেন এই সব জিনিসগুলো পরীক্ষা করে তার রিপোর্ট।

কর্তা বললেন, ওঁরা আমাদের দেবেন কচু।

বলে কি! ওদের বুক ধপধপ করে উঠল। শেষ পর্যন্ত এতদূর এসে ব্যাপারটা কেঁচে যাবে নাকি? তীরে এসে তরী ডুববে? হেয়ারডাল একটু নার্ভাস হয়ে পড়লেন।

কিছু পাই বা না পাই, কথা তা নয়, কর্তা গম্ভীরভাবে ওদের দিকে চাইলেন, তারপর বললেন, ওঁরা যে অসম্ভব দুঃসাহসের

কাজ করতে যাচ্ছেন সেইটেই তো যথেষ্ট। ওঁরা যা চান তাই পাবেন।

বাব্বা! ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। না, এই হাঁড়িমুখ অফিসারগুলো যতটা দেখায় ততটা খারাপ নয়। হেয়ারডালের মন হালকা হয়ে গেল নিমেষে। ট্যাক্সি ধরে হোটেলের দিকে ফিরতে ফিরতে একটা কেমন যেন উত্তেজনা, কেমন উন্মাদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। একটা অবাধ্য খুশী-খুশী ভাব তাঁকে অনবরত যেন গুঁতোতে লাগল।

হঠাৎ দেখলেন হারমান খিক-খিক করে হাসতে শুরু করে দিয়েছেন। কি ব্যাপার?

কি হে পাগল হলে নাকি?

না না। আমি হিসেব করে দেখলাম ওরা আমাদের জন্যে যে রসদ দিচ্ছে, তাতে ৬৮৪ বাক্স আনারস আছে। ওটা আমি কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আঃ, আনারস আমার কী যে ভাল লাগে!

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এত ছোটাছুটি এত খোশামুদি না করলেও চলত। দরকারই ছিল না এসব কিছুর। মাছ, এই মাছ খেয়ে খেয়েই তারা সমুদ্র পাড়ি দিতেন।

সত্যি বলতে কি, ওঁদের মধ্যে তিনজন তো সামরিক খাদ্য ছুঁলেনই না। টিন বন্দী হয়ে তা পাটাতনের নীচেতেই পড়ে থাকল। বাকী তিনজন কি করতেন কে জানে? তবে তাঁদের আর টিনের খাবার না খেয়ে উপায় ছিল না। কেউ না খেলে ফিরে গিয়ে কি রিপোর্ট দাখিল করবেন?

এই সৌম্য মহাসাগর, এই বিশাল জলরাশি, এ যেন সম্রাট। প্রকৃতির অন্তহীন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিবাসী। তাই আকাশ তাকে মাথা নুইয়ে সতত প্রণাম জানায়। তাই সূর্য প্রতিদিন প্রদীপ্ত হাস্যে তাকে বরণ করে। তাই চন্দ্র প্রতি রাত্রে সুষমা

ঢেলে তার দিনের ক্লান্তি দূর করে। এই ঢেউ, এই তরঙ্গরাশি তার অনুচর। এই মাছ, এই কচ্ছপ, এই কাঁকড়া, ছোট বড় এই সব নানা ধরনের, নানা প্রকৃতির জলচরেরা তার প্রজা। আর এই সব পরিচিত পরিজনদের মধ্যে, এই বালসা গাছের ভেলাখানা, এই 'কনটিকি' তো বিদেশী এক আগন্তুক। প্রথমে তাই সংশয় জেগেছিল এই জল-রাজার প্রজাদের মনে এক অজ্ঞাতকুলশীলের হঠাৎ-আবির্ভাবে সকলের মনেই সন্দেহ জেগেছিল। তাই প্রথম দিনকয়েক কেউ কাছে ঘেঁষেনি। কিন্তু কদিন যেতেই ওরা সবাই বুঝে ফেলল, ভেলাটা আকারে প্রকারে অদ্ভুত হলেও শত্রু নয় মোটে। ব্যস্, অমনি সঙ্কোচের আড়াল পড়ল খসে। ঝাঁকে-ঝাঁকে সবাই এল, ঘিরে ঘিরে চলল ভেলাটাকে।

কিন্তু শুধু ভেলার সঙ্গে দোস্তি করেই ক্ষান্ত রইল না তারা। ওদের কারো কারো কৌতূহল তাকে ঠেলে একেবারে ভেলার উপরে তুলে ফেলল।

এই সাগর-সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা বোধ হয় টর্স্টিনকেই সব থেকে বেশী পছন্দ করলে। তাই টর্স্টিন দেখল একদিন ভোরে তার বালিশের নীচে আস্ত এক সার্ডিন মাছ এসে শুয়ে আছে। ছইয়ের মধ্যে জায়গা হয় নি, তাই বেচারা দরজার বাইরে শুয়ে ছিল। টর্স্টিন মাছটাকে যত্ন করে তুলে ধরল। এমনভাবে তুলল যেন দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল টর্স্টিন ঐ সার্ডিনটার কাছ থেকে সমুদ্রের তাবত মাছের হদিশ নিয়ে নিচ্ছে।

পরের রাত্রে সবাই গুটিশুটি মেরে শুয়ে টর্স্টিনকে ছইয়ের ভিতরেই একটা জায়গা করে দিল। কিন্তু সেখানেও একদিন এমন এক কাণ্ড ঘটল যার ফলে টর্স্টিন আর নীচেয় শুতে ভরসা পেল না, রান্না-বান্নার বাসনপত্র রাখবার যে তাকটি ছিল বেতার যন্ত্রটির কাছে, সে তার উপরেই নিজের শোবার জায়গা করে নিল।

কয়েক রাত পরের কথা। কুচকুচে অন্ধকার। টর্স্টিন তার

মাথার কাছে লণ্ঠনটা জেলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত্রে পাহারা বদল হলে ওর মাথায় কেউ যাতে পাড়া দিতে না পারে সেজন্যই লণ্ঠনটা ওখানে রেখেছিল।

ভোর প্রায় চারটে নাগাত টর্স্টিনের ঘুম ভেঙে গেল। আচমকা লণ্ঠনটা যেন ঠক-ঠক করে উঠল…যেন কাঁপল…ও কিছু নয়, বাতাস। পাশ ফিরে শুল টর্স্টিন, এ কি, কানে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কি লাগছে? আবার সার্ডিন নাকি? বেশ, ভাব জমিয়েছে তো! না, সার্ডিন বলে তো মনে হচ্ছে না, তবে নিশ্চয়ই, উড়ুক্কু মাছ। তা উড়ুক্কু মাছই হও আর সার্ডিন মাছই হও কাল আবার আমারই রাঁধবার পালা, চোখ বুজে মনে মনে বললে টর্স্টিন। আর কয়েকটা ঘণ্টা সবুর কর। এটুকু সময় ঘুমোতে দাও। সকালেই সদগতি হবে তোমাদের। কথা দিচ্ছি, এবারের মত মৎস্যজন্মের থেকে তোমাকে নিষ্কৃতি দেব।

মাছটা কানের কাছেই নড়াচড়া করছিল। চোখ না খুলে ঘুমের ঘোরেই সেটাকে সরিয়ে দিতে গেল। মুঠো করে চেপে ধরতেই তার হাতের মধ্যে কি যেন কিলবিল করে উঠল। সরু লম্বা একটা কি যেন পেঁচিয়ে উঠল মুঠোর মধ্যে। আর কি তীব্র জ্বলুনি। যেন বিজলীর তারে হাত পড়েছে। এ তো মাছ নয়! ঘুম ছুটে গেল টর্স্টিনের। এ তো মাছ নয়। তবে কি? তবে কি! এক লাফে উঠে দাঁড়াল টর্স্টিন। ধাক্কা লেগে লণ্ঠনটা কাত হয়ে পড়ল। নিভে গেল। অন্ধকার, এক বিরাট অন্ধ-রাক্ষস, যেন বিশাল হাঁ করে বসে ছিল একটু দূরে। লণ্ঠনের আলোটুকুর জন্যে ভেলাটাকে গিলতে পারছিল না। এইবার সুযোগ পেতেই আর পলকমাত্রও কালক্ষেপ করল না। টপ করে যেন ভেলাটাকে মুখে পুরে দিল।

টর্স্টিন লাফ মারতেই সেই অদেখা আগন্তুক হারমানের গায়ে লাফিয়ে পড়ল। হারমানও অস্ফুট চিৎকার করে মারল এক

লাফ। তারপর সে স্পর্শ করল হেয়ারডালকে। হেয়ারডালও তড়িৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে উঠলেন। কী ওটা? অক্টোপাস? সর্বনাশ, অক্টোপাস নয় তো? এই হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! সাবধান! সরে যাও। আলো জ্বালো। আলো?

১৭

টর্স্টিন কোনোরকমে আলোটা জ্বাললেন। লণ্ঠনের রোশনি এক ধাক্কায় সেই জমাট বাঁধা অন্ধকারকে ভেলার থেকে খানিকটা দূরে হটিয়ে দিল।

সেই আলোয় দেখা গেল, হারমান প্রাণপণে সাপের মত একটা জন্তুকে চেপে ধরেছেন। তার ঘাড়টা জোরে টিপে ধরেছেন হারমান, আর সে তার হিলহিলে দেহটা দিয়ে হারমানের হাতকে পেঁচিয়ে ধরবার চেষ্টা করছে। উঃ, কী বীভৎস মুখ এই সামুদ্রিক প্রাণীটার। সাপের মত মুখ, দুপাটিতে সাজানো রয়েছে অজস্র দাঁত। কী তীক্ষ্ণ সেগুলো আর কী হিংস্র! আব তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন দুটো বড় বড় ভাসা-ভাসা চোখ। ওর চোখের দৃষ্টিতে কী সরলতা! কী অবাক বিস্ময়! এক ছোট ছেলে দরজা ঠেলে যেন হুট করে গুরুজনদের ঘরে ঢুকেছে, ঢুকেই থতমত খেয়ে গেছে, অপরাধ হয়েছে, তাই মাফ-মাঙা দুটো নিরীহ চোখ তুলে চেয়ে আছে বদরাগী কাকার দিকে। হেয়ারডালের মনে হল, এই প্রাণীটির চোখেও যেন অবিকল সেই চাহনি।

ঢোঁড়া সাপের মত ফোলা পেটটাতে একটা চাপ দিতেই প্রায় ইঞ্চি আটেক লম্বা একটা সাদা মাছ উগরে দিল সে। তারপর আবেকটা। ওরা সেই মাছগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন, ওগুলো সমুদ্রের গভীর তলদেশে বাস করে। বুঝলেন এই ফুট তিনেক লম্বা সর্পাকৃতি কিম্ভূত জীবটির নিবাসও সেই অঞ্চলে। কিন্তু ইনি

কিনি ? এই জাতীয় মহাপ্রভুর দর্শন ওঁরা কেউ এর আগে কখনও পেয়েছেন বলে মনে করতে পারলেন না। ভাল করে ওকে চেয়ে দেখতে লাগলেন সবাই। পিঠটা নীলচে-বেগুণী, পেটটার রং ইস্পাতের মত কালচে।

বেঙ্গ্‌ট্ এ-বিষয়ে ওস্তাদ লোক। উনি হয়ত বলতে পারতেন এটি কি ? কিন্তু বেঙ্গ্‌ট্ তো দিব্যি পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। অবশ্যি সোরগোলে ওর ঘুমটিও শেষ পর্যন্ত ভাঙল।

এক নজর দেখে নিয়ে বেঙ্গ্‌ট্ ঘুম-জড়িত কণ্ঠেই বললেন, ওতো গেম্পিলাস, এক ধরনের সাপ মাছ। কিন্তু এ জাতীয় মাছের অস্তিত্ব তো পৃথিবীতে নেই। তা নিয়ে আবার অত হৈ-চৈ কিসের ? যতো সব।

কাঁচা ঘুম ছুটে যাওয়ায় বড় বিরক্ত হলেন বেঙ্গ্‌ট্। তাই পাশ ফিরে শুয়ে আবার নাক ডাকাতে লাগলেন।

বেঙ্গ্‌ট্ বলে কি ? জলজ্যান্ত সামনে রয়েছে একটি জীব আর ও বলে কিনা এ মাছ পৃথিবীতে নেই। তার মানে কী ?

বেঙ্গ্‌ট্‌কে আবার তোলা হল। ওর নাকের সামনে ধরা হল সেই সাপ মাছটাকে। এবার সত্যি সত্যিই ঘুম ছুটে গেল বেঙ্গ্‌টের। আরে তাই তো। এতো সত্যিকারের গেম্পিলাসই তো বটে। কোথায় পেলে এটাকে ? পেতে আর হয় নি, উনি নিজেই এসেছেন। তাই নাকি, তাই নাকি ? বেশ বেশ। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর, এর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি আছে। ওহে, হারমান, ওটিকে কাঁচের বয়ামে যত্ন করে রাখ। ওটিকে নিয়ে ফিরতে পারলে, বুঝতে পারবে, কি চমৎকার কাজ করেছ। সোরগোল পড়ে যাবে বিজ্ঞানীদের মহলে।

এই যে আমরা, এই ছয়জন ছাড়া আর কেউ এ পর্যন্ত চর্মচক্ষে আস্ত গেম্পিলাস দেখে নি। কালেভদ্রে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে এ-মাছের দু-একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তা থেকে মৎস্য

বিশারদেরা স্থির করেছেন, এ-জীব সমুদ্রের গভীর তলে থাকে। তা সে কথা হয়ত একেবারে মিথ্যে নয়। হয়ত দিনের বেলা গভীর তলেই থাকে। হয়ত এর চোখ সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। তবে অন্ধকার রাত্রে যে এরা সমুদ্রের উপরে উঠে আসে, সে বিষয়ে হাতে হাতে প্রমাণ তো পেয়েই গেলেন ওরা। বেঙ্গ্‌ট্ খুব খুশী হয়েছেন। নাঃ, একটা কাজের মত কাজ হল এতদিনে।

শুধু এই গেম্পিলাসই নয়, আরও অনেক রকম, হরেক কিসিমের আজব জীব তাঁরা দেখতে দেখতে গিয়েছেন। কি দিনের প্রখর আলোয়, কি রাতের গভীর অন্ধকারে সমুদ্র তাঁদের দেখিয়েছে তার অসীম রহস্যের ভাণ্ডার খুলে খুলে।

'কনটিকি' জলের একেবারে উপরেই, ঠিক উপরেই, ভেসে থাকে, নিঃশব্দে ভেসে চলে, ইঞ্জিন নেই তার, নেই প্রপেলার। তাই সমুদ্রকে বিরক্ত করে না সে, যান্ত্রিক শব্দে ভীত ত্রস্ত করে তোলে না জলচর প্রাণীগুলোকে, তাই তারা এমন নিঃসংকোচে আসে, এমন নির্ভয়ে পাশে পাশে ভাসে। এ-সুবিধে জাহাজে পাওয়া যায় না।

তাই তাঁরা চোখ খুলে দেখবার অবকাশ পেয়েছেন। এই যে ওদের ভেলা ভেসে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে চলেছে রকমারী মাছের ঝাঁক। এই যে জল-ঘন-করা ডলফিনের ঝাঁক। ঐ যে পাইলট মাছের ঝাঁক, এমনি কত। তাদের কিছু জানা, কিন্তু বেশির ভাগই অচেনা, অদেখা। নতুন করে পরিচয় হয়েছে তাদের সঙ্গে।

হয়ত এখন রাত্রি। গভীর রাত্রি। হয়ত রাত দুটোই হবে। চরাচর নিঃঝুম। পৃথিবীর বুকে আকাশ থেকে অদৃশ্য বৃষ্টির অজস্র ধারার মত ঘুম ঝরছে। ঘুমের মত অন্ধকার। ভেলার হাল ধরে, যার পালা সে জেগে আছে। আকাশে মেঘ। কোন কালোটা

জল, আর কোন কালোটুকুই বা আকাশ তা বোঝার উপায় নেই। জল আর আকাশের কালোর আলাদা অস্তিত্ব মুছে গেছে। লুপ্ত হয়ে গেছে এক মহা কালোর মধ্যে।

ঠিক এই সময় হয়ত হালের মাঝির নজরে পড়ল, ভেলার ঠিক নীচে থেকে, সমুদ্রের সুগভীর তলদেশ থেকে, এক অপূর্ব কিরণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছে। অপূর্ব আভায়, অপরূপ শোভায় জায়গাটা ভরে উঠতে লাগল। কখনও জলকে তীরের মত চিরে, কখনও বা তিন কোনা, কখনও বা চার কোনা, আবার কখনও বা গোল হয়ে উঠতে থাকে সেই কিরণ, সেই আলোর ছটা। হয়ত এ ফসফরাসের আলো। কোনও অতিকায় জলদানবের গা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আলো কখনও একটা কখনও বা দুটো, কখনও বেশ কয়েকটা এগিয়ে আসে তারপর ভেলার নীচে এসে ধীরে-সুস্থে বৃত্ত এঁকে ঘুরপাক খায়। ঘুরপাক খেতে খেতেই ভেলার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। খানিকক্ষণ চলে, কিছুদূর যায়, তারপর কি খেয়াল হয় কে জানে, হঠাৎ এক সময় ভুস করে ডুব মেরে কোথায় তলিয়ে যায়।

কত দানো, কত ভূত, কত ভৌতিক আলোর নাচনই না তারা দেখেছেন! দেখতে দেখতে চলেছেন। যে মাছেব রূপকে দিনের আলোয় নিতান্ত নিবীহ বলে মনে হয়, রাতের অন্ধকারে রকমারী আলোর সজ্জায় তাকেই কেমন অশবীরী দেখায়। কখনও ভূতের মত কখনও বা অপরূপ রূপসী জলপবীব মত দেখায়। ওরাই বুঝি আবার দানো হয়ে দেখা দেয়।

আর কত রকম কেরামতিই যে দেখায় তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। এই দেখ, অন্ধকার জল, কোথাও কিছু নেই। এই দেখ, সেখানেই আবার হঠাৎ কোত্থেকে একটা অগ্নি গোলকের আবির্ভাব হল। কোথায় ছিল ওটা? কি ওটা? কে জানে? বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠছে। উঠছে তো উঠছেই। হঠাৎ ঐ

গোলটাই দুভাগ হয়ে গেল। একটা ছিল, দেখতে দেখতে দুটো হল, চারটে হল, বাড়তে লাগল সংখ্যায়। তারপর অজস্র আলোর গোলক ছুটতে লাগল। তারপর যেমন হঠাৎ আবির্ভাব তেমনি অন্তর্ধান। আবার পরমুহূর্তেই হয়ত তোমার নজর পড়েছে দূরে। ঐ দেখ, ঢেউ-এর মাথার উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে একসার অদ্ভুত আলোর ঝাঁক ছুটে আসছে। আবার তাঁরা কোথায় মিলিয়ে গেল। দু-একটা আলোময় জীব আবার কাছাকাছি পড়ে যায়। উঃ, ওঁরা যেন দুঃস্বপ্ন দেখেন। কী ভয়াবহ! কী বিকট! কী কুৎসিত সে চেহারা! ভয়ে তখন গা ছমছম করে। মনে হয়, বৃদ্ধ সাগর-রাজা অন্তহীন গভীরে বসে বসে এই-সব চর পাঠিয়ে ওদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। যেখানেই যাও, যতদূরেই যাও, তাঁর নজর এড়ান শক্ত। কোথায় পালাবে?

তবে ভয় যে সব সময় হয়, তা নয়। সমুদ্র শুধু ভয়ের খোরাকই নয়, হাসির খোরাক, কৌতূহলের খোরাকও পাঠায়।

সেদিন, নিস্তব্ধ দুপুরে যে যার কাজে ব্যস্ত। হেয়ারডাল একটা দড়ি ধরে সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে দিয়ে চান করছেন। আঃ, কি আরাম! আবেশে চোখ প্রায় বুঁজে বুঁজে আসে আর কি? কিন্তু আরাম যতই হোক না কেন, চোখটি সর্বদা খোলা রাখতে হবে। সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। নচেৎ হাঙ্গরের পেটে যেতে মুহূর্ত মাত্রও বিলম্ব হবে না। হেয়ারডালের আরামচর্চা জমে উঠেছে, হঠাৎ তিনি দেখলেন, একটু দূরেই মূর্তিমান এক হাঙ্গর ভেসে উঠেছেন এবং গুটি-গুটি এগিয়ে আসছেন তাঁরই দিকে। হেয়ারডাল চট করে ভেলার উপর উঠে পড়তেই উনি ধীর সুস্থে জল কেটে বেরিয়ে গেলেন। তবে হেয়ারডালের এই পশ্চাদপসরণটা তাঁর তেমন মনঃপুত হল না। তাই যাবার সময় ল্যাজের ঘায়ে হেয়ারডালের গায়ে কিঞ্চিৎ জল ছিটিয়ে যেন 'ছুয়ো' বলে কেটে পড়লেন।

হেয়ারডাল ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখতে লাগলেন। প্রায় ছ ফুট লম্বা তার দেহ। ঘন বাদামী রং তার দেহে। অজস্র কৌতূহলভরা দুটো চোখে তাকাতে তাকাতে কোন অতলে মিলিয়ে গেল।

"হা-ঙ্গ-র!"

হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল কৃনুট।

হাঙ্গর তো হরবখত দেখছেন তাঁরা। শুধু হাঙ্গর দেখে তো এত উত্তেজনা হবার কথা নয় কৃনুটের। তবে নিশ্চয়ই সে একটা অদ্ভুত কিছু দেখেছে।

হ্যাঁ, অদ্ভুতই বটে। সারা দিনের এই অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার পর রাত্রে ডায়েরি লিখতে লিখতে হেয়ারডালের মনে হল, ব্যাপারটা শুধু অদ্ভুতই নয়, হয়ত অবাস্তবও।

হেয়ারডাল ডায়েরির পাতা খুলে লিখতে লাগলেন, ২৪শে মে। আমরা এখন ঠিক ৯৫° পশ্চিমে আর ৭° দক্ষিণে। অলস মন্থর গতিতে ভেসে চলেছিলাম। এমন সময় কৃনুটের তীক্ষ্ণ চিৎকার বাতাস চিরে ছুটে বেরুল। 'হাঙ্গর।' বুঝলাম এ সাধারণ হাঙ্গর নয়। তাহলে আর কৃনুট্ অত উত্তেজিত হত না। হাঙ্গর তো সারাক্ষণ দেখছি। এত দেখছি যে ওসম্পর্কে আব কৌতূহলই নেই। তাই চট করে হাজির হলাম কৃনুটের পাশে। দেখি সবাই এসে জড় হয়েছে সেখানে। চেয়ে আছে হতবাক কৃনুটের দৃষ্টি যেদিকে, সেইদিকে।

সেদিকে আমিও চাইলাম। দেখলাম। দেখেই চমকে উঠলাম প্রথমটা। এক অতি কুৎসিত, অতিকায় প্রাণী ভেসে উঠেছে। মাথাটা চ্যাপটা। অবিকল ব্যাঙের মত। তবে সাধারণ একটা ব্যাঙের থেকে প্রায় পঁচিশ গুণ বড়। মাথার দুপাশে দুটো চোখ। ছোট কুৎকুতে দুটো চোখ। তাতে কুশ্রীতা আরও যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যাঙের মত চোয়াল। তবে তার হাঁ-টা ৪।৫ ফুট চওড়া তো হবেই। হাঁ নয়তো, যেন অন্তহীন এক গহ্বর। আর

সেই গহ্বরে সাজান রয়েছে পাটির পর পাটি হিংস্র হিংস্র দাঁত। মাথার পিছনেই আছে মাংসের প্রকাণ্ড এক পিণ্ড। তার দেহ। দেখে ছোট খাট এক পর্বত বলেই মনে হয়। লম্বা একটা লেজ। লেজের পাখনা খাড়াভাবে জলের উপর উঠে গেছে। তিমি যে নয়, লেজ দেখে তা বোঝা গেল। জ'ের মধ্যে ওর গায়ের রং বাদামী বাদামী ঠেকল খানিকটা। কাছ থেকে দেখলাম, ওর গায়ে মাথায় অজস্র সাদা সাদা ছিট।

এই অতিকায় দানব ধীরে-সুস্থে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। দানবটার আগে আগে এক ঝাঁক ডোরাকাটা পাইলট মাছ চলেছে। ওরা যেন পাইক বরকন্দাজ। শুধু তাই নয়, ওর আশেপাশে ভেসে চলেছে আরও হরেক মাছের ঝাঁক। ওরা সব মোসাহেব।

হাঙ্গর ধরবার জন্যে আমরা ছটা বড় বড় বঁড়শি পেতে রেখেছিলাম। একটা বঁড়শিতে ২৫ পাউণ্ড ওজনের এক ডলফিন মাছের টোপ গেঁথে রেখেছিলাম। পাইলট মাছগুলো সোজা সেদিকে ছুটে এল। ডলফিনটাকে ওরা কেউ ছুঁলো না কিন্তু। তারপর তাদের প্রভুর কাছে, এই দানবটার কাছে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। কিন্তু এই বিরাট দানবটির সারা দেহে কোনও চাঞ্চল্য নেই। সসাগরা এই পৃথিবীর সে যেন সম্রাট। তার মান মর্যাদা বজায় রেখে তাকে চলতে হয়। তাই আস্তে আস্তে সে ডলফিনটার দিকে এগুতে লাগল। আমরা ডলফিনটাকে একটু একটু করে সরাতে লাগলাম, সেও একটু একটু এগিয়ে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে ভেলার গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলতে লাগল। ডলফিনটার দিকে দৃকপাতও করল না। নাক দিয়ে ওটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। ভাবখানা এই, এই তুচ্ছ বস্তুটির জন্য হাঁ করাটাও যেন বাজে পরিশ্রম। ডলফিনটাকে সে আমলেই আনল না, তবে ভেলাটাকে যেন পছন্দ করল বলে মনে হল। আদর জানাবার জন্যেই হোক, কি নিজের পিঠটা একটু চুলকে নেবার জন্যেই হোক, সে করলে কি, নিজের

পিঠটা আলতোভাবে একবার ঘষে নিলে ভেলার গায়ে। বালসা গাছের গুঁড়িগুলো পটপট করে উঠল সেই ধাক্কায়। আমরা ছিটকে পড়তে পড়তে কোন রকমে টাল সামলে নিলুম। কিন্তু ব্যাটা জ্বালালে তো! এ-রকম রসিকতা আর বার কতক করলেই আমাদের আর দেখতে হবে না। ভেলার দফা তো গয়া হবেই আর আমাদেরও 'কাশী প্রাপ্তি' হতে বিলম্ব হবে না।

নাঃ রসিক আছে ছোকরা (অবিশ্যি ওকে যদি ছোকরা বলা যায়) মনে মনে হেয়ারডাল ভাবলেন। এক ঢিলে লোকে দুই পাখি মারে আর এ এক ধাক্কায় আমাদের গয়া কাশী দেখিয়ে ছেড়ে দেবে। একেবারে কনসেশন রেটে।

ডায়েরি লিখতে লিখতে সমস্ত ছবিটা ওঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঐ অতিকায় দানবটাকে এত কাছাকাছি দেখে ওদের আক্কেল বুদ্ধি, এমন কি ভয় ডর পর্যন্ত উপে গেল। ওদের মনে হতে লাগল, এ অবাস্তব, এ হতে পারে না, আসলে তাঁরা কেউই জেগে নেই, সমস্ত জিনিসটাই স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। হেসেলবার্গের মনে হতে লাগল, বেচারা আহা ওয়াল্ট ডিজনী থাকলে বেশ হত। লজ্জা পেত নিজের সৃষ্ট এতদিনকার জন্তু জানোয়ারের কার্টুনগুলো দেখে। হঠাৎ বেদম হাসি পেয়ে গেল হেসেলবার্গের। হো হো হো করে হাসতে শুরু করলেন ওকে দেখে। আরেকজন যোগ দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। আরেকজন আরেকজন আরেকজন। শেষ পর্যন্ত সবাই। সবাই। কি মজা, কি গাঁজা। একেবারে গাঁজাখুরী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল সব ব্যাপারটা। হো হো হো হো। জেগে আছি না ঘুমিয়ে আছি, বেঁচে আছি না মরে গেছি। ঐ কিম্ভূতটাকে দেখছি, না মনের ভুল। হা হা হা হা। কি অদ্ভুত। ওঃ কি চেহারা ব্যাটার।

সবাই যেন পাগল হয়ে গেছেন। হাসছেন। চেঁচাচ্ছেন। লাফাচ্ছেন। নাচছেন ধেই ধেই করে ভেলার উপর। খুব

আমোদ পেয়েছেন যেন। গামলা গামলা মদ খেলেও, মদের পুকুরে ডুবে থাকলেও এমন ফুর্তি হয় না, এমন উত্তেজনা হয় না।

কিন্তু যতই ওঁরা ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করুন, পারলেন না। সে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করল না ওঁদের। তার যা মন চাইল সে তা-ই করতে লাগল।

আরে এই এই, ব্যাটা যে ভেলার তলে ঢুকে পড়ল। কি মতলব ব্যাটার? কি, পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাবে নাকি? থাক বাবা, আর অত ভালবেসে কাজ নেই। নেকনজরটা এদিকে না দিয়ে অন্যদিকে দাওনা বাবা। এত বড় সমুদ্র পড়ে রয়েছে। খুব যে একটা জায়গার অভাব পড়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। যাক বাবা, বেরিয়ে গেছে। বাঁচা গেল। ওমা আবার যে ঢুকচে। কি লম্বা দেখেছ। ফুট পঞ্চাশেক তো হবেই। এই রে, আবার ঘুর পাক খেতে লাগল যে। সেরেছে। কি আছে আজ কপালে কে জানে? ব্যাটার ভাবসাব দেখে তো মনে হয় একটি গো মুখ্যু। লেখাপড়া শেখেনি। না হলে খবরের কাগজের কাটিংগুলো দেখিয়ে ওকে বোঝান যেত কি মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁরা ভেলায় করে যাত্রা করেছেন। কাজেই এখন কোনও রকম বাজে ইয়ার্কী করবার সময় ওঁদের নেই। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। বেড়ে মজা পেয়ে গেছে ব্যাটা ভেলার তলে ঢুকে। মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন ঐ গোদা ল্যাজের একটি ঘাই যদি মারে, তবেই বিপত্তির ষোল কলা পূর্ণ হয়।

নাঃ, ভাল কথার লোক নয়। নাও হে নাও, হারপুনগুলো বের করে দাঁড়াও তৈরী হয়ে। না, আবার বেরিয়েছে। কিন্তু বেরোলে হবে কি? সঙ্গ যে ছাড়ে না। এপাশে যাচ্ছে, ওপাশে যাচ্ছে, সামনে যাচ্ছে, পিছনে যাচ্ছে।

হেয়ারডাল ডায়েরিতে লিখলেন, "বড় জোর এক ঘণ্টা ছিল।

[illegible]নে হতে লাগল, যেন গোটা দিনই ও আছে আমাদের সঙ্গে। তাই বা কেন? মনে হতে লাগল, অনন্তকাল ধরে যেন ও সঙ্গে সঙ্গে আসছে। উঃ, সে কি অস্বস্তি।

"এটা হচ্ছে তিমি-হাঙ্গর। প্রাণী-তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, এই জাতীয় প্রাণী খুবই বিরল। এদের ওজন হয় টন পনেরো। ৬৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা তিমি-হাঙ্গরের কথাও শোনা গেছে। কিন্তু কেউ দেখেনি। একবার একটা বাচ্চাকে মারতে পারা গিয়েছিল। তা তার মেটের ওজনই হয়েছিল ৬০০ পাউণ্ড। আর, ছোট বড় হাজার তিনেক দাঁত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু একে তো নিতান্ত খোকাটি বলে মনে হচ্ছে না।

"আমরা ছয় জনে ছয়টা হারপুন নিয়ে দাঁড়ালাম। এরিকের হারপুনটাই বিরাট। আট ফুট লম্বা। এরিক আর থাকতে পারলে না। আচমকা এক হঠকারিতা করে বসল। ও দাঁড়িয়েছিল একেবারে ধারে। হঠাৎ তার হারপুনটা মাথার উপরে তুলে সজোরে ছুঁড়ে মারল তিমি-হাঙ্গরের কদাকার মাথায়। কিন্তু ঐ বিরাট দেহে হার-পুনটা খড়কে কাঠির মত গিয়ে বিঁধল। সর্বনাশ, এরিক একি করে বসল?

"এক সেকেণ্ড। দুই সেকেণ্ড। দানবটা ভাল করে বুঝতে পারল না, ব্যাপারটা কি হল? আর তারপর—

"চক্ষের পলকে ঐ বিরাট দেহ পরিবর্তিত হয়ে গেল একটা অতিকায় সুদৃঢ় মাংসপেশীতে। যেন একটা ইস্পাতের পাহাড়। হ্যাঁ, একটা ইস্পাতের পাহাড়। এ ছাড়া আর কোনও উপমা দিয়ে বোঝান যায় না তাকে। আমরা একটা সোঁ সোঁ শব্দ শুনলাম। আর দেখলাম আমাদের চোখের সামনে দিয়ে এরিকের হারপুনের দড়ি বিদ্যুৎবেগে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ঐ দানবের বিরাটকায় মাথাটা একবার অস্থিরভাবে জলের উপর লাফিয়ে উঠল। ঝপাস করে সমুদ্রের জল চলকে গেল। ভেলাটা ভীষণ বেগে দুলে উঠল।

পটাং করে ছিঁড়ে গেল হারপুনের সেই অসীম শক্তিশালী দড়ি। হারপুনটা টুকরো টুকরো হয়ে জলের উপর ভেসে উঠল। জল তোলপাড় হতে লাগল। ভীতত্রস্ত পাইলট মাছের ঝাঁক দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল।

"পারলে আমরাও হয়ত ঐ পাইলট মাছদের মত ছুট দিতাম। অন্ততঃ চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমরা কি করে পালাব? কিন্তু আমরা কোথায় পালাব? তাই নিরুপায়, অসহায় কটি ডাঙার প্রাণী চুপচাপ সেই বালসা গাছের গোটা কয় গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে রইলাম প্রতিহিংসা-পরায়ণ এক অতিকায় দানবের সম্ভাব্য এক ক্রূরতম, হিংস্রতম আক্রমণের।

"সমুদ্রের উপর কি অপূর্ব রোদের খেলা শুরু হয়েছে···কি অপরূপ লাগছে ঐ দিকচক্রবালের কাছে ছোট ছোট রূপালী ঢেউ-এর লুটোপুটি···একটানা মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে চলেছে·· তরঙ্গে তরঙ্গে কি অপার্থিব সঙ্গীত শুরু হয়েছে···"

২০

দিন, রাত, সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। সূর্য তার গতিপথে অসংখ্য-বার উঠেছে, নেমে গেছে অস্তাচলে। আকাশ তারার মেলা বসিয়েছে রাতের পর রাতে। চন্দ্র তার খবরদারি করেছে। 'কন্‌টিকি'র আরোহীদের সঙ্গে কত তারার পরিচয় ঘটেছে। কত তারা আবার হারিয়ে গেছে।

তিমি-হাঙ্গর সেই যে খোঁচা খেয়ে পালিয়েছে, আর ফেরেনি। আর দেখা যায়নি তাকে। মধ্যে এক তিমির পালের মধ্যে তাঁরা পড়েছিলেন। কিন্তু তিমিরা তাঁদের কোন যন্ত্রণা দেয়নি, ভয় দেখায়নি। বরং তাঁদের আনন্দই দিয়েছে। প্রায় সাতটা আটটা তিমি এক পালে ছিল। 'কন্‌টিকি'কে দেখে তাদের পুলক এমন পাখা মেলে চেগে উঠেছিল যে, ঐ অতিকায় দেহ নিয়ে জলের উপর পুঁটি

মাছের মত তিড়িং তিড়িং লাফ দিয়ে নৃত্য জুড়ে দিয়েছিল। সেই তিমির দলও অনেকদিন হল তাঁরা ছেড়েছেন। আরও এগিয়ে গেছেন। যে হাঙ্গরগুলো সেই গোড়া থেকে কন্‌টিকির সঙ্গ নিয়েছিল তারা কবেই পিঠ্‌টান দিয়েছে। নতুন ঝাঁক এসেছে, সঙ্গ নিয়েছে কিছুদিন। তারপর ক্লান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। ডলফিনেরা গেছে, বনিটো, তলোয়ার মাছ, কাট্‌ল মাছ, আরও চেনা অচেনা অনেক রকম এসেছে, গেছে।

'কন্‌টিকি'র চেহারা বদলে গেছে। সারা গায়ে তার শ্যাওলা জমে গেছে। জলের তল থেকে উঁকি মারলে সেগুলোকে দাড়ি গোঁফ বলে মনে হয়। সত্যি বলতে কি 'কনটিকি'কে জলের মধ্য থেকে এক কিম্ভূত জল-জানোয়ার বলেই মনে হয়। সেই অজস্র দাড়ি-গোঁফের মধ্যে পাইলট মাছেরা পরম নির্ভরতায় বাসা বেঁধে আছে। একমাত্র পাইলট মাছেরাই 'কনটিকি'র সঙ্গ ছাড়েনি।

এদেরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে প্রত্যেকের। বেঙ্গট ছাড়া আর সকলের চুলে প্রায় জট পড়বার উপক্রম হয়েছে। গ্রীষ্মমণ্ডলের তাপে ওদের গৌর বর্ণ তামাটে হয়ে গেছে। পলিনেশীয়দের গায়ের রং যেমন তামাটে তামাটে, অনেকটা সেই ধরনেরই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাঁরা দিনরাত ভেসে চলেছেন। বিষুব রেখার কাছাকাছি ক্রমেই সরে সরে যাচ্ছেন। রোদের রাজ্য পেরিয়ে মেঘের রাজ্যে, মেঘের রাজ্য ছেড়ে ঝমঝম বৃষ্টির রাজ্যে এসে পড়লেন তাঁরা। কী বৃষ্টি! দিনরাত কামাই নেই এই মুষল ধারার। তারপর একদিন সমুদ্র আবার কথঞ্চিৎ শান্ত হল। বৃষ্টি কমল। 'কন্‌টিকি' বিষুব রেখার কাছে আরও এগিয়ে গেল। আরও এগুলো।

বাতাস একটু গতি পরিবর্তন করল এবার। দক্ষিণ-পূর্ব থেকে এতদিন প্রবাহিত হচ্ছিল, এবার বইতে লাগল শুধু পূব থেকে। দিন কয়েক কন্‌টিকি সোজা পশ্চিমেই চলল বাতাসের মর্জিমত। তারপর

হঠাৎ একদিন আবার দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুরে গেল তার মুখ। পথে ফিরে এল যেন।

সেই প্রথম দিন থেকে কৃনুট আর টর্স্টিনের সেই যে খুটখাট শুরু হয়েছে ওদের বেতার-যন্ত্রটা নিয়ে তা আজও থামেনি। অশান্ত বিক্ষুব্ধ সমুদ্র একদিন তাঁদের যে নাকানি চোবানি খাইয়েছিল তার কথা আর সবাই ভুলে গেলেও এই বেতার-যন্ত্রটা ভোলেনি। তার কারণ সমুদ্রের লোনা জল, আর কাউকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। কিন্তু বেতার যন্ত্রটাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়ে গেছে। কখনও চিৎকার করে উঠছে সেটা, কখনও বা বোবা হয়ে যাচ্ছে। টর্স্টিন আর কৃনুটের ধৈর্যের যেন সীমা নেই। ঝালাই করবার ডাণ্ডাটা নিয়ে এটা সারছেন, সেটা সামলাচ্ছেন। এরিয়েলের তার ফিট করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, নানা তরঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছেন। দৈবাৎ কারো সঙ্গে সংযোগ হয়ত ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা ঠিকমত ধরতে না ধরতেই ফশকে যাচ্ছে। মহাব্যোমের কোথায়, কোন কোনায় তা মিলিয়ে যাচ্ছে, কে জানে ?

কিন্তু কেউ শুনতে পাক আর না পাক, কেউ ধরতে পারুক আর পারুক ওরা দুজন অসাধারণ অধ্যবসায় বশে নিজের কাজ করে চলেছেন।

একদিন রাত্রে, হঠাৎ নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই, একটা স্বর ধরা পড়ল। লস্ এঞ্জেল্‌সের একজন শখের বেতার অপারেটর তখন নিজের প্রেরক যন্ত্রের সামনে বসে সুইডেনের আরেকজনকে বেহালা বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন। হঠাৎ টর্স্টিনের স্বর তার রসভঙ্গ করে বেজে উঠল, 'হ্যালো'। ভুত্তোরি বলে ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে উঠতে না উঠতেই তাঁর কানে গেল, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। আমি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভাসমান এক ভেলা থেকে বলছি। হ্যালো।

ভদ্রলোকের সঙ্গীতের নেশা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল। এ কি রসিকতা না কি ?

হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। কোথেকে বলছেন?

হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বসে ভেলায় করে দোল খাচ্ছি। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ভেসেছি দেড়মাস হল।

খট্ খট্ খুট্—

হ্যালো হ্যালো। বলুন—

হ্যালো। হ্যাঁ, দেড়মাস আগে ভেসেছি। পলিনেশিয়া যাত্রা করেছি।

হ্যালো হ্যালো। কোথায়? কোথায় যাচ্ছেন?

হ্যালো হ্যালো। পলিনেশিয়ায়। দু হাজার মাইল পাড়ি মেরেছি। তবে মনে হয়, আরও অতখানি পথ পাড়ি মারতে হবে।

এইবার আওয়াজটা ক্ষীণ হয়ে এল। কৃনুট আর টর্স্টি'ন প্রাণপাত পরিশ্রম করে চাঙ্গা করে তুললেন যন্ত্রটাকে। আবার ধরলেন সেই লোকটিকে। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের ওটা কি সেট। টর্স্টি'ন জবাব দিলেন। তারপর আরও কথা হল। পরিচয় হল হাজার হাজার মাইল ব্যবধানের দুই প্রান্তে থাকা দুটি প্রাণীর মধ্যে। দুজন মানুষের মধ্যে। এ এক আশ্চর্য পরিচয়। দেখা নেই সাক্ষাৎ নেই। শুধু কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের পরিচয়। শুধু কি মাত্র পরিচয়। এ যে প্রগাঢ় সখ্য। যতবার সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর টর্স্টি'নের কানে এসে বাজে এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে তাঁর দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কোথায় লস্ এঞ্জেল্‌স্ আর কোথায় তাঁরা? তবু কি নৈকট্যের বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছেন এই বেতার যন্ত্রটার কল্যাণে।

টর্স্টি'ন তাঁর পরিচয় দিলেন। তাঁদের সকলের পরিচয় দিলেন। অপর দিক থেকেও তার প্রত্যুত্তর এল।

সেই অলক্ষিত স্বর, সেই আকাশবাণী বলতে লাগল, আমি

হল্। মানে হ্যারল্ড কেমপেল। আমার স্ত্রীর নাম আনা। সে সুইডিশ। বন্ধু, সে তোমাদের খবর তোমাদের স্বজন-পরিজনের কাছে পৌঁছে দেবে।

হল্ নিজের যা পরিচয় দিলেন, তাতে জানা গেল, তিনি এক সিনেমার অপারেটর। ভাবতেও আশ্চর্য লাগল ওদের যে, এই বিশাল, বিপুল, কোটি কোটি মানুষ অধ্যুষিত, পৃথিবীতে এই হল্ই এখনও পর্যন্ত একমাত্র মানুষ, যিনি তাঁদের সর্বশেষ সংবাদ জানেন।

হল্ শুধু একা নয়, তাঁর এক বন্ধুকেও জুটিয়ে আনলেন। তারপর তাঁরা তুজনে পালা করে সারাক্ষণ তাঁদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চললেন। হল্ আর তাঁর বন্ধু ফ্রাঙ্ক কুয়েডাস প্রতিদিন হারমানের আবহাওয়ার সংবাদ মার্কিন আবহাওয়া দপ্তরে পাঠাতে লাগলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে কৃনুট আর টর্স্টিন আরও নানা অ্যামেচার বেতারুদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। কনটিকির বেতার স্টেশনের সংকেত-নাম হল "এল আই ২ বি"।

হঠাৎ একদিন এক প্রচণ্ড ঢেউ 'কনটিকি'র উপর ভেঙে পড়ল। বেতারযন্ত্রে লোনা জল ঢুকে পড়ল। বোবা হয়ে গেল। কয়েকটি পরিচিত কণ্ঠস্বর প্রাণপণে তাঁদের খুঁজে বেড়াতে লাগল। মহাশূন্যে বৃথাই আকুল হয়ে ঘুরতে লাগল। হারানো সাথীকে ডেকে ডেকে।

হ্যালো হ্যালো। এল আই ২ বি? এল আই ২ বি? হ্যালো এল আই ২ বি? হ্যালো?

কিন্তু "এল আই টু বি" নীরব। যেন চিরতরেই বোবা হয়ে গেছে। শুধু কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে টর্স্টিন আর কৃনুট যন্ত্রটাকে মেরামত করে চলেছেন। ঠুক ঠাক ঠুক ঠাক। একমনে তাঁরা তাঁদের কাজ করে চলেছেন। শীঘ্র কর, শীঘ্র মেরামত কর। মন তাঁদের তাড়া লাগাল। পৃথিবীর সঙ্গে যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে তাকে আর নষ্ট করা চলবে না। তাড়াতাড়ি কর। ত্বরা কর। দেরী

হলে ওরা হয়ত হতাশ হয়ে বন্ধ করে দেবে ওদের যন্ত্রের চাবি। একবার মুখ ফেরালে আর তাঁদের পাত্তা পাওয়া সহজ হবে না। কি অস্বস্তি কৃমুটের মনে, কি অশান্তি টর্স্টিনের। কিন্তু তাঁদের কাজের কামাই নেই। বিশ্রাম নেই।

কদিন্ ধরে দিনরাত পরিশ্রমের পর, এক রাত্রে তাঁদের যন্ত্র আবার কথা বলল।

হ্যালো এল আই ২ বি বলছি।

আর যাবে কোথায়? ঝাঁকে ঝাঁকে নানা কণ্ঠস্বর, ব্যগ্র, বিস্মিত, হতাশ আওয়াজ আকাশ চিরে বাজপাখির মত যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এল আই ২ বি?

হ্যালো, এল আই ২ বি।

আরে, এল আই ২ বি?

কি ব্যাপার?

কোন সাড়াশব্দ নেই কদিন?

সব কুশল তো? কোন দুর্ঘটনা হয়নি তো?

আমরা ভেবে মরি।

সব ভাল। সব ভাল। টর্স্টিন জানায়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বন্ধু।

ভাল? যাক বাবা বাঁচা গেল। কী হয়েছিল?

বিগড়ে গিয়েছিল যন্ত্রটা।

যখন টর্স্টিন এইসব কথাবার্তা চালাচ্ছেন তখন এরিক ছইএর মধ্যে বসে বসে ফটো ডেভলপ করছেন। এ কাজে এই তাঁর হাতে খড়ি। বইএর নির্দেশ মত রাসায়নিকগুলো ঠিকই মেশাচ্ছেন। সময়ও ঠিক রেখেছেন। তবে কেন ফল ভাল হচ্ছে না? কেন এ রকম দাগ পড়ছে?

হঠাৎ ওর মাথায় এক বুদ্ধি গজাল। সেই কোনা থেকেই

এরিক চেঁচালেন, ওহে টর্স্টিন তোমার বন্ধুদের বল তো, ওদের কেউ একটা লেবরেটরি থেকে জেনে দিক, কেন ফটোগুলো এমন হচ্ছে।

টর্স্টিন তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা একজনকে জানালেন। তিনি আবার লেবরেটরি থেকে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে টর্স্টিনকে জানিয়ে দিলেন, ঠাণ্ডা জলে ডেভলপ করতে বল।

আরেকদিন রাত্রে টর্স্টিন হঠাৎ নরওয়ের এক বেতারুকে ধরলেন, তাঁর বাড়ি অসলোর কাছে। সেদিন ২রা আগস্ট। পরের দিনই রাজা হ্যাকন পঁচাত্তর বছরে পড়বেন। ওরা ঠিক করলেন, এর জবানিতে তাঁরা রাজার কাছে অভিনন্দন পাঠাবেন। পাঠালেনও। পরদিন তার জবাবও পেলেন। রাজা হ্যাকন খুশী হয়ে ওঁদের যাত্রা সফল হোক বলে শুভকামনা পাঠিয়েছেন।

সেই বাণী পেয়ে ওঁরা খুশী হলেন।

এই পৃথিবী এত নিকটে! কৃনুটের অবাক লাগল। এত কাছে এই পৃথিবী! এ যেন একটা মস্ত বড় হাওয়া মিঠাই। দেখতে বড় সড় কিন্তু হাতে ধরলে একটুখানি। কী আশ্চর্য।

২১

এই ভাল। এই মহাকাশের নিঃসীম সামিয়ানার নীচে, এই শত দিগন্ত বেষ্টিত মহাসমুদ্রের নিস্তরঙ্গ নিথর জলে এক ছোট্ট রবারের ডিঙি চড়ে ভেসে থাকা। এই তো ভাল।

এটা কোন্ সময়? এটা কোন্ সন? ১৯৪৭। খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর এতগুলো সন কেটে গেছে। গেছে নাকি? তাঁরা কি তবে খ্রীষ্ট-উত্তর অব্দে আছেন? নাকি খ্রীষ্টের জন্মাবার ১৯৪৭ সন আগে আছেন?

এই অদ্ভুত পরিবেশে জানা হিসেব গোলমাল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে তাঁদের মনে, কে তাঁরা? কোন্ যুগের মানুষ?

এই বিংশ শতাব্দীর? নাকি আরো হাজার হাজার বছর আগেকার কোনও যুগের?

মাঝে মাঝে মনে হয়, সময় থেমে গেছে, কাল নিশ্চিহ্ন হয়েছে। নিঃশেষ হয়ে গেছে আবর্তন, বিবর্তন।

ইওরোপ কোথায়? আমেরিকা কোথায়? কোথায় সেই রণোন্মত্ত মানুষগুলো? কবে যেন তাঁরা সভ্যতা, যন্ত্র, বিমান, বোমা, অণু, পরমাণু, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র, জাতি—এই সব কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত কথা, যুদ্ধ, শান্তি, সন্ধি—এই সব আশ্চর্য আশ্চর্য শব্দ শুনেছিলেন। একদিন তাঁরাও ঐ সব ছাঁচে ঢালাই হয়েছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন।

এখন, এখানে, এই আদিগন্ত সমুদ্রে ছোট্ট রবারের ডিঙিটায় গা এলিয়ে, সে সব কথা মনে পড়লে ওঁরা অবাক হন। কি মূর্খতা, কি মূর্খামিই না করেছেন! পিছনের জীবনটাকে কেবল কতকগুলো মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর কাজের সমষ্টি বলে মনে হয়। তুচ্ছ। কত তুচ্ছ কাজকে কি গুরুত্বই না দিয়ে থাকে মানুষ!

কত ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে সময়কে, গন্তব্যকে, দূরত্বকে। ফুট, গজ, মিটার, মাইলের যে হিসেব তা তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন। এখন তাঁদের হিসেব দিগন্তের মাপে। দিগন্তের পর দিগন্ত পেরিয়ে এসেছেন তাঁরা। আরো অনেক দিগন্ত পেরিয়ে পৌঁছবেন তাঁদের গন্তব্যে।

পূবের দিকচক্রবাল যখন রাঙা হয়ে ওঠে নতুন-ওঠা সূর্যচ্ছটায়, তখন ওঁরা এক নতুন দিনে পৌঁছান। পশ্চিমের আকাশ সিঁদুরে হতে হতে যখন সব আলো মুছে যায়, তখন ওঁদের দিন শেষ হয়। রাত্রি আসে। আকাশের গায়ে তারার ফুল এঁকে এঁকে, উল্কার ফুলকি ছুঁড়ে ছুঁড়ে।

অবাক লাগে। শুধু অবাকই লাগে ওদের।

প্রথম যেদিন এই রবারের ডিঙিটা জলে ভাসালেন ওঁরা, কি

উত্তেজনাই না হয়েছিল ওঁদের। দুজন ডিঙিটায় উঠলেন, আর বাকি চারজন ভেলার উপর থেকে দুরুদুরু বুকে চেয়ে রইলেন ওঁদের দিকে। ঐ চলেছেন দুজন, ধীরে ধীরে ডিঙিটা বেয়ে। তাঁরাও ওঁদের দিকে চেয়ে আছেন। হঠাৎ ডিঙির লোক দুঠো হাসতে আরম্ভ করল। সে কি হাসি। সে হাসি আর থামতে চায় না।

এতদিন ভেলার উপরেই অষ্টপ্রহর কাটিয়েছেন। দূর থেকে তাকে দেখবার অবকাশ পান নি। এখন এই রবারের ডিঙিটার কল্যাণে বাইরে থেকে তাঁদের ভেলাটাকে দেখবার সুযোগ পেলেন।

কি রকম কিম্ভুতকিমাকার লাগছে দ্যাখ ভেলাটাকে। বালসা গাছের গুঁড়িগুলোর গায়ে এরই মধ্যে কত রকম শ্যাওলা জমে গেছে। লম্বা লম্বা শ্যাওলাগুলো যেন 'কন্‌টিকি'র দাড়ি। এক গাল দাড়ি গোঁফ নিয়ে ঢেউয়ের দোলায় দোলায় লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে 'কন্‌টিকি'। তার পিঠে যাবা চড়ে আছে তারাও তো কম কিম্ভুত নয়। কি চেহারা হয়েছে এক-একজনের। অ্যাঁ! রোদে পুড়ে সাদা রং তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। মাথায় চুলের জঙ্গল আর মুখে দাড়ি গোঁফের। ছোট ছোট জাঙিয়া-পরা মূর্তিগুলো আদুড় গায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে মনে হয় এক একজন যেন ভ্যাগাবণ্ড নম্বর ওয়ান। ঐ মূর্তি দেখে কে হাসি চেপে রাখতে পারে?

তাই ডিঙিতে উঠেই দুজনে (যে দুজন প্রথম উঠলেন) হাসতে শুরু করে দিলেন। ভেলার লোকেরা তো ওদেব কাণ্ড দেখে অবাক। পাগল হল নাকি? কিন্তু পরে দেখা গেল, যাঁরাই ডিঙিটাতে চড়ছেন, ডিঙি থেকে সেই কিম্ভুত ভেলা আর তার আরোহীদের দেখছেন, হাসতে হাসতে তাঁরাই পাগলের মত হয়ে যাচ্ছেন।

এই এক খেলার নেশা চাপল ওদের ঘাড়ে। ডিঙি ভাসিয়ে

ভেলাকে দেখার খেলা। দিনে এক রকম দেখতে লাগে। রাতে আবার অন্য রকম। অমাবস্যার রাতে এক রূপ, পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্নায় আবার অন্য চেহারা।

ভেলাটা ছেড়ে একটু দূরে এলেই আকাশ আর সমুদ্র একেবারে ঢেকে দেয় ওঁদের। এ যেন এক প্রকাণ্ড ঝিনুকের বিরাট দুই ঢাকনা। আকাশ আর সমুদ্র। ঝিনুকের ঢাকনা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না তাঁদের। আর কী নীল! নীল, নীল, নীল, নিঃসীম। চারিদিক থমথমো, মেরেছে নিঃঝিম।

বড় বড় ঢেউ এসে ভেলাটাকে এতদিন নাকানি চুবানি দিত। নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত ওঁদের। ওঁদের আতঙ্ক হত! ওঁরা ভয় পেতেন। সেই প্রথম প্রথম ওঁরা বড় ভয় পেতেন। কিন্তু সেদিন কবে পার হয়ে গেছে। ওরা আর এখন সমুদ্রের বশে নেই। বরং ওদের ভাব দেখে মনে হয়, সমুদ্রই বুঝি ওদের বশ্যতা স্বীকার করেছে। ওঁরা ডিঙি থেকে দেখেন, বিরাট বিরাট ঢেউ যখন এগিয়ে আসে, 'কন্‌টিকি' তখন কি এক অদ্ভুত কৌশলে সেই ঢেউ-এর ঝুঁটি ধরে এক টপাক-লাফে তাকে টপকে যায়। এ যেন ইস্কুলের সেই ভল্ট মারা খেলা।

জ্যোৎস্না রাত্রে ঢেউগুলো যখন ভেলার উপর আছড়ে পড়ে, জল ছিটোয়, তখন জ্যোৎস্নার সেই রূপো রূপো আলোয় মনে হয়, সমুদ্র যেন ভেলাটাকে রূপো দিয়ে গিল্টি করে দিচ্ছে। আর অন্ধকার রাত্রে ঢেউয়ের ধাক্কায় 'কন্‌টিকি' যখন ছুটে চলে তখন তার পিছু পিছু আসা ঢেউগুলোকে দেখে মনে হয়, একদল বড় বড় কাল কাল পোষা কুকুর, যেন একটা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে।

এইভাবে তাঁরা দিনের পর দিন এগিয়ে চলেন। স্রোতের টানে আর বাতাসের ঠেলায় 'কন্‌টিকি' নিতান্ত কম জোরে ছোটে না। গড়ে ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল্।

ঢেউকে তাঁরা আর ভয় করেন না, সমুদ্রকে তাঁরা আর সমীহ

করেন না। এমন যে এমন হিংস্র হাঙ্গর, সব থেকে রক্তলোলুপ সামুদ্রিক প্রাণী, রোজ দেখতে দেখতে তাকেও থোড়াই কেয়ার করতে শুরু করলেন। আগে হাঙ্গর দেখলে পালাতেন, এখন সাহস বাড়ায় হাঙ্গরের সঙ্গে খেলা শুরু করলেন। নতুন নতুন খেলা।

কৃমুট একদিন চান করতে নেমেছেন এমন সময় দেখা গেল একটা কাল ধূসর ছায়া জল কেটে তীর গতিতে তাঁর দিকে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভেলার উপর থেকে চিৎকার শোনা গেল, কৃমুট, হুশিয়ার, হাঙ্গর। কৃমুট পড়ি কি মরি করে সাঁতার কেটে ভেলায় এসে উঠে পড়ল। শিকার নাগালের বাইরে চলে গেল। কৃমুটের অসভ্যতায় হাঙ্গরটি খুব চটেছে বলেই মনে হল। ল্যাজের সপাং ঘাইয়ে জল ছিটিয়ে মনের বিরক্তি প্রকাশ করল। তাই দেখে আহা বলে কে যেন বেচারাকে একটা ডলফিনের মাথা উপহার দিলে। ব্যস্, তারপর থেকে ওঁদের হাঙ্গরকে মাংস খাওয়ান রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল।

তবে প্রত্যেক দিন এইভাবে হাঙ্গরকে খাবার দেওয়াতে একজন আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন, এমনি যদি আমরা হাঙ্গরকে মাংস গিলিয়ে যাই, তাহলে আমরা হাঙ্গর সমাজের তুটো বড় অপকার করব। প্রথমত, গ্রাটিসে খাবার খেতে খেতে ওদের খাটবার অভ্যেস নষ্ট হয়ে যাবে। এক একটা কুঁড়ের বাদশা হয়ে পড়বে। আর দ্বিতীয়ত, আমরা এইভাবে ভিক্ষা দিয়ে ওদের আত্মমর্যাদায় ঘা দিচ্ছি। তাই আমার প্রস্তাব হচ্ছে খাবার ওদের যেমন দেওয়া হচ্ছে তা দেওয়া হক, তবে একেবারে ফোঁকটে নয়।

ফোঁকটে নয়? তবে কি ওদের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া হবে নাকি? হাঙ্গরদের টাঁকশাল আছে বলে তো কখনও শুনিনি।

আরে, পয়সার কথা হচ্ছে না। ওদের খাটিয়ে নেওয়া হক তাই বলছি।

হাঙ্গরদের খাটাবে? কি করে শুনি?

কেন, এই যে বড় বড় মাছগুলো আমরা ধরি, ওগুলো কাটতে তো আমাদের জিভ বেরিয়ে যায়, ওদের দিয়ে কাটিয়ে নেওয়া হক না সেগুলো ? ঐ বড় বনিটো কি ডলফিনটার লেজ ধরে জলের ধারে ঝুলিয়ে রাখলেই তো কাজ হাঁসিল। হাঙ্গর বাবাজী আসবেন, তারপর তাঁর করাত-পাটি দাঁত দিয়ে দেবেন সেই মাছটার ঘাড়ে কুটুস কামড়, ব্যস্, এক কামড়ে তার পেটেও মুণ্ডুটা গেল আর আমরা ধড়টার সদ্গতি করলাম। এই আর কি ?

বাঃ। বেড়ে বুদ্ধি বার করেছ তো হে। বাঃ। বাঃ। আচ্ছা, এখনই দেখা যাক না একটা পরীক্ষা করে ?

ওঁরা সের ছত্রিশের একটা বনিটো মাছ ধরাধরি করে জলের ধারে নিয়ে গেলেন। হিসেব মত (অর্থাৎ যতখানি কাটতে হবে) মাছের মাথার দিকটা জলে ঝুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে একটা লম্বা ধুসর ছায়া জেগে উঠল। ছুটে এল তীব্র গতিতে সেই মাছটার দিকে। তারপর এক সেকেণ্ডও না, কট্ করে মাথাটা কেটে নিয়ে বেরিয়ে গেল। হাল্কা ধড়টা নিয়ে ওঁরা খুব খুশী। যাক বাবা বৃথা পরিশ্রমের হাত থেকে বাঁচা গেল। এঃ ওদের আপশোষ হল, হাতের কাছে মাছ কাটার এমন একটা জলজ্যান্ত মেশিন থাকতে ওঁরা কিনা এতদিন হাতে ফোস্কা পড়িয়ে ফেলেছেন।

কিছুদিন পরে হাঙ্গরের সঙ্গে ওঁরা আরেক খেলা জুড়লেন। হাঙ্গরদের সঙ্গে তখন ওঁদের পরিচয় আরেকটু নিবিড় হয়েছে। হাঙ্গরদের মতিগতির হদিস আরও কিছু পেয়েছেন তাঁরা।

ওঁরা জলের কিনারে বসে এক টুকরো মাছ হাতে করে ধরে থাকেন। মাছের গন্ধে হাঙ্গর ছুটে আসে হা করে গিলতে আর ওঁরা মাছের টুকরোটাকে টুক করে উঠিয়ে ফেলেন। হাঙ্গর তীব্রবেগে যার জন্যে ছুটে এসেছে তাকে হঠাৎ অন্তর্হিত হতে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। রেগে যায়। কখনও কখনও এমন বেগে ছুটে আসে যে, তাল সামলাতে না পেরে ভেলার গায়ে গুঁতো খায়। এ

খেলাতেও বেশ উত্তেজনা আসে। তারপর সাহস যখন আরও বাড়ে, এ উত্তেজনাও পানসে হয়ে আসে, ভোঁতা ভোঁতা লাগে, তখন আরও একটু দুঃসাহসিক এক খেলার কথা মনে পড়ে। ওঁরা নিজের পা-টাই জলে ডুবিয়ে হাঙ্গরকে আহ্বান করেন।

কিন্তু এ-ও একদিন পুরনো হয়ে যায়। একঘেয়ে লাগে। তখন একদিন একজন সত্যিই এক সাংঘাতিক কাজ করে বসেন।

সেদিনও একজন একটা হাঙ্গরের মুখে মাছ ধরে বারে বারে সরিয়ে নিচ্ছিলেন। হাঙ্গরটা বিরক্ত হচ্ছিল! ভেলার গা ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঐ টুকরোটার লোভে। তাই দেখে কি মনে হল আরেক জনের, তাঁর নাগালের মধ্যে হাঙ্গরের লেজটা আসতেই দু হাতে তা চেপে ধরে ঝটিতি দিলেন এক হ্যাঁচকা টান। এক টানে সেই ছয় ফুট লম্বা হাঙ্গরটার প্রায় অর্ধেক শরীর ভেলার উপর উঠে এল। কি যে হল ব্যাপারটা, তা প্রথম দু-এক সেকেণ্ড বুঝতেই পারেনি হাঙ্গরটা। ওদের চোদ্দপুরুষের জন্মে এই ধরনের ইয়াকি ওদের সঙ্গে কেউ করেনি। তারপর ব্যাপারটা যখন বুঝল, তখন প্রবল শক্তিতে জলে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথা। হাঙ্গরের যা কিছু ক্ষমতা তার সবটাই তার লেজে। সেই লেজ এখন পর হস্তগত। যত ধস্তাধস্তিই করুক তার পূর্ণ শক্তি সে কিছুতেই প্রয়োগ করতে পারল না। নিচুর দিকে মাথা থাকায় থলথলে ভুঁড়িটা মাথার দিকে ঝুলে গেল। তার হৃৎপিণ্ডে তার ফুসফুসে পড়ল প্রবল চাপ। হাঙ্গরটা তখন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। এখন আর আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় কি? হাঙ্গরটাকে আরও কয়েক টানে ভেলার উপর তুলে ফেলা হল। ভেলার উপর উঠে অন্ধ উন্মত্ত এক আক্রোশে সে ছুটাছুটি করল। যা সামনে পেল চিবিয়ে তছনচ করে দিল। সামাল সামাল রব উঠল ওঁদের মধ্যে। আর প্রবল উত্তেজনায় টিয়াপাখিটা ক্যাঁচম্যাচ করে ডানা ঝাপটিয়ে দাপাদাপি করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত হাঙ্গরটি মরল। তার কিছুটা ওরা সদ্গতি করলেন। আর বাকিটা অন্য হাঙ্গরদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হল। কী মহা উল্লাসে হাঙ্গরের পাল জ্ঞাতির মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেল। হাঙ্গররা হাঙ্গরের মাংস ছিঁড়তে যত ভালবাসে এমন আর দুনিয়ার কোন প্রাণী নয়।

নয়? তবে কি আরও কেউ আছে? কে আছে আর? আর কে নিজেদের ছিঁড়ে খাবার জন্য এমন উন্মত্ত হয়ে ওঠে?

কেন, মানুষ। ওঁদের মনে পড়ল। হ্যাঁ, মানুষ।

সেদিন সেই মহাব্যাপ্তির মধ্যে ভাসতে ভাসতে এই কটা প্রাণীর নজর পড়ল ইওরোপের দিকে, আমেরিকার দিকে। আত্মঘাতী যন্ত্র-সভ্যতার মারণের বিকট চেহারার দিকে।

কিন্তু এখানে, আঃ, এই ভেলাটায়, এই ছোট্ট রবারের ডিঙিটায়, কত শান্তি!

২২

বেশ চলছিল কন-টিকি। ঢেউয়ের দোলায় দুলে দুলে উঠছিল তার দেহ। বাণিজ্য-বায়ুর প্রশ্রয় পেয়ে ফুলে ফুলে উঠছিল তার পাল। আকাশ পরিষ্কার। স্মিত আর প্রসন্ন। সারা মুখে সাদা মেঘের হাসিটুকু যেন ছড়িয়ে রয়েছে।

শুধু যা এরিক একটু কাতর হয়েছেন বাতের পীড়ায়। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের এই স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় তাঁর বাতের ব্যথা চাগাড় দিয়েছে। কদিন খুব কষ্ট পেলেন। এ ছাড়া আর সবাই ভাল। সবই ভাল।

ভালই চলছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন দমকা ঝড়ে গুঁতো মারল 'কন্‌টিকি'কে। একেবারে অতর্কিতে। ওঁরা কেউ তৈরী ছিলেন না এর জন্য। ঝড়ের বিদ্রোহে যোগ দিল বিশ্বাসঘাতক ঢেউ। রুষে ফুঁসে ঢুস ঢুস

গুটিয়ে দিলে ভেলাটাকে। বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি এই আক্রমণ। সমুদ্র আবার শান্ত হল। ঢেউ বশ মানল। ঝড় লাফাতে লাফাতে ঢেউগুলোকে খ্যাপাতে খ্যাপাতে দৌড় দিল অন্যধারে। 'কন্‌টিকি'র বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি তাতে।

ক্ষতি হল তার আরোহীদের। ওদের এতদিনের বন্ধু টিয়া-পাখিটা ঝড়ের ধাক্কায় ছিটকে জলে গিয়ে পড়ল আর উঠল না। সেই মহাসমুদ্রের কোন অতলে তলিয়ে গেল কে জানে।

এই প্রথম দুর্ঘটনা ঘটল 'কন্‌টিকি'তে। আর এই দুর্ঘটনা আরেকটা বিপদকেও ডেকে আনল।

এবার বিপদ ঘটল হারমানের। হেয়ারডালের ডায়েরিতে লেখা আছে সে কথা।

"২১শে জুলাই হাওয়া হঠাৎ পড়ে গেল। একেবারে নিথর। অসহ্য গুমোট। খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি, এবার কী ঘটবে। যা ভেবেছি তাই। বাতাস উঠল অকস্মাৎ। গোটাকতক দমকা ধাক্কা মারল গোঁয়ারের মত। ছুটে এল হা হা করে। ছুটে এল চোখ মুখ কালো করে। এল পূব থেকে, পশ্চিম থেকে, দক্ষিণ থেকে। বিপর্যস্ত ধাক্কায় এলোমেলো করে দিল 'কন্‌টিকি'র গতি। হারমান তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল বাতাসের গতি মাপবার যন্ত্রটা নিয়ে।

"সারাটা পথ এই করেছে হারমান। নিখুঁতভাবে আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করেছে। আর রোজ রাত্রে টর্স্টিন আর কুনুট তা পাঠিয়েছে ওদের বেতার যন্ত্র মারফৎ আমেরিকার বিখ্যাত এক হাওয়া আফিসে। বাতাসের জোর বেশ ছিল তখন। গতি সেকেণ্ডে প্রায় পঞ্চাশ ফুট। টর্স্টিনের ঘুমবার ব্যাগটা হঠাৎ এই জোর বাতাসের দমকে উড়ে গেল।

"দেখলাম, হারমান ব্যাগটা ধরবার চেষ্টা করল। লাফ দিয়ে ব্যাগটা ধরতে হাত বাড়াল। কিন্তু টাল রাখতে পারল না। উল্টে

পড়ে গেল জলে। এক পেট জোরাল বাতাস পালে লেগে কনটিকি তখন পুরোদমে ছুটছে।"

হারমান জলে পড়েই দেখলেন কনটিকি সাঁ সাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে। হারমান ভাল সাঁতারু। প্রাণপণে সাঁতরে গিয়ে কনটিকির একটা কাঠের গুঁড়ি চেপে ধরলেন। কিন্তু জলে ভিজে তা পিছল হয়ে গেছে, শ্যাওলা জমে গেছে। ফস্কে গেল হাত। হারমান আবার চেষ্টা করলেন কনটিকিকে ধরতে। কিন্তু এরই মধ্যে অনেকখানি সরে গেছে ভেলাটা। ঐ যাচ্ছে। হারমানের চোখের উপর দিয়ে মহাবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে কনটিকি। ভয়ে হারমানের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। সর্বশক্তি নিয়োগ করে হারমান ভেলাটার নাগাল ধরতে চাইলেন। কিন্তু বৃথা। ক্রমেই দুজনের ব্যবধান বাড়তে লাগল।

আর তা বাড়তেই লাগল। হারমানের পাশ ঘেঁষে কনটিকির মোটা মোটা কাঠের গুঁড়িগুলো ভেসে চলে গেল। হারমান জানেন, এই যে বেরিয়ে যাচ্ছে ভেলাটা, যতটুকু সরে যাচ্ছে ততটুকুই যাচ্ছে জন্মের মত। হয়ত হারমানের জীবনে তা আর ফিরে আসবে না। কি আশ্চর্য, একটু আগেও, এই কয়েক সেকেণ্ড আগেও, তো তিনি তাঁদের ছজনেরই একজন ছিলেন। আর এখন, ওঁর আর পাঁচজন সঙ্গীরা কোথায় আর তিনি কোথায়? ঐতো ওঁরা, এক নিশ্চিত আশ্রয়ে থেকে কেমন তর্‌তর্‌ করে ভেসে চলেছে। বিদায় বন্ধু, হারমান হতাশ হয়ে মনে মনে বললেন, তোমাদের যাত্রা সফল হোক।

হঠাৎ হারমানের হাতে কী ঠেকল। হাল। হাল। কনটিকির হালখানা। হারমান প্রাণপণে চেপে ধরলেন সেটা। দুহাত দিয়ে জাপটে ধরলেন ঐ শেষ অবলম্বনটুকু।

এ ছাড়লে চলবে না,, কিছুতেই না। যেন চেঁচিয়ে নিজের কানেই ঢোকাতে চান কথাটা। কী হবে, ভেবে দেখ, যদি ফস্কে

যায় তোমার হাত। ভেলা চলে যাবে, পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ যাবে তোমার, নিশ্চিত মৃত্যু থাবা গেড়ে বসে থাকবে তোমার সম্মুখে। ধর, হাল ধরে থাক।

কিন্তু হালটাও ফসকে গেল। হারমান সমস্ত শক্তি দিয়ে, মাংস-পেশীর প্রবল চাপ দিয়ে হালটা চেপে ধরেছিলেন। কিন্তু জলে ভিজে ভিজে খুবই পিছল হয়েছে তা। সে ফস্কে গেল। হালের গায়ে শ্যাওলা জমেছে। তাই ফস্কে গেল। হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল বাঁচবার শেষ সম্ভাবনাটুকু। কনটিকির ঐ চলার বেগ, তার তীব্র গতি, রোধ করার সাধ্য কারোই নেই।

হারমান দেখলেন, এক বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে তিনি পড়ে আছেন। একা, একা, একেবারে একা। কি উপায় হবে এখন?

টর্স্টিন হারমানের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। হারমান পড়ে যেতেই বিপদের গুরুত্বটা বুঝলেন। কিন্তু বুদ্ধি হারালেন না। কনটিকি চলেছে আপন খেয়ালে, বাতাসের বেগ আর স্রোতের টানে, প্রবল গতিতে। এ গতি রোধ করা তাঁদের অসাধ্য। টর্স্টিন, শুধু টর্স্টিন কেন—সবাই বুঝতে পারলেন, নাগালের মধ্যে থাকতে থাকতে যদি হারমানকে ভেলার উপর তোলা না যায় তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারো সাধ্য নেই তাঁকে বাঁচায়।

কতক্ষণ ভাসবেন হারমান? যতক্ষণ তাঁর দম। কিন্তু সেই বা কতটুকু? আর ততক্ষণই বা তাঁকে ভাসতে দিচ্ছে কে? মাংসলোলুপ হাঙরের পাল আছে না? এখনই হারমানের গন্ধ পাবে তারা। ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসবে। টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে তাঁকে।

সর্বনাশ! ঐ যে দূরে জলের উপর ভেসে উঠল হিংস্র হাঙরের সর্বনাশা পাখনা।

টর্স্টিন আর কালবিলম্ব না করে লম্বা দড়ির মাথায় লোহা বেঁধে ছুঁড়ে দিলেন। হেঁকে বললেন, হারমান, হুঁ-শি-য়া-র।

বেল্ট্ আর হেয়ারডাল ডিঙি ভাসালেন জলে। কৃমুট লাইফ-বেল্ট ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। কিন্তু বাতাসের জোর ছিল সেদিন। যতবার লাইফ-বেল্ট ছোঁড়া যায় হারমানের দিকে ততবারই তা বাতাসের বেগে ভেলার কাছে ভেসে আসে। হঠাৎ দেখা গেল কৃমুট লাইফ-বেল্ট নিয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েছেন। তীব্রবেগে তিনি এগিয়ে গেলেন হারমানের দিকে। লাইফ-বেল্টটা বেঁধে দিলেন তাঁর গায়ে। ভেলার উপর যে চারজন ছিলেন তাঁরা প্রাণপণে টান লাগালেন লাইফ-বেল্টের দড়িতে। কৃমুট আর হারমানের পিছনে তীরের বেগে ছুটে আসছে এক হাঙর। তার ধূসর পিঠ, হিংস্র মুখ, কাছে এসে পড়েছে। লেজের ঘায়ে ছিটকে দিচ্ছে জল।

কিন্তু তার আগেই ওঁরা এক হ্যাঁচকা টানে ভেলার উপর দুজনকে তুলে ফেলেছেন। গুরুতর পরিশ্রমে দুজনের বুক হাপরের মত ওঠা-নামা করছে। ওঁরা দেখলেন, হাঙরটা তাব বেগ সামলাতে পারল না। হারমানদের যেখান থেকে ভেলার উপর তোলা হল, ঠিক সেইখানে এসেই ঢুস করে ধাক্কা খেল ভেলার গায়ে। চক্ষের নিমিষে। শিকার ফসকে গেছে তাই নিষ্ফল আক্রোশে জলের উপর মারল এক ল্যাজের থাপড়।

২৩

'কনটিকি' অবশেষে ঝড়ের পাল্লায় পড়ল। ঝড়ের পর ঝড় এসে নাস্তানাবুদ করতে লাগল বেচারীকে। নিঃশব্দে একটার পর একটা ঝড়ের মহড়া নিল 'কনটিকি'। অদ্ভুত তার সহ্যশক্তি। কালো মেঘের ঘন ভুরুর রূঢ় ভ্রুকুটি তাকে তেড়ে এসেছে, হিংস্র বিদ্যুৎ লক্‌লক্ জিভ বের করে তাকে ছোবল মেরেছে, কড়াকড় ধমক মেরেছে বদরাগী মেঘ, কিন্তু বালসা কাঠের ভেলা তাদের থোড়াই কেয়ার করেছে। বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি 'কনটিকি'। পরোয়া

করেনি কাউকে। আপন উদ্যমে এগিয়ে গিয়েছে তার লক্ষ্য-পথে। হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে।

কিন্তু তার শক্তিরও তো সীমা আছে। 'কনটিকি' যে তার ক্ষমতার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে, একথা আরোহীরা বুঝতে পেরেছেন। ঢেউয়ের ধাক্কায় দড়ির বাঁধন ঢিল হয়ে পড়েছে। ভেলার কাঠ আর আগের মত আঁটসাঁট নেই। হালের কাঠও চিড় খেয়েছে। পাল হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। তবুও, 'কনটিকি' যেন এক বৃদ্ধ যোদ্ধা, সমগ্র শরীরে তার অতীত যুদ্ধের অনেক দাগ, তা সত্ত্বেও নতুন শত্রুর সঙ্গে সমান পরাক্রমে লড়াই করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

আলগা গুঁড়িগুলো এমন পিছল হয়ে উঠেছে ঢেউ আর বৃষ্টির কল্যাণে যে, তার উপর দিয়ে হাঁটতে গেলেই সে পিছলে পা হড়কে সবাই চিতপটাং হচ্ছেন। তাই ওঁরা হাঁটাই ছেড়ে দিয়েছেন ভেলার উপর। হামাগুড়ি দিয়ে এধার ওধার করছেন।

ভেলার তলায় এখন ঢেউয়ের গুঁতো লাগে আর গুঁড়িগুলো পুরনো হারমোনিয়ামের চাবির মত নড়বড় করে ওঠা-নামা করে। আড়াআড়িভাবে এক তক্তা বিছিয়ে তাঁদের এখন হাল ধরতে হয়।

এরিক এখন রাতদিন মাস্তুলে বসে থাকেন চোখে দূরবিন লাগিয়ে। তাঁরা এগিয়ে এসেছেন, অনেক এগিয়ে এসেছেন পলিনেশিয়ার দিকে।

হিসেবমত তাঁরা এখন মার্কইসাস আর টুয়ামটু এই দুটো দ্বীপপুঞ্জ থেকেই সমান দূরে। কে জানে বাতাসের কি মর্জি। হয়ত সে টুয়ামটু দ্বীপপুঞ্জেই নিয়ে ফেলবে, কিম্বা নেবে হয়ত মার্কুইসাসে ঠেলে। আবার এমনও করতে পারে যে, দুটো দ্বীপপুঞ্জের মাঝখান দিয়ে ভাসিয়ে আর কোথাও নিয়ে ফেলবে।

বাতাস বড় অস্থির হয়ে উঠেছে। কখনও ঝড় বইছে জোরে,

কখনও বাতাস বইছে এলোমেলো। তাই 'কনটিকি' কখনও জোরে ছুটছে আবার কখনও থমকে থমকে এগুচ্ছে।

কিন্তু কোথায় পলিনেশিয়া?

হেয়ারডাল ভাবতে লাগলেন, আর কতদিন লাগবে তাঁদের? যতদিনই লাগুক, তারা ঠিক পৌঁছবেন। নিশ্চয়ই পৌঁছবেন। ঐ তো এক দিগন্ত দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের দৃষ্টি আড়াল করে। ওটা পেরলেই তাঁরা পাবেন আরেকটা ঠিক অমনি দিগন্ত। সেটা পার হলে আবার আরও একটা। এমনি করে দিনের পর দিন তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন দিগন্তের পর দিগন্ত। আরও কয়েকটা দিগন্ত তাঁদের পার হতে হবে, তবে পৌঁছবেন পলিনেশিয়ায়।

কোথায় তাঁরা নামবেন? মার্কুইসাসে? হেয়ারডাল হিসেব করে দেখলেন, ফাটুহিভা দ্বীপটিই সব থেকে কাছে পড়ে।

সেই ফাটুহিভা, কয়েক বছর আগে হেয়ারডাল গিয়েছিলেন যেখানে। স্বপ্নের মত মনে পড়ে সব। এক বৃদ্ধ তাঁকে টিকির কথা শুনিয়েছিল। হেয়ারডাল ভাবলেন ভেলাটা যদি ফাটুহিভাতে গিয়ে ভেড়ে তবে বেশ হয়। খুব ভাল হয়। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে তাহলে দেখা হতে পারে। কিন্তু সেই বুড়ো, তাকে কি আর দেখতে পাবেন? সে কি আর বেঁচে আছে এতদিন?

ওরা জুলাই এরিক জানালেন, তিনি ফ্রিগেট পাখি দেখেছেন একটা। ফ্রিগেট পাখি! কই? কোথায়? সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ফ্রিগেট পাখি ডাঙায় থাকে। অবশ্য এরা উড়তে পারে বহুদূর। শত শত মাইল একটানা উড়ে যায়। কিন্তু তবুও তো সে ডাঙারই পাখি। ডাঙার বার্তা বহন করে এনেছে। দেখি, দেখি তাকে একবারটি দেখে নিই। পেরু ছাড়বার পর তাঁরা ফ্রিগেটের ঝাঁককে ছেড়ে এসেছেন ১০০° পশ্চিমে। আবার এই প্রথম ওরা ফ্রিগেটের দর্শন পেলেন এবার ১২৫° পশ্চিমে। আঃ। ফ্রিগেট দেখেছেন যখন, তখন ডাঙাও দেখবেন। আজ না হয় কাল, নয়তো পরশু।

১৭ই জুলাই দেখা মিলল বড় বড় দুটো বুবি পাখির। বুবিরা ফ্রিগেটদের মত অমন বেশী দূর উড়তে পারে না। তার মানে ডাঙা যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

বুবি দুটো ভেলার কাছে এগিয়ে এল। কর্কশ চিৎকার করে ঘুরতে লাগল তার পাশে। বার বার পাক খেতে লাগল। তারপর থপ থপ করে ভেলার গা ঘেঁষে জলে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক ডলফিন ছুটে এল। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ কাউকে আক্রমণ করল না। অবাক বিস্ময়ে এরা ওদের দিকে চেয়ে রইল।

এবার যে সব উড়ন্ত মাছ এসে ওঁদের ভেলায় পড়তে লাগল, এগুলো আগের মত নয়। এরা আকারে আরও বড়। এরা অন্য জাতের। হেয়ারডালের মনে পড়ল, এই ধরনের মাছ তিনি ফাটুহিভাতে দেখেছেন। তাহলে তাঁরা ফাটুহিভার দিকেই যাচ্ছেন? হ্যাঁ তাই।

তারপর থেকে তাঁরা তিন দিন তিন রাত ধরে সোজা ফাটুহিভার দিকে যেতে লাগলেন। কিন্তু তারপরই কোত্থেকে হঠাৎ এসে উপস্থিত হল এক জোরাল বাতাস। 'কনটিকি'র গতি ঘুরিয়ে দিল টুয়ামটু দ্বীপপুঞ্জের দিকে। এবার তাঁরা দক্ষিণ বিষুবীয় স্রোতোধারার মধ্যে পড়ে গেলেন। এই স্রোত তাঁদের সঙ্গে খুনসুটি শুরু করলে।

তারপর একদিন ঝপ করে বাতাসও পড়ে গেল। ভেলার গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল। কী মুশকিল! বাণিজ্য বায়ু শেষ পর্যন্ত তাঁদের এভাবে ডোবাবে, একথা তাঁরা ভাবতেই পারেননি। কাক চক্ষুর মত পরিষ্কার নিস্তরঙ্গ জলে তাঁরা নট নড়ন নট চড়ন হয়ে রইলেন। যদি কখনও সামান্য বাতাসও ওঠে অমনি এঁরা তাড়াতাড়ি করে তাদের কাপড়, গামছা তোয়ালে যা পান, তাই মেলে ধরেন। যদি বাতাস লাগে তাতে, যদি তাতে ভেলা এক পা নড়ে।

কিন্তু বাণিজ্যবায়ু ওঁদের ডোবাল না। যেমন একদিন নিঃশব্দে সরে পড়েছিল, তেমনি নিঃশব্দেই একদিন ফিরে এল। আবার চলল 'কনটিকি'।

একদিন দেখা গেল পাখিরা দ্রুত উড়ে চলেছে পশ্চিম দিকে। যেদিক থেকেই পাখির ঝাঁক আসছে, সবাই ঐ একই লক্ষ্যে উড়ে চলেছে। হয়ত এরা উঁচু থেকে সেইদিকে কিছু দেখে থাকবে। কি দেখেছে ওরা? ডাঙা?

পাখিরা যেদিকে উড়ে চলেছে ওঁরাও ওঁদের ভেলার মুখ সেইদিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

পরদিন থেকে পাখির ঝাঁক বেড়েই চলল। সবাই ঐ একই দিক লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ বহুদূরে আকাশের গায়ে ওঁরা এক অদ্ভুত ঘন কালো মেঘের জটলা দেখতে পেলেন।

এরিক মাস্তুল থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

কামালানিম্বাস। কামালানিম্বাস। দেখ, দেখ, ঐ যে।

ওরা সবাই এসে দেখতে লাগলেন সেই মেঘ। এগুলো সাদাটে মেঘ নয়। এ মেঘ ওড়ে না। এ মেঘ ঘন কালো। ধুঁয়োর মত। এর গতি নেই। দূর থেকে ওঁরা দেখলেন, স্থানু এক ধুঁয়োর কুণ্ডলীর মত আকাশের গায়ে, এই মেঘপুঞ্জ জেগে রয়েছে। এরই ল্যাটিন নাম 'কামালানিম্বাস।' কিন্তু পলিনেশিয়ররা এই ল্যাটিন নাম জানে না।

তবে তারা একথা জানে, যেখানে এই ধরনের মেঘ জমে থাকে তার নিচেতেই থাকে ডাঙা।

২৪

ঊনতিরিশে জুলাই-এর রাত থেকেই পাখির চিৎকার বাড়ছিল। সরু, মোটা, মাঝারি গলার নানারকম কর্কশ চিৎকার, সেই রাত্রি

আর সেই মহাসমুদ্রের মিলিত মৌনকে যেন চিরে ফালা-ফালা করে দিচ্ছিল।

ভোর ছটায় বেঙ্গ্‌টের ডিউটি শেষ হল। তখনও অন্ধকার কাটেনি। তিনি মাস্তুল থেকে এক বোঝা ক্লান্তি আর ঘুমে ভারী চোখ দুটো বয়ে নীচে নেমে এলেন। হারমানকে ঠেলে তুলে দিলেন। এখন থেকে দু'ঘণ্টা মাস্তুলে বসবার পালা তাঁর।

হারমান চোখ থেকে ঘুম মুছে মাস্তুলের উপরে গিয়ে উঠলেন। আর বেঙ্গ্‌ট গিয়ে ঢুকলেন তাঁর 'ঘুমের থলির' ভিতর।

দশ মিনিটও কাটল না, হারমান তরতর করে নীচে নেমে এলেন। হেয়ারডালের পা ধরে দুই টান দিয়ে একটু উত্তেজিতভাবে বললেন, 'থর, থর, ডাঙা! বেরিয়ে এস। তোমার ডাঙা দেখবে এস।'

ডাঙা!

ঘুম ছুটে গেল হেয়ারডালের। এক লাফে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ডাঙা!

বেঙ্গ্‌ট চমকে উঠলেন। তাঁর তখন সবে ঘুম আসছে। লাফ দিয়ে তিনিও উঠলেন। বাইরে বেরুলেন।

তারপর তিনজনে মাস্তুল বেয়ে উপরে উঠলেন।

তাঁদের মাথার উপর অজস্র পাখি চিৎকার করছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে, উড়ছে চক্রাকারে। তখনও ধোঁয়া-ধোঁয়া অন্ধকার। রাত্রি যেন বাড়ি ফেরার আগে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরেছে সমুদ্রকে। এইবার সুদীর্ঘ এক চুম্বন, বিদায়-চুম্বন দেবে, আর তারপর দিনের আলো ফুটি ফুটি হবার আগেই গোপন অভিসার সাঙ্গ করে নিঃশব্দে দিগন্তের খিল খুলে সুট করে সরে পড়বে।

ওরা চেয়ে দেখলেন, ঐ দূরে, পুবে, দিগন্তের গায়ে এক জায়গায় একটা উজ্জ্বল সিঁদুরে আভা জেগে উঠল। ক্রমে সেটা

[illegible] টকটকে লাল, তারপর থরে থরে সেটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আকাশের সেই লাল পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল এক নীলাভ রেখা। একটা দ্বীপের সুস্পষ্ট আভাস।

ডাঙা! একটা দ্বীপ!

ওদের একজনের উত্তেজিত স্বর বাতাসে ভেসে উঠে প্রতিধ্বনি তুলল।

পলিনেশিয়া! এই সেই পলিনেশিয়া! হেয়ারডাল মনে মনে চিৎকার করতে লাগলেন। পলিনেশিয়া! পলিনেশিয়া! এই সেই স্বর্গভূমি!

তিন মাস ক্লান্তিকর সমুদ্রযাত্রার এই হল ফললাভ। তিন মাসের উপোসী তাঁদের চোখ যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগল ঐ একখণ্ড ডাঙার আভাসকে। ওঁরা চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন বাদবাকী সঙ্গীদের। ওঁদের "ডাঙা ডাঙা" চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল তাঁদের। তাঁরা ছুটে এলেন। ভাবলেন, 'কনটিকি' বুঝি কোনও দ্বীপে এসে ঠেকেছে।

তা নয়? শুধু দূরে একটা দ্বীপ দেখা গেছে? তার জন্যেই এত!

কেউ কেউ ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। বেঙ্গ্‌টও নেমে পড়লেন। ঘুমে তাঁর চোখের পাতা বুঁজে আসছে।

হেয়ারডাল আর হারমান চেয়ে রইলেন ঐ দ্বীপটার দিকে। বিষুবিয় সূর্য দেখতে দেখতে সোজা উঠে গেল আকাশে। প্রখর কিরণে দ্বীপটা চিকচিক করতে লাগল। কখনও কখনও সোনালী সোনালী হয়ে উঠতে লাগল। ওঁরা দেখলেন পাখির ঝাঁক নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে দ্বীপটার দিকে। আহা, ওটা যেন এক সেতু। এতদিন ডাঙায় নামার যে ইচ্ছেটা ঘুমিয়ে ছিল এই ডাঙার মানুষ কটার মনে, আজ

তা জেগে উঠল। আর ঐ পাখির ঝাঁকের [illegible] যেন ঐ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছল। ওঁদের ইচ্ছার মত ওঁদের দেহগুলোও যদি পৌঁছুতে পারত ওভাবে!

দ্বীপটা যেন সচল। যেন ভেসে ভেসে চলেছে ওদের সঙ্গে। তিনমাস পরে এই এখন, আজ তাঁদেরও মনে হল, তাঁরাও সচল। আশ্চর্য, এই তিনমাস, আকাশ-চাপা সাগরের দিগন্তহীন বুকে ভাসতে ভাসতে তাঁদের কখনও মনেই হয়নি যে, তাঁরা চলেছেন।

দ্বীপটা খুব নিচু। এত নিচু যে, একটা বড় ঢেউ উঠলেই সেটা তার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। সবুজ গাছগুলো তার উজ্জ্বল রূপালী তটভূমিতে যেন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে তাঁদের দিকে চেয়ে আছে।

এটা কোথায়? কোন দ্বীপ এটা? এরিক হিসেব করে বললেন, পুকাপুকা। টুয়ামটু দ্বীপপুঞ্জের প্রথম ফাঁড়ি।

কিন্তু তাঁরা পুকাপুকায় পৌঁছুতে পারলেন না। তার বহু দূর দিয়েই তাঁরা ভেসে চললেন পশ্চিমে। আরও পশ্চিমে। সকাল প্রায় ৮৷৷টার মধ্যেই পুকাপুকা যেন ডুবে গেল। তবুও বেলা ১১টা পর্যন্ত হারমান আর হেয়ারডাল মাস্তুলে চড়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে। তখনও পর্যন্ত একটা ঘন নীল লম্বাটে দাগ দেখা যাচ্ছিল। কিছু পরে তাও মুছে গেল। আবার সেই একটানা সমুদ্র স্রোতে ভেসে চলা। কূলহীন, কিনারাহীন পাথারে দিনরাত্রি যাপন করা।

ধীরে ধীরে তাঁরা নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন। যে সামুদ্রিক পাখিরা এতদিন তাঁদের সঙ্গ দিয়েছিল, তারা পুকাপুকাতেই উড়ে গেল। যে ডলফিনের ঝাঁক তাঁদের সঙ্গে ভেসে আসছিল, তারাও ফিরে গেল। এবার তাঁরা একা!

কেউ কোন কথা বললেন না। শুধু বেঙ্গ্‌ট একবার বললেন, একটা টেবিল চেয়ারে একটু বসতে পেলে মন্দ হত না। ডাঙার ঐ একটা আকর্ষণই তো আছে।

পরদিন দূর দিগন্তে ওঁরা আবার দুটো 'কামালানিম্বাস' দেখলেন। একটু দূরে দূরে। দুটো বড় বড় ধোঁয়ার স্তম্ভ। দূর থেকে মনে হতে লাগল, ওখানে যেন দুটো অতিকায় ইঞ্জিন রেখে দেওয়া হয়েছে। ও দুটো তাদেরই ধোঁয়া।

মানচিত্র দেখে বোঝা গেল ও দুটো ফাঙ্গাহিনা আর আঙ্গাটাউ দ্বীপের নিশানা। 'কনটিকি' এবার সিধে আঙ্গাটাউ-এর দিকে ছুটতে শুরু করল।

তিন দিন তিন রাত সমানে এগিয়ে গেল কনটিকি। চতুর্থ রাত্রে ভোর ছ'টায় টর্স্টিন যখন হারমানকে বদলি দিতে এলেন, তখন হারমান তাঁকে বললেন, মনে হল যেন চাঁদের আলোয় একটা ডাঙা দেখতে পেলাম। একটু নজর রেখ তো।

সূর্য উঠতে না উঠতেই টর্স্টিন দেখলেন ডাঙা। চেঁচিয়ে উঠলেন, ডাঙা।

চেঁচানি শুনে সবাই বাইরে এলেন। এসেই দেখলেন, সামনেই একটা দ্বীপ। আর কনটিকির গতিও সেই দ্বীপের দিকে।

ওঁরা যত পতাকা এনেছিলেন সঙ্গে, সব উড়িয়ে দিলেন। 'কনটিকি' যেন দ্বীপে পৌঁছবার আগে 'ড্রেস' করে নিল।

বেলা দশটা নাগাত দ্বীপটা এত কাছে এসে গেল যে, ওঁরা একটা গাছ থেকে আরেকটা গাছের পার্থক্য পর্যন্ত বুঝতে পারছিলেন।

আর নয়, এইবার ঠিক করা দরকার, কোনদিকে ওঁরা নামবেন। এইবার 'কনটিকি'কে খুব সাবধানে চালান দরকার। এসব জায়গা মোটে ভাল নয়। জলের নীচে মাথা ডুবিয়ে ছোটবড় অজস্র প্রবাল-প্রাচীর বসে আছে। ওদের গায়ে ধাক্কা লাগলে আর দেখতে হবে না। 'কনটিকি' টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

তাই এরিকের নির্দেশে সব পরিচালিত হতে লাগল। এরিক এক পাকা সারেঙের মত দড়ি ফেলে জল মাপতে লাগলেন, আর

হাল ঘোরাতে নির্দেশ দিতে লাগলেন। দুজন গিয়ে হাল ধরল। পালটাকে খানিক গুটিয়ে নেওয়া হল। সরল অবাধ সমুদ্রে বিচরণ করবার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলল 'কনটিকি'। এখন তাকে চলতে হবে অজস্র প্রবালখাঁড়ির কুটিল পথে এঁকেবেঁকে সাবধানে সাবধানে। দুজনে রবারের ডিঙিটা ভাসিয়ে 'কনটিকি'র আগে আগে পথের হদিশ নিতে নিতে চললেন।

প্রায় সারাদিন ধরেই ওঁরা ঘুরলেন আঙ্গাটাউয়ের চারপাশে। ভিতরে ঢুকবার এক পথ খুঁজলেন। এত কাছে এসে পড়েছেন দ্বীপটার যে, সব কিছু প্রায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। মায় ঘরবাড়ি পর্যন্ত। কিন্তু কেন জানিনে, সব কেমন নির্জন নির্জন লাগছে।

হঠাৎ ওঁরা চমকে উঠলেন। আরে, ওগুলো কী? ঐ শান্ত, স্তব্ধ, বাদামী মূর্তিগুলো? মানুষ?

হাঁ, ওরা আদিম বাসিন্দা। ঘাটে অজস্র নৌকো বাঁধা রয়েছে। অনেক পলিনেশিয় ডিঙি।

ওদের দেখে একদল দৌড় দিল। কিন্তু দুজন, একখানা ডিঙি বেয়ে ওঁদের কাছে এল।

ওঁরা অভ্যর্থনা করলেন ওদের। হেয়ারডাল মনে মনে ভাবলেন, এবার ফ্যাসাদ বাধবে কথা বলা নিয়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ওদের একজন সুন্দর ইংরেজীতে ওঁদের অভিবাদন জানাল।

গুড্ নাইট।

ওঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

গুড্ নাইট। একটু বিস্মিত হয়ে হেয়ারডাল বললেন, তুমি ইংরেজী বলতে পার?

অমায়িক হেসে লোকটি জবাব দিলে, গুড্ নাইট। মাথাটা একটু নুইয়ে আবার বললে, গুড্ নাইট।

ওঁরা বুঝে গেলেন, ইংরেজী ডিকশনারীর এই একটি শব্দই

মাত্র জানে বেচারা। আর তাই দিয়েই তার দিগ্বিজয় করার ইচ্ছে।

আঙ্গাটাউ? এটা কি আঙ্গাটাউ? ইশারায়, আভাসে, অভিনয়ে ওঁরা প্রাণপণে কথাটা তাকে ('গুড্ নাইট'কে) বোঝাতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে মনে হল, তাঁদের এত চেষ্টা যেন সফল হয়েছে। লোকটা তাঁদের কথা যেন বুঝতে পেরেছে।

ই, আঙ্গাটাউ। লোকটা মাথা নুইয়ে সমর্থন করল।

এরিক খুব খুশী। তাঁর গণনা অভ্রান্ত হয়েছে।

হেয়ারডাল এবার এগিয়ে এলেন। পলিনেশিয় ভাষায় এঁদের মধ্যে তিনিই পণ্ডিত। কিন্তু তিনি তাঁর সব জ্ঞান উজাড় করেও ওদের কিছু বোঝাতে পারলেন না।

তিনি যত বলেন, মাই মাই হী আইয়ুটা নু (তোমাদের গ্রামে যাব), ওরা জবাব দেয় না, হাত নেড়ে কি ইশারা করে, সবার মাথা খাটিয়েও তার একবর্ণ অর্থ তাঁরা বের করতে পারলেন না।

ঠিক সেই সময় একটা দমকা হাওয়া এল দ্বীপের ভিতর থেকে। এক জলভরা ছোট মেঘ ছড়িয়ে পড়ল লেগুনের উপর। বাতাস এসে 'কনটিকি'কে ধাক্কা মেরে দ্বীপটা থেকে সরিয়ে দিল। ওঁরা দেখলেন 'কনটিকি' আর হালের নির্দেশ মেনে দ্বীপের কাছে এগুবার চেষ্টা করছে না। বরং তার গতি বিপরীত।

সর্বনাশ! তবে কি পুকাপুকার মত আঙ্গাটাউও ফসকে যাবে? ব্যাপারটা কি? একটার পর একটা দ্বীপ আসছে, মন ভুলাচ্ছে, কিন্তু ধরা দিচ্ছে না। তাঁরা কি তবে কোনও মায়াবী ধাঁধায় পড়লেন? ওঁরা সরে যাচ্ছেন দেখে তাড়াতাড়ি নোঙর ফেললেন। কিন্তু জল সেখানে বেশ গভীর। নোঙর মাটির নাগাল পেল না। এখন দাঁড় টানা ছাড়া আর পথ নেই। তবে তাই টান, যাও জলদি কর। 'কনটিকি' যে ক্রমেই বেরিয়ে চলল।

'গুড্ নাইট' আর তাঁর সঙ্গী ভেলার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ড দেখছিল, আর সিগারেট ফুঁকছিল।

হেয়ারডাল ভাবলেন, একটা দাঁড় ওদেরও দিই, টানুক, সাহায্য করুক আমাদের। কিন্তু ওরা তার ধার দিয়েও গেল না। আবার দাঁড় টানা কেন? ওরা দুজন অবাক হয়ে গেল, একটু বা হতবুদ্ধিও। মোটর কই এদের, মোটর? ওঁদের পরামর্শ দিল, 'ব-র্-র্-র্'।

মোটর চালাও। লোক দুটো ইশারা করল। ব-র্-র্-র্। ওঁরা প্রথমে বুঝতে পারেননি। তারপরেই ইঙ্গিতটা ধরে ফেললেন, জানালেন, 'কনটিকি' মোটরে চলে না চলে পালে।

ওরা চারজন দাঁড় টানতে বসলেন। লোক দুটোও হয়ত বসত, এমন সময় সুর্য ডুবে গেল। অন্ধকার যেন লাফিয়ে নেমে পড়ল। লোক দুটোও ভয় পেয়ে ওদের ডিঙিতে গিয়ে চড়ল, তারপর অন্ধকারের মধ্যে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওঁরা প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগলেন।

কিন্তু তবুও হেয়ারডাল দেখলেন, দ্বীপটা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। ক্রমেই। আর, হাতের নাগালের মধ্যে এসেও ফসকে গেল ডাঙা! এত কাছ থেকে ফসকে যাবে!

অন্ধকারটা বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে এমন সময় চার ডিঙি লোক দ্বীপ থেকে এল 'কনটিকি'র উপর। হ্যাণ্ডশেক করল আর ওদের কাছ থেকে অজস্র সিগারেট নিয়ে ফুঁকল।

লোকগুলো আকারে ইঙ্গিতে জানাল, আমরা যখন এসে পড়েছি তখন আর ভয় নেই। তোমাদের আর ভেসে যেতে দিচ্ছিনে।

ওরা তাড়াতাড়ি করে 'কনটিকি'র সঙ্গে ওদের ভেলাগুলো বাঁধল। তারপর দ্বীপটার কাছে কনটিকিকে নিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু পুবে-বাতাস গোঁয়ারের মত ছুটতে লেগেছে। প্রবাল-প্রাচীরে আছড়ে পড়া ঢেউ রাগে রোষে গর্জন করছে। ঢেউ যখন সরে যাচ্ছে তখন বেরিয়ে পড়ছে প্রবাল-প্রাচীরের মাথা। চাঁদের আলো লেগে মাঝে মাঝে তা চকচক করে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন অতিকায় এক হিংস্র হাঙর হাঁ করে মুখে পুরতে যাচ্ছে ভেলাটাকে। আর ভেলা প্রতিবারই তার গ্রাস ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই রাগে সে গর্জন করে উঠছে।

সাতানব্বই দিন একটানা সমুদ্র-ভ্রমণ করেছেন তাঁরা। আর এই অনিশ্চিত দোলানি ভাল লাগছে না। এখন একটু শক্ত মাটির আশ্রয় চাই। কিন্তু সেই আশ্রয়ও তো ঐ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দ্বীপের লোকগুলো প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। পারেনি। পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে গেছে দ্বীপে। শুধু পড়ে আছে সীমানাহীন আকাশ। কিনারাহীন সমুদ্র। আর তাঁরা। 'কনটিকি'র যাত্রী কজন। আর গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। আর, গর্জন। প্রবাল-প্রাচীরে মাথা ঠুকে ঠুকে আহত ঢেউগুলো অবিশ্রান্ত যে গর্জন করছে, শুধু তাই।

২৫

জল আর জল আর জল। চারিদিকে শুধু অগাধ জল। আর ঢেউ। অগুনতি, অজস্র ঢেউ। আর শুধু চেয়ে থাকা। এক আশা মনে পুষে রাখা। একদিন এরও শেষ হবে। সীমা দেখা যাবে, পাওয়া যাবে ডাঙা। যে গন্তব্য লক্ষ্য করে এই সমুদ্রে ভেসে পড়া, একদিন সেই লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছবেন। নিশ্চয়ই পৌঁছবেন।

কিন্তু কবে? কেমন করে? একটির পর একটি দ্বীপ যদিও বা এল, কিন্তু কই, আশ্রয় তো মিলল না সেখানে? 'কনটিকি'কে তো ভিড়ানো গেল না, বাঁধা গেল না কোন ঘাটে? তবে কি এমনি

ভাবেই ভেসে চলতে হবে জলে জলে? ঢেউয়ে ঢেউয়ে? বাতাস আর স্রোতের ইচ্ছার দাস হয়ে?

আবার রাত এল। গভীর, ঘন কাল রাত।

দূরে, কাছে, নানারকম আলোকময় সামুদ্রিক মায়া। মায়ার খেলা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে ঘুম-ঘুম চোখে হেয়ারডাল সব দেখেন। আর মনে মনে হিসেব করেন। এই রাত নিয়ে একশটা রাত কাটল তাঁদের, এই ভেলায়।

বাতাসের গতি বদলে গেল। সামনে টাকুমে। সামনে রারোইয়া। টাকুমে আর রারোইয়ার ভয়ঙ্কর প্রবাল-প্রাচীর-বলয়। সামনে বটে, তবে কাছে নয়। এখনও দূরে। কত দূরে কে জানে?

'কনটিকি'র গতি দেখে মনে হয় সে এখন ডাঙ্গা-মুখোই চলেছে।

কি মুশকিল! আবার বৃষ্টি শুরু হল!

'কনটিকি' এখন উত্তুরে বাতাসের সওয়ার হয়েছে। এ বাতাস যদি অব্যাহত থাকে, তবে ধীর স্থির গতিতে 'কনটিকি' সেই প্রবাল-প্রাচীর-বলয়ের দিকেই এগিয়ে যাবে। সেই দিকেই যাচ্ছে।

হঠাৎ বাতাস পড়ে গেল। হেয়ারডাল ঘুমাচ্ছিলেন। এক অস্বস্তির মধ্যে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তাঁর মনে হতে লাগল, 'কনটিকি' যেন ঠিক ছন্দে চলছে না। ঢেউয়ের দোলায় গুঁড়িগুলো ওঠা-নামা করছে বটে, কিন্তু তাল যেন সেই আগের মত আর নেই। মাথা উঁচু করে দেখলেন। সেই সমুদ্র। স্তব্ধ, মৌন, মহান। আর কিছু দেখলেন না। আবার ঘুমাতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

সময়ের খেয়ায় রাত ধীরে ধীরে পার হতে লাগল।

খুব ভোরে, ঠিক ছটা বাজবার আগে টর্স্টিন মাস্তুল থেকে নেমে এলেন।

দূরে—বহু দূরে, নারিকেল বন-শোভিত এক দ্বীপ তাঁর চোখে পড়েছে।

খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে

উঠে পড়লেন। আর বৃথা কালক্ষেপ না করে সকলে দাঁড় টানতে শুরু করলেন।

টর্স্টিনের চোখে যে-দ্বীপ ধরা পড়েছে তা রারোইয়া। তাতে সন্দেহ নেই। টান দাঁড়।

সকাল সাড়ে সাতটার সময় দেখা গেল, পশ্চিমদিকে সবুজ এক নারিকেল-দ্বীপ। শুধু তাই নয়, দিগন্তের কোল ঘেঁষে, দিগন্তজুড়ে আরও অনেক দ্বীপের রেখা দেখা গেল।

ওঁরা বুঝলেন, ওঁদের যাত্রা শেষ হয়ে এসেছে। বড় জোর আর ঘণ্টা কয়েক।

'কনটিকি'র গতি ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে। প্রবাল-প্রাচীর-গুলোর কাছাকাছি, সমুদ্র খুব বিক্ষুব্ধ থাকে। ঢেউ হয়ে ওঠে হিংস্র। উন্মত্ত। বড় ভয়ঙ্কর জায়গা।

প্রথম দিকে ওঁদের চেষ্টা হল, 'কনটিকি'কে অন্য দিকে, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোন দিকে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হল। অগত্যা ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি।

'কনটিকি' এখনও পুরো পালে চলছে। কিছু আশা এখনও ওঁদের মনে আছে, হয়ত একটা নিরাপদ খাঁড়ি শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলেন, তা অসম্ভব।

ওঁরা 'শেষ সময়ের' জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

যা কিছু মূল্যবান—রেডিও সেট, ফিল্ম, কাগজপত্র, পানীয় জল—সব বাঁশের ছইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে খুব ভাল করে বেঁধে রাখলেন। ওয়াটার-প্রুফ কাপড় দিয়ে এমনভাবে প্যাক করলেন, যাতে এক ফোঁটা জল ভিতরে না যায়।

একটা লম্বা দড়ি 'কনটিকি'র পিছনে বাঁধলেন। নোঙরটা তৈরী করে রাখলেন। রবারের ডিঙির মধ্যেও অতি দরকারী জিনিস ভরে ভাল করে বেঁধে রাখলেন।

তারপর যে যাঁর জায়গায়, যে যাঁর কর্তব্যে, ঠিক মত হাজির থাকলেন।

সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, সমুদ্রের রূপ ততই ভয়ঙ্কর, ততই হিংস্র হয়ে উঠতে লাগল।

সমুদ্র আর আগের মত স্বাধীন নেই। নিজের খেয়ালে এমন জায়গায় চলতে পারে না। পদে পদে প্রবাল-প্রাচীরে বাধা পায় তার গতি। বাধা পেয়ে খেপে ওঠে। গতি এলোমেলো হয়ে যায়। ফুলে ওঠে ঢেউয়ের আকারে। ঢেউও আবার পর্বতপ্রমাণ। আর এই ঢেউ, সেই আগের মত ভদ্র নয়। ভয়ঙ্কর। এর কোন ছন্দ নেই, শৃঙ্খলা নেই। গতির ঠিক নেই। হাজার হাজার ঢেউ, কোনটা সামনে থেকে আসছে, কোনটা পিছন থেকে আসছে। শত শত মণ জল পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠছে। তারপর পরমুহূর্তেই লাফিয়ে পড়ছে ক্রুর উল্লাসে। ঢেউ নয়, দূর থেকে দেখে মনে হয়, মৃত্যু যেন ডমরু বাজিয়ে ওখানে তাথৈ তাথৈ নৃত্য জুড়ে দিয়েছে।

'কনটিকি' আপন গোঁয়ে সেইদিকেই ছুটে চলেছে।

হেয়ারডাল নির্দেশ দিয়েছেন 'কনটিকি'র কপালে যাই থাক, তাঁদের যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, দেহে যাবৎকাল বল থাকবে, 'কনটিকি' ছেড়ে কেউ নড়বে না। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকবে তাকে। এই বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ে কেউ ছিটকে পড়লে তাঁর মৃত্যু অবধারিত। খবরদার।

সবাইকে পোশাক পরে নিতে বললেন হেয়ারডাল। জুতো পরতে বললেন। একশ দিন বাদে, এই প্রথম জুতোর খোঁজ পড়ল তাঁদের। যার যার লাইফ-বেল্টও বেঁধে নিলেন! সেই অশান্ত উন্মত্ত সমুদ্র-গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে হেয়ারডালের কণ্ঠ ভেসে উঠতে লাগল। এক একটা কাজের হুকুম দিচ্ছেন তিনি।

ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সমুদ্র সিংহনাদ ছাড়ছে। 'কনটিকি' আছাড় খাচ্ছে অসহায়ের মত!

হেয়ারডাল তাঁর মধ্যেই ডায়েরী লিখছেন :

"সকাল ৮টা ১৫ মিঃ। আমরা ক্রমাগত দ্বীপটার দিকে এগিয়ে চলেছি। খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছি ডাঙা আর সবুজ নারিকেল বনের সারি।

"৮টা ৪৫ মিঃ। বাতাস বড্ড জ্বালাতন করছে। ভালভাবে ডাঙায় নামব, সে আশা আর একদম নেই। তবে কেউ ঘাবড়াইনি। 'কনটিকি'র ডেকের উপর সাংঘাতিক তোড়জোড় চলেছে। সামনের প্রবাল-প্রাচীরের মধ্যে একটা ভাঙা জাহাজ মত কি দেখা যাচ্ছে। না, জাহাজ নয়, বোধহয় কাঠের স্তূপ।

"৯টা ৪৫ মিঃ। বাতাস আমাদের ঠেলে সোজা একটা দ্বীপের দিকে নিয়ে চলেছে। প্রবাল-প্রাচীরের সবটুকুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। প্রাচীরটা লাল সাদায় মেশান। জলের উপর জেগে আছে ঠিক যেন একটা কোমরবন্ধ। ঐ প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ঢেউয়ের সাদা সাদা ফেনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বেঙ্গ্‌ট্‌ রান্না চাপিয়েছে। 'কনটিকি'র উপর শেষ খানা ও আমাদের খাইয়ে ছাড়বে। প্রাচীরে আছাড় খাওয়া মাত্র 'কনটিকি' ভেঙে পড়বে। পড়বে কি? আরো কাছে এসে পড়েছে দ্বীপটি। ঐ তো প্রাচীরের ওধারে লেগুনের স্থির জল, তার ওপারে শান্ত এক মায়াময় দ্বীপ।"

সমুদ্রের গর্জন বাড়ছে। বাড়ছেই। শত সহস্র ঢাক যেন এক সঙ্গে বেজে উঠছে। কোথাও উৎসব হচ্ছে মনে হচ্ছে। বোধ হয়, ওঁদের মনে হল, বোধ হয় এক মহা বলিদান হবে। তাই প্রকৃতি মহা উল্লাসে সমুদ্র গর্জনে হাজার ঢাকের আওয়াজ ছড়িয়ে দিয়েছে। হেয়ারডাল ডায়েরি লিখতে লিখতে তা শুনছেন। বেঙ্গ্‌ট্‌ রাঁধতে রাঁধতে তা শুনছেন। টর্স্টিন বেতার-প্রেরক যন্ত্রে রারোটঙ্গার এক অ্যামেচারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে রাখতে তা শুনছেন। ওঁদের সবাই শুনছেন।

টর্স্টিনের সঙ্গে গতকালই হঠাৎ রারোটঙ্গার আলাপ হয়েছে।

হ্যালো, রারোটঙ্গা? হ্যালো রারোটঙ্গা?

হ্যালো, কনটিকি?

হ্যাঁ।

এল আই ২ বি?

হ্যাঁ।

ভাল? সব খবর ভাল?

হ্যালো রারোটঙ্গা, শোন। মন দিয়ে শোন। আমাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমরা রারোইয়া দ্বীপের প্রবাল-প্রাচীরের দিকে ছুটে চলেছি।

বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে। 'কনটিকি'কে কাত করছে, চিত করছে, আছাড় মারছে। সবাই শেষ সময়ের জন্য তৈরী। বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। খালি এরিক অনুপস্থিত। আর টর্স্টিন।

এরিক ছইয়ের মধ্যে ঢুকেছেন। তাঁর জুতো খুঁজে পাচ্ছেন না। আর টর্স্টিন পাগলের মত বেতার প্রেরক যন্ত্রের চাবি টিপে চলেছেন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। শেষ খবর দিয়ে যাচ্ছেন 'কনটিকি' থেকে। কে জানে আর খবর দেবার সুযোগ মিলবে কিনা?

হ্যালো, রারোটঙ্গা, আমরা এসে পড়েছি। হ্যাঁ, ভাল করে শোন। এই তরঙ্গে তুমি তোমার যন্ত্র খুলে রাখবে। আগামী ছত্রিশ ঘণ্টা পর্যন্ত। হ্যালো? হ্যাঁ। আগামী ছত্রিশ ঘণ্টা। যদি বেঁচে থাকি, এর মধ্যেই খবর পাবে। না হলে বুঝবে আমি গেছি। তখন আমাদের শেষ খবরটা ওয়াশিংটনের নরওয়েজিয়ান রাষ্ট্রদূতের অফিসে পৌঁছে দিও। মনে রেখ, ওয়াশিংটনের নরওয়েজিয়ান রাষ্ট্রদূতের অফিস। হ্যালো রারোটঙ্গা, আমরা এসে পড়েছি। আর মাত্র ৫০ ফুট। বিদায়, বন্ধু। বিদায়।

টর্স্টিন বেতারগ্রাহক যন্ত্রের চাবি বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে কৃনুট সেটাকে ভাল করে সীলমোহর করে দিলেন। তারপর কালবিলম্ব

না করে দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে ছইয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। সেখানে আর সকলে এসে জড় হয়েছেন।

ঢেউয়ের আকার ক্রমেই বাড়তে লাগল। 'কনটিকি'র অস্থিরতাও বাড়ল। 'কনটিকি' একবার উঠছে ঐ উঁচুতে, যেন আকাশে গিয়ে ঢুঁ মারবে। আবার ধপ করে নীচে পড়ছে, যেন ডুব দেবে পাতালে। 'কনটিকি'র উপর আর মুহূর্তও টিঁকে থাকা যাচ্ছে না।

হেয়ারডালের নির্দেশ থেকে-থেকে ওঁদের কানে এসে পৌঁছচ্ছে, সাবধান খুব সাবধান। আঁকড়ে ধরে থাক। যে করেই হ'ক 'কনটিকি'কে ধরে থাক।

বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের এত কাছে ওঁরা এগিয়ে এসেছেন যে, সমুদ্রের গর্জনও ওঁরা আর শুনতে পাচ্ছেন না।

এক একটা ঢেউ উঠছে গোঁ গোঁ করে, ওঁদের ঘাড়ের উপর আছড়ে পড়ছে। 'কনটিকি' টলমল করছে। উথাল-পাথাল করছে।

ওঁরা এক একটা জায়গা বেছে নিয়ে প্রাণপণে 'কনটিকি'কে আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। হারমান, বেঙ্গ্‌ট্ আর টর্স্টিন ছইয়ের পিছনে গোটা কতক বাক্সের উপর জায়গা নিয়েছেন। কৃনুট আর হেয়ারডাল মাস্তুল আর ছইয়ের মাঝখানে।

বোঁ বোঁ করে কখনও ঘুরপাক খাচ্ছে 'কনটিকি', কখনও আড়াআড়ি এগুচ্ছে, কখনও কোনাকুনি।

বিরাট বিরাট ঢেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে 'কনটিকি'র উপর, ওঁদের ঘাড়ে। ওঁরা পিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন। হাড় পাঁজরা কে যেন দুরমুশ দিয়ে গুঁড়ো করে দিচ্ছে। সাঁড়াশি দিয়ে কে যেন মাংস টেনে নিচ্ছে।

একটা ঢেউয়ের পর আরেকটা ঢেউ, তার পরেই আর একটা। হাঁফ ফেলবার সময়ও কেউ পাচ্ছেন না। আক্রমণের উপর আক্রমণ। 'কনটিকি' এখনও টিঁকে আছে। ওঁরা এখনও 'কনটিকি'র উপর টিঁকে আছেন। কিন্তু আর কতক্ষণ? কতক্ষণ?

কে একজন ঢেউয়ের বিরাট চাপে থেঁতলে গেলেন। তাঁর গোঙানি শোনা গেল, এ অসম্ভব। এভাবে টিঁকে থাকা অসম্ভব।

একটা বিরাট ঢেউ এল। 'কন্‌টিকি' একেবারে তলিয়ে গেল। না, ঐ যে আবার ভেসে উঠেছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় কৃমুট প্রায় ভেসেই যাচ্ছিলেন, দড়ি ধরে সামলে নিয়েছেন। হেয়ারডাল দাঁতে দাঁত চিপে ধরে আছেন দড়ি। সাবধান! সাবধান! আঁকড়ে থাক। 'কনটিকি'কে ছেড় না।

একটা বড় ঢেউ। তার ধাক্কায় এক প্রবাল-প্রাচীরের উপর উঠে গেল 'কনটিকি'। প্রবল ধাক্কায় মাস্তুল ভেঙে পড়ল। হুড়মুড় করে ছই ভেঙে পড়ল। ওদের প্রাণ যেন বেরিয়ে যাবে বলে মনে হল। এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল নানা জিনিস।

হেয়ারডাল দেখলেন, ছইখানা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল। তার কাছেই উপুড় হয়ে হাত পা ছড়িয়ে মড়ার মত পড়ে আছেন, হারমান। তারপরের ঘটনা তাঁর ঠিক মনে নেই। মনে হল তিনি ছিটকে পড়েছেন। তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন গভীরে, গভীরে আরও গভীরে। সম্বিৎ পেয়ে, নোনাজল গিলে হেয়ারডাল ভেসে উঠলেন। দেখলেন 'কনটিকি' উঁচু এক প্রবাল-প্রাচীরের উপর উঠে পড়েছে। সে ভগ্ন। সে বিপর্যস্ত। কিন্তু সে জয়ী! চার হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সে নিরাপদে তার আরোহীদের তীরে পৌঁছে দিয়েছে। পৌঁছে দিয়েছে পলিনেশিয়ায়। হ্যাঁ, নিরাপদেই।

ঐ তো হারমান, বেঙ্গ্‌ট্, কৃমুট, টর্স্টিন। সবাই ধাক্কা সামলে নেমে পড়েছেন শান্ত, স্থির, স্বচ্ছ লেগুনের জলে। প্রাচীরের ওপারে বিক্ষুব্ধ, হিংস্র সমুদ্র। কিন্তু এপারে আশ্রয়। শান্ত, স্বচ্ছ এক দিঘির মত লেগুন। আর লেগুনের ঐ পারে, ঐ তো একটা দ্বীপ। কি সবুজ। কি সুন্দর!

আরে, এরিক কই? হারমানের খেয়াল হল।

এরিক!

সবাই নিচে এসে জড় হয়েছে। শুধু এরিক নেই।

এরিক!

এরিক উপর থেকে সাড়া দিলেন, আমি ছইয়ের নিচে।

ছইয়ের নিচে! ছইয়ের নিচে কি?

চাপা পড়েছি।

তখন খেয়াল হল, তাইতো জুতো খুঁজতে ছইয়ের ভিতরে ঢুকেছিলেন এরিক। আর চাপা পড়েছেন। খানিক পরে তিনি বেরিয়ে এলেন। হাতে এক পাটি জুতো। আর মুখে সাফল্যের হাসি।

শান্ত বেলাভূমি। অনেকখানি সময় এর মধ্যে পার হয়েছে। গা এলিয়ে ওরা পড়ে আছেন। কি অদ্ভুত মায়াময় পলিনেশিয়া। আকাশের গা বেয়ে শ্লথ মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে সাদা মেঘের দল। বাণিজ্য বায়ুর জননী ওরা। কিন্তু ওদের আর প্রয়োজন নেই। লেগুনে সূর্যের আলো। স্বচ্ছ জলে কত মাছ। কত শান্তি। কত স্বস্তি। তাঁদের যাত্রার শেষ হয়েছে। অক্ষত সবাই পৌঁছে গেছেন তাঁদের গন্তব্যে। পলিনেশিয়ায়।

কারও মুখে কথা নেই। ওঁরা চুপচাপ শুয়ে ছিলেন পাশাপাশি।

বেঙ্গ্‌ট্ই শেষ পর্যন্ত স্তব্ধতা ভাঙলেন।

বললেন, স্বর্গ, এটা যে স্বর্গ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর সকালের নাকানি-চুবানি, সেটা বৈতরণীর।

সকলের হাসি বিভিন্ন গ্রামে বেজে উঠল। উঠেই মিলিয়ে গেল। একটা অদ্ভুত হাওয়া উঠেছে। পলিনেশিয়ার মিঠে হাওয়া। আর নারিকেল পাতায় সঙ্গীত শুরু হয়েছে। তাঁদের মনে হল, ওটা স্বর্গেরই সঙ্গীত।

২৬

রোদ যেন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে ঐ ছোট্ট দ্বীপটার উপরে। এক মখমল-কোমল উষ্ণতায় আচ্ছন্ন করে ফেলছে ছয়টা মানুষকে।

ওঁরা গভীর শ্রান্তিতে, পরম আলস্যে গা এলিয়ে দিয়েছেন বেলাভূমে, নরম উষ্ণ বালুর বিছানায়।

মাথার উপরে সিন্ধুসারস ডানা মেলে পাক খাচ্ছে। পিছনে দ্বীপের উপরে, নারিকেল বনে বাতাসের সন্তর্পণ বিচরণ শুরু হয়েছে। সামনে লেগুন। ধীর স্থির জলে মৃদু তরঙ্গ উঠছে। আরও দূরে প্রবাল-প্রাচীরের বলয়। এপারে শান্ত, সুন্দর লেগুন আর ওপারে বিক্ষুব্ধ অশান্ত সমুদ্র। বড় হিংস্র, বড় ক্রুর। বড় ভয়ঙ্কর।

আর ঐ যে 'কন্‌টিকি'। বিপর্যস্ত, ভগ্ন কিন্তু বিজয়ী। যুদ্ধ-ক্লান্ত বিজয়ী এক ধুরন্ধর সেনাপতির মতই যেন পড়ে আছে। সর্বাঙ্গে তার ক্ষতচিহ্ন। বাঁশের সুন্দর ছই হেলে পড়েছে। মাস্তুল ঢলে পড়েছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে হাল, দাঁড়, পাটাতন। ঢেউয়ের প্রবল এক ধাক্কায় এক প্রবাল-প্রাচীরের উপর উঠে পড়েছিল, সেইখানেই আটকে আছে। তীব থেকে বেশ দূরে। তবু তার অসহায় চেহারাটা বেশ দেখা যায়।

আর তাঁরা, তাঁদের সার সার পরিশ্রান্ত ছ-টা দেহ। নরম রোদের উষ্ণতায় তন্দ্রা আসে। কে ওঁরা? ঐ যে ওপাশে, কে ও? বেঙ্গ্‌ট্। বেঙ্গ্‌ট্ ড্যানিয়েলসন। আর ও, তাঁর পাশে? হারমান ওয়াজিঙ্গার। তাঁর পাশে এরিক হেসেলবার্গ। তাঁর পাশে কৃনুট হগলাণ্ড, তাঁর পাশে টর্স্টেন র‍্যাবি, আর এই তো থর হেয়ারডাল। 'কন্‌টিকি'-অভিযানের নায়ক। হেয়ারডাল। আর রোদ। প্রচুর রোদ। আর উষ্ণতা। রমণীয় উষ্ণতা। আর তন্দ্রা আর আশ্রয়। একটা দ্বীপ, একটা ডাঙা, মাটি, আশ্রয়, পরম নির্ভরতা। আর রোদ। তাঁদের চুলে, তাঁদের মুখে, তাঁদের সমগ্র দেহে। পোশাকের উপরে রোদ, পোশাকের ভিতরে রোদ। রক্তের কণায় কণায় উষ্ণতা সঞ্চারিত করে দিচ্ছে। ইওরোপ ··নরওয়ে···সুইডেন···রোদের ওম্···আঃ···'কন্‌টিকি'···

সমুদ্রের চঞ্চল প্রবাহ···ঢেউ···অশান্ত ঝড়ের ঝাপট···কত, কত পথ···

···পলিনেশিয়ায় ? ভেলায় করে ! পাগল, পাগল······ তুমিই তবে চেষ্টা কর না, যাও না ভেলা ভাসিয়ে পলিনেশিয়ায়। হুঁ। ···এদিকে আমেরিকা আর ওদিকে পলিনেশিয়া। মাঝখানে সমুদ্র। ৪০০০ মাইল প্রশান্ত মহাসাগর। ভেলায় করে পাড়ি মারা পাগলামি। নিছক পাগলামি।···

সত্যিই কি পৌঁছুলেন তাঁরা ? সত্যি ? একশ একদিন আগে ডাঙা থেকে পা তুলেছিলেন। তারপর একটানা ঢেউয়ের দোলানি। এখনও পা দোলে, শরীর টলে। মনে হয় এ ডাঙা নয়। ভেলা, 'কন্‌টিকি।'

হঠাৎ টর্স্টিনের তন্দ্রা ছুটে যায়। মনে পড়ে, রারোটঙ্গা ছত্রিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে যদি সাড়াশব্দ না পায় তাঁদের, তবে জানিয়ে দেবে তাঁদেব নিরুদ্দেশ-বার্তা। প্রথমে ওয়াশিংটন। সেখান থেকে সাবা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, "কন্‌টিকি নিখোঁজ। জলমগ্ন বলিয়া সন্দেহ।" ছত্রিশ ঘণ্টা, অপেক্ষা করবে রাবোটঙ্গা। ছত্রিশ ঘণ্টা, তার মানে রাত দশটা পর্যন্ত। সর্বনাশ ! তুপুর হয়ে এল যে ! কৃনুট কৃনুট, ওঠো। বেতার যন্ত্রটাকে খাড়া করি এস। রাত দশটার মধ্যে রারোটঙ্গাকে ধরতে হবে। এস, এস। জলদি।

কিন্তু তুপুর গড়িয়ে গেল। বিকেল গড়িয়ে গেল। কথা ফুটল না বেতার যন্ত্রের মুখে। জল ঢুকে সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে। ব্যাটারিটা সিক্ত, নিরুত্তেজ। যন্ত্র নির্বাক। প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন টর্স্টিন। চাবি টিপে টিপে আঙলে ফোস্কা পড়ে গেল। স্বর ফুটল না যন্ত্রের মুখে।

রাত্রি ৮টা হল, ৯টা হল। কিন্তু না। কিছুতেই কথা ফুটল না। কৃনুট আর টর্স্টিনের পেটে-যত বিদ্যে ছিল, সব ফেল পড়ে গেল।

টর্স্টিন পাগল হয়ে উঠলেন যেন। খবর পাঠাতেই হবে। যে

করেই হোক। নইলে সর্বনাশ। লোকে ভাববে ডুবে গেছে 'কন্‌টিকি', তাঁরা মারা গেছেন। টর্স্টিনের অকর্মণ্যতার জন্য বদনাম হবে 'কন্‌টিকি'র ? এ কখনও হতে পারে ?

পৌনে দশটা। কৃনুট আর টর্স্টিনের গা দিয়ে দরদর ধারে ঘাম ঝরছে। সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। বেতার-প্রেরক যন্ত্রটার উপর শুধু টর্স্টিন নন. শুধু কৃনুট নন, ওঁরা সবাই, ছটি প্রাণীই গভীর উদ্বেগের সঙ্গে ঝুঁকে পড়েছেন।

কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। টর্স্টিন বড় যন্ত্রটার আশা ছেড়ে দিলেন। নাঃ ওটা এখন আর কোনও কাজে আসবে না। ছোট্ট, মিলিটারী আমলের এক বেতারপ্রেরক বের করলেন। পাল্লা বেশী নয়। ওগুলো ফিল্ড ট্রান্সমিটার। জরুরী অবস্থায় কাজে লাগান হয়, ওগুলো।

কে যেন সেকেণ্ড গুনে চলেছেন। দশটা বাজতে আর চল্লিশ সেকেণ্ড। আর তিরিশ সেকেণ্ড। দ্রুত হাত চলছে কৃনুটের, টর্স্টিনেরও। কিন্তু না, এও বোবা। আর মাত্র কুড়ি সেকেণ্ড। পরিষ্কার আকাশ। আর পনের সেকেণ্ড। ক্যাঁক্ করে শব্দ করলে যন্ত্রটা। ধক করে উঠল সবার বুক। কিন্তু আবার চুপ মেরে গেল যন্ত্র। আর দশ সেকেণ্ড, আর নয়, আর আট···টর্স্টিন মরিয়া হয়ে চাবি টিপছেন, যে তরঙ্গে রারোটঙ্গার থাকবার কথা, সেই তরঙ্গে নিজের যন্ত্র বাঁধবার চেষ্টা করছেন মিটার ব্যাণ্ডের চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আর সাত সেকেণ্ড। হঠাৎ কার কথা যেন শোনা গেল। যন্ত্রটাতে ক্রমেই যেন জীবন ফিরে আসছে। হা ঈশ্বর। আর ছয়, আর পাঁচ। আবার ক্যাঁক্ করে আওয়াজ হল, কার কথা শোনা গেল। রারোটঙ্গা! রারোটঙ্গা তাহিতির টেলিগ্রাফ স্টেশানের সঙ্গে কথা বলছে। আধখানা মাত্র কথা শোনা গেল। "—সামোয়ার এদিকে কোন বিমান দেখা যাচ্ছে না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত—"

ওদের বেতার আবার ঝিমিয়ে পড়ল। শোনা গেল না আর কিছু। বোবা হয়ে গেল। বলা গেল না কোনও কিছু। সময় দ্রুত বয়ে যেতে লাগল। আর চার সেকেণ্ড, তিন সেকেণ্ড, দু সেকেণ্ড, এক সেকেণ্ড। রাত্রির অন্ধকারে রেডিয়ম ডায়াল জ্বল জ্বল করছে। খট খট করে সেকেণ্ডের কাঁটা ছুটে চলেছে। দশটা। ছত্রিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। হতাশভাবে সবাই ফাঁকা পরিষ্কার আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। অদৃশ্য ব্যোমপথে রেডিও-বার্তা দ্রুত চলেছে ওয়াশিংটন। রারোটঙ্গা নিশ্চয়ই জানাচ্ছে, "ছত্রিশ ঘণ্টা আগে 'কনটিকি'র খবর পেয়েছিলাম। একটা দ্বীপে পৌঁছবার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করছিল। তারপর তাদের আর কোনও খোঁজ পাইনি। আশঙ্কা হয় ডুবে গেছে তারা।" ওয়াশিংটন থেকে খবর যাবে তাঁদের নরওয়ে সুইডেনে, তাঁদের সকলের বাড়িতে বাড়িতে, নিখোঁজ, এরা নিখোঁজ হয়েছে। তার পরিণাম কী হবে, তা ভাবতেও আর মন চায় না। টর্স্টিনের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। আছাড় মেরে যন্ত্রটা ভাঙতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু তবুও হতাশ হলে চলবে না। তাঁদের খবর পৌঁছে দিতেই হবে। আজকেই। দশটা বেজেছে, তাতে কী হয়েছে? সাড়ে দশটা এখনও বাজেনি, এগারটা বাজেনি, রাত ফুরিয়ে যায়নি এখনও।

কৃনুট আর টর্স্টিন নতুন উৎসাহে কাজ শুরু করলেন। প্রাণপাত পরিশ্রম করে সাড়ে দশটার মধ্যেই যন্ত্রটাকে চাঙ্গা করে তুললেন। এবার তো বেশ কথা বলছে।

ধর রারোটঙ্গাকে।

রারোটঙ্গা, হ্যালো রারোটঙ্গা, 'কনটিকি' বলছি, এল আই ২ বি। রারোটঙ্গা, রারোটঙ্গা, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো?

কিন্তু রারোটঙ্গার সাড়া পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় যন্ত্র বন্ধ করে দিয়েছে।

তবে লস এঞ্জেলসের হল্ আর ফ্রাঙ্ককে ডাক। সাড়া নেই। তবে লিমার নৌবিদ্যালয়কে ডাক। সাড়া নেই, কারও সাড়া নেই। কেউ শুনল না এঁদের ডাক। সবাই বোধ হয় ধরেই নিয়েছে, ওঁরা মৃত।

কিন্তু তবু হতাশ হলে চলবে না। যে করেই হোক, পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ রাখতেই হবে। ফিরে যেতে হবে ওঁদের।

টর্স্টিন আর উপায় না দেখে 'সি-কিউ' বার্তা পাঠাতে শুরু করলেন। পৃথিবীর সব বেতার-স্টেশনকে উদ্দেশ্য করে যে বেতার বার্তা পাঠান হয়, তাকেই 'সি-কিউ' বার্তা বলে।

এতে কাজ হল। একটা ক্ষীণ কণ্ঠ ধরা পড়ল ওঁদের যন্ত্রে। দ্বিগুণ উদ্যমে টর্স্টিন বেতার যন্ত্রের চাবি ঘোরাতে লাগলেন। কিছুতেই আর এটাকে হারিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। কিছুতেই না। ক্রমেই স্বরটা স্পষ্ট হতে লাগল।

হ্যালো আমি পল। কলরাডো থেকে বলছি। তোমার নাম কী? কোথায় থাক?

আরেক এমেচার। বেতার বন্ধু খুঁজছে। তা হোক। সাড়া দিলেন টর্স্টিন।

হ্যালো। 'কনটিকি,' থেকে বলছি। আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের এক জন-মানবশূন্য দ্বীপে এসে ঠেকেছি।

পল বিশ্বাস করলে না। ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পেলে না। পল ধমকে দিলে। ও নিশ্চয়ই ভেবেছে, ওদের বাসার কাছ থেকে ওরই মত কোনও অ্যামেচার ওর সঙ্গে রসিকতা করছে। পল তার যন্ত্র বন্ধ করে দিলে। যাচ্চলে। হতাশায় চুল ছিঁড়তে লাগলেন টর্স্টিন। কিন্তু থামলেন না। পাগলের মত চাবি টিপে অনবরত বলতে লাগলেন, আমরা নিরাপদ, আমরা নিরাপদ, নিরাপদ।

পল এবার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালালে। টুক করে একবার নিজের চাবিটা খুলে বললে, থাক, ঢের হয়েছে, আর চালাকি মের

না। নিরাপদ যদি তো অমন তারস্বরে চিল্লাচ্ছ কেন? পলের যন্ত্র আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ওঁরা হয়ত খেপেই যেতেন, হয়ত আছাড় মেরে ভেঙেই ফেলতেন যন্ত্রটা, হয়ত আরও অনেক কিছুই করতেন। কী করতেন ওঁরাই জানেন, কিন্তু সে সব কিছু না করে হঠাৎ সবাই লাফিয়ে উঠলেন আনন্দে।

হল আর রারোটঙ্গা একসঙ্গে সাড়া দিয়েছে। হল ওঁদের আওয়াজ পেয়ে আনন্দে কেঁদেই ফেলল। বেঁচে আছ তা হলে? ডাঙা পেয়েছ? সাবাস বন্ধু, সাবাস। রারোটঙ্গাও প্রতিধ্বনি করলে, সাবাস বন্ধু, সাবাস। ভয় নেই। তাহিতি থেকে সাহায্য যাচ্ছে। ফরাসী সরকার জাহাজ পাঠাচ্ছেন।

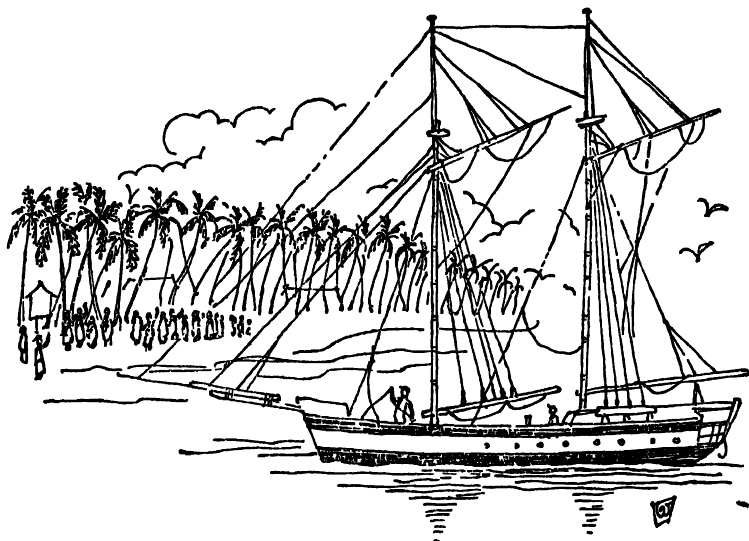
আর শোনা গেল না। ছোট্ট যন্ত্রটার সব শক্তি নিঃশেষ হয়েছে। সে নীরব হয়ে গেল।

তা হোক, আর ভয় নেই। এই জনহীন দ্বীপে অনির্দিষ্টকাল আর পড়ে থাকতে হবে না। পৃথিবী ওঁদের খবর পেয়ে গেছে। আজ না হয় কাল, না হয় কদিন পবে ফরাসী সরকাবের জাহাজ আসবে।

কিন্তু হেয়ারডাল জানেন, তারও আগে ছুটে আসবে, অতিথি-বৎসল পলিনেশিয়রা। তারা আসবে ঐ লেগুনের ওপার থেকে। আসবে ডিঙি বেয়ে বেয়ে সাদা সাদা পাল উড়িয়ে। নিয়ে যাবে তাদের গ্রামে। উৎসব শুরু হবে। দিনরাত্রি ধরে চলবে। সুন্দরী পলিনেশিয় তরুণ তরুণীরা, দেবকুমার, দেববালারা অনাবৃত দেহে, তাঁদের ঘিরে ঘিরে নাচবে। কদিন ধরে সমানে চলবে পান ভোজন। হেয়ারডালের খুবই পরিচিত সব স্মৃতি। ঘুম ঘুম মগজে সব ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। মৃদু সঞ্চরমান বাতাস সারি বাঁধা দ্বীপের নারিকেল পাতায় যেন পলিনেশিয়ার সাদর সম্ভাষণ বাজিয়ে চলল।

আইও ওরানা। আইও ওরানা। স্বাগতম্। সুস্বাগতম্। এস বন্ধু, এস, এস।

তৃতীয় খণ্ড : আইয়া ও-রা-না



২৭

লেগুনের মৃদু তরঙ্গ-সঙ্গীত শুনতে শু: তে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এরিক হেসেলবার্গ।

তারপর ভোর হল। নতুন রাগিনীতে গান শুরু করল সেই অচেনা দ্বীপের সারি সারি নারিকেল পাতার মর্মর। রোদ এসে লুটিয়ে পড়ল এরিকের দৈত্যের মতো দেহে, এলোমেলো চুলে, বুনো-বুনো দাড়ি গোঁফে। হরিণের চামড়ার অদ্ভুত একটা প্যাণ্ট তাঁর পরনে। তাঁকে দেখাচ্ছিল যেন রবিনসন ক্রুশো।

ততক্ষণে আর সবাই উঠে পড়েছেন। প্রাত্যহিক কর্তব্যে লেগেও পড়েছেন সবাই। হেয়ারডাল, হারমান, ড্যানিয়েলসন, কৃনুট আর টার্স্টেন।

ঘুমাচ্ছেন শুধু এরিক। তিনি তখন এক মিঠে স্বপ্নে বিভোর। বাড়ির স্বপ্ন দেখছিলেন এরিক। এতদিন পরে প্রিয়তমা লিস্—তাঁর স্ত্রী, আব অ্যান—তাঁর সেই ছোট্ট মেয়ে অ্যান, শিওরে এসে দাঁড়িয়েছে। লিস্ হাসছে। অ্যান আধোআধো বলছে, বাবা তুমি এলে? জানো বাবা, পুসির বাচ্চা হয়েছে।

কোত্থেকে ছোট্ট তুলতুলে একটা বিড়াল ছানা এরিকের বুকে লাফিয়ে উঠল। আদর করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গেলেন এরিক। আর হাত দিয়েই চমকে উঠলেন।

ঘুম তাঁর ভেঙ্গে গেল। কোথায় বিড়াল ছানা? এরিক দেখলেন ইয়া বড় এক সন্ন্যাসী কাঁকড়া তাঁর বুকের উপর উঠে পড়েছে। সেটাকে এক ঝটকায় ফেলে দিলেন। অমনি টের পেলেন তাঁর থলিটার ভিতরও কি যেন একটা ঘুরঘুর করছে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠতেই কোমরের ব্যথায় টান ধরল।

বাতে কাবু করেছে এরিককে। তা হোক, বাতের ব্যথা তখনকার মত ভুলে, এরিক তাড়াতাড়ি ঘুমোবার থলিটায় বেশ করে ঝাড়া দিলেন। টুপ করে বেরিয়ে পড়ল আরেকটা কাঁকড়া। এটাও সন্ন্যাসী।

ভাল জ্বালা! এরিক বেজার মুখে ঘুরতে বের হলেন। কিন্তু ভাল লাগল না। মন উদাস। বৌয়ের, মেয়ের, এমন কি পুসি বেড়ালের মুখটা পর্যন্ত মনে ভেসে উঠতে লাগল বার বার করে।

অন্যদিন এরিক দ্বীপময় ঘুরে বেড়ান, গীটার বাজান, ছবি আঁকেন। দ্বীপের যত আজব প্রাণীর ছবি। আজ কিছুই ভাল লাগল না।

দিন ছয় সাত ওঁরা এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছেন। 'কনটিকি' এখনও আটকে আছে লেগুনের সেই প্রবাল প্রাচীরে। তার অর্ধেকটা বাইরের সমুদ্রে, অর্ধেকটা লেগুনের জলে। ওটার যেন ত্রিশঙ্কুর অবস্থা।

যতদিন ওই ভেলার পিঠে তাঁরা সমুদ্রে ভেসেছেন, ততদিন এরিকের একবারও বাড়ির কথা মনে পড়েনি। যেই তাঁদের চলা থেমে গেল, কঠিন মাটির আশ্রয় মিলল পায়ের তলে, অমনি স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে উড়ে এল লিস্, এল অ্যান।

এরিক মন হালকা করবার জন্য চড়ায় চড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলেন লেগুনের জলে, বেশ দূরে, কটা সাদা সাদা রাজহাঁস ভাসছে। আরে না, ওগুলো যেন নৌকোর পাল বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ পালই তো। ওপার থেকে এপারেই আসছে।

এরিক চেঁচিয়ে বললেন, থর, নৌকো।

হেয়ারডাল ছুটে এলেন।

বললেন, তাইতো। এই, দূরবীণটা আন তো।

দূরবীণ নিয়ে একজন ছুটে এলেন। দেখলেন তিনখানা পলিনেশিয়-নৌকো তাঁদের দিকে জোর বাতাসে ভেসে আসছে।

হেয়ারডাল বললেন, ওরা জানতে পেরেছে। ওদের গ্রামে যে অতিথি এসেছে, সে কথা ওরা জানতে পেরেছে।

দেখতে দেখতে নৌকোগুলো এসে লাগল। একমুখ হাসি নিয়ে, হাতগুলো বাড়িয়ে দিয়ে ছুটে এল তিনজন বাদামী মানুষ। এরিকের মনে হল যেন কতকালের চেনা।

আইয়া-ওরা-না। এরিকরাও চেঁচিয়ে উঠলেন পরিচিত লোকের মত।

আইয়া-ওরা-না। সুস্বাগতম্!

ওরাও চেঁচিয়ে উঠল, আইয়া-ওরা-না। আইয়া-ওরা-না।

স্বাগতম্। স্বাগতম্। স্বাগতম্।

ওদের কাছ থেকেই জানা গেল, ওরা রারোইয়া দ্বীপের লোক। কদিন থেকে এখানে ধোঁয়া উঠছে। এদিক থেকে নানা জিনিস ভেসে যাচ্ছে তাদের গ্রামে।

বলি ব্যাপারটা কি? একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। গ্রামে এইসব কথা বলাবলি হচ্ছে, এমন সময় টিনভর্তি খাবার ভেসে এল। সেই টিনের গায়ে লেখা 'কনটিকি'।

'কনটিকি'!

গ্রামসুদ্ধ চমকে গেল সবাই। 'কনটিকি' যে তাদের দেবতা! আদি পুরুষ!

এ কী রহস্য? ভয়ে এ-কদিন আর কেউ তাই এদিক পানে আসেনি। তারপরে দেখা গেল আরো অনেক জিনিস ভেসে আসছে। একদিন একটা টিনের মধ্যে পুরনো জুতো পাওয়া গেল। সাহেবরা যে-রকম জুতো পরে, সেই ধরনের জুতো। তখন সবার সাহস হল। না, এ তবে মানুষ। তবে বোধ হয় জাহাজডুবি হয়েছে।

তখন গাঁও-বুড়ো বললে, যা ওপারে। দেখে আয় ব্যাপারটা কি? লোক থাকলে নিয়ে আসবি।

এই কথা কটা হাঁফাতে হাঁফাতে কোনো রকমে বলেই ওরা ছুট

দিল কৃমুটের কাছে। কৃমুট তখন রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে গান শুনছিলেন।

এরিক দেখলেন, ওরা তিনজন সেই গান শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। ওরা এখানে ছোটে, সেখানে ছোটে, এটা দেখে, সেটা দেখে আর হেসে গড়িয়ে পড়ে। ওদের ভাবসাব দেখে মনে হয়, এমন মজার জিনিস ওরা আর কখনো দেখেনি।

হঠাৎ ওরা বলে বসল, চল।

কোথায় যাব?

ওরা বললে, চল, চল, আমাদের গ্রামে চল।

গ্রামে এখন কি করে যাব? এত জিনিসপত্র, তোমাদের ঐ একটা নৌকোয় তো ধরবে না। আর এসব ফেলেও যাওয়া যায় না।

এরিক দেখলেন, থর ওদের খুব বোঝাচ্ছে।

তার চেয়ে তোমরা এখন ফিরে যাও। নৌকো আনো আরো। তারপর আমরা যাব।

কি জানি, বেঙ্গ্‌ট্‌কে ওদের খুব পছন্দ হয়ে গেল। খপ করে তার হাতটা চেপে ধরে বলল, তবে তুমি চল, আমাদের সঙ্গে।

আর কি নিস্তার আছে। গোঁ যখন ধরেছে, তখন বেঙ্গ্‌ট্‌কে ওরা নিয়েই গেল।

এরিক দেখলেন, বেঙ্গ্‌ট্‌ নির্বিকার ভাবে পলিনেশিয়দের সঙ্গে নৌকোয় গিয়ে উঠলেন। নৌকো ছেড়ে দিল। পশ্চিমা বাতাসে পাল তুলে তরতর করে এগিয়ে চলল।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই ওঁরা দেখলেন ওপার থেকে নৌকোর বহর ছুটে আসছে। পালে পালে দিগন্ত ছেয়ে গেছে।

নৌকোর বহর আরো কাছে এগিয়ে এলে এরিক দেখলেন, সব আগের নৌকোটিতে বসে আছেন বেঙ্গ্‌ট্‌। ওকে দেখেই মাথা থেকে টুপি খুলে .নাড়াতে লাগলেন বেঙ্গ্‌ট্‌। সেই ফাঁকে

তাঁর বিরাট টাকটি বেরিয়ে পড়ে সকালের রোদে চকচক করতে লাগল।

দেখতে দেখতে ডাঙ্গায় ওদের নৌকো এসে ভিড়ল। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পলিনেশিয়রা পিলপিল করে এগিয়ে এল। ঘিরে ধরল ওঁদের।

বেঙ্গ্‌ট্‌ মোটাসোটা এক আধাবয়সি পলিনেশিয়কে নিয়ে এগিয়ে এলেন থরের কাছে।

বললেন, ইনি হচ্ছেন টেকা। রারোইয়ার সর্দার।

টেকাকে দেখে ভালই লাগল এরিকের। বেশ গাট্টা-গোট্টা। বেশ অমায়িক। ও যে দলের নেতা সে বিষয়ে বেশ সচেতন। আর জানেশোনেও বেশ।

বেশ লাগল টেকাকে। এরিকের ইচ্ছে হল, তখনই খসখস করে একটা স্কেচ এঁকে ফেলেন টেকার। আবার ভাবলেন, কি রীতিনীতি পলিনেশিয়ার, জানা নেই কিছু। কাজ কি উড়ো ফ্যাসাদ বাধিয়ে। তার চেয়ে দিন দুই যাক। ভাব-সাব হোক টেকার সঙ্গে। তারপর দেখা যাবে।

কিন্তু টেকার সঙ্গে ভাব হতে দুমিনিটও লাগল না। সে নিজেই এগিয়ে এসে ভাব জমালে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে অনেক কথা জেনে নিলে। রারোইয়া ফরাসী সরকারের অধীন। টেকা কাজচলা ফরাসী বেশ ভালোই বলে।

একগাল হেসে টেকা বললে, তাই বল, তোমরা ভেলায় করে পৌঁছে গেছ এখানে। ডুবো জাহাজের মাল্লা নও তোমরা। তাই আমরা অবাক হয়ে ভাবি, জাহাজ দেখলাম না, আলো দেখলাম না, ভোঁপা শুনলাম না, জাহাজ ডুবি হল কেমন করে? আরে জাহাজই নেই তোমাদের, তাই জাহাজ ডুবিও হয়নি। হিসেব সাফ। আচ্ছা, এবার চল তো, তোমাদের ভেলাটা দেখি।

অমনি সবাই ছুটল লেগুনের ধারে। লোকের সংখ্যা দেখে মনে

হচ্ছিল, টেকা বোধ হয় গ্রামে আর জোয়ান মরদ রেখে আসেনি একটাও।

ওরা সব হুল্লোড় করছিল কৃনুট আর টর্স্টেনকে ঘিরে। রেডিওর বক্তৃতা আর গান শুনে খুব মজা পাচ্ছিল। হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

টেকা যেই বললে, চল তো তোমাদের ভেলাটা দেখি অমনি সবাই গান শোনা ছেড়ে কলকল করে উঠল। চল চল তাই চল।

ভেলাটা দেখে তো সকলের চক্ষুস্থির। সবাই যেন হতভম্ব হয়ে গেছে বেজায়। এরিক দেখলেন, কয়েক মুহূর্ত কেউ কথা বললে না। সেই স্তব্ধ বেলাভূমে কি এক জাদুর মায়ায় যেন এতগুলো লোকের সরব কাকলি অথবা কলকলি একেবাবে নিঃশব্দ হয়ে গেল। 'কনটিকির' দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে বইল তারা। এমন আজব যানে চড়ে কেউ সমুদ্র পাড়ি দিতে পাবে, সে কথা বিশ্বাস করতে ওদের কষ্ট হচ্ছিল।

'কনটিকি' আটকে ছিল এক প্রবাল প্রাচীবে। তাব অর্ধেকটা লেগুনেব শান্ত জলে' আব বাকী অর্ধেক বাহির সমুদ্রে। অশান্ত ঢেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল কনটিকির উপব। সমুদ্রে ততক্ষণে বোধ হয় জোয়ার এসেছে। ফুলে উঠেছে জল। ঢেউয়েব এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেল কনটিকি। মড়মড় করে যেন আর্তনাদই কবে উঠল। লেগুনের নিচু জলে হঠাৎ একটু এগিয়েও এল।

কনটিকিকে এই ভাবে নড়তে দেখে, শব্দ করতে দেখে পলিনেশিয় লোকগুলোর হতবুদ্ধিভাব কেটে গেল।

তারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, পায়ে-পায়ে। পায়ে-পায়ে।

টেকাও মাথা নেড়ে বললে, এটা নির্ঘাৎ পায়ে-পায়ে। গল্প শুনেছি, আমাদের আদিপিতারা এমনি সব পায়ে-পায়েতে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিতেন। তা জিনিসটা চোখে কখন দেখিনি। এই দেখলাম।

টেকা বললে, আর দেরি নয়। চল, এবার গ্রামে যাই।

টেকার মুখ থেকে কথা না থামতেই লোকগুলো দৌড় দিলে। তারপর, এরিক দেখলেন, সে যা পারছে, ওঁদের জিনিসপত্র নিয়ে নৌকোয় তুলছে।

থর টেকাকে বললেন, কনটিকিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দাও।

নিশ্চয়ই। টেকা হুকুম দিলে কি যেন, আর জোয়ান মরদরা সব জলে ঝাঁপিয়ে কনটকির কাছে গিয়ে হাজির হল। বাঁধল তাকে। টেনে আনল লেগুনের জলে। ওদের নৌকোর পিছনে তাকে বেঁধে বেয়ে নিয়ে চলল গ্রামের দিকে।

গ্রামে পৌঁছে যে দৃশ্য দেখলেন এরিক, তা জীবনে কখনো ভুলবেন কি না সন্দেহ। গ্রাম ভেঙে পড়েছে লেগুনের ধারে। চলবার সামর্থ্য যাদের কিছুটাও আছে তারা হেঁটে হোক কি হামাগুড়ি দিয়ে হোক, এসে হাজির হয়েছে নৌকোর ঘাটে।

স্বল্পবাস, নিরাভরণ তরুণীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। দেহে তাদের প্রচুর সৌন্দর্য, মুখে প্রচুর হাসি আর হাতে ফুলের বাহারি মালা। এরিকের চোখ তৃপ্তিতে ভরে এল।

সেই পড়ন্ত বেলার মায়াবী রোদ, অপার্থিব সেই যৌবন সম্ভার, অদ্ভুত এক অনুভূতির জন্ম দিল এরিকের মনে। তাঁর মনে হল, এই পৃথিবীর কেউ নন তিনি। কেউ নন। তাঁর মনে হল, তাঁর যেন কোন অতীত নেই। সামনেও যেন কিছু নেই, কোন ভবিষ্যৎ। এরিক যেন বর্তমানেরই বাসিন্দা। আর লেগুনের এই মায়াবী নীল জল, নারিকেল পাতার মর্মর আর অফুরন্ত যৌবনের সুগন্ধি ঘ্রাণ—এই যেন সে বর্তমানের মৌরসী সীমানা।

এরিক ভাবলেন, বেঙ্গ্‌ট্‌ ঠিকই বলেছিল, স্বর্গ এখানেই।

এই তো স্বর্গ! ওই যে সব অপ্সরারা কূলে রয়েছে দাঁড়িয়ে। অন্তরঙ্গ আমন্ত্রণ ছড়িয়ে রেখেছে তারা সমস্ত পরিবেশে।

আইয়া-ওরা-না। আইয়া-ওরা-না। আইয়া-ওরা-না। অজস্র নারীকণ্ঠে কি অপূর্ব এই সঙ্গীত বেজে ওঠে। অপরিসীম পুলকের ঢেউয়ে ডিঙ্গিগুলো দোল খায়। ঘরছাড়া, ছন্নছাড়া, কজন দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর কানে অনবরত বাজতে থাকে নিবিড় আমন্ত্রণের একটানা আহ্বান, এসো এসো এসো। অজানা এক অনুভূতির মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এরিক, থর, হারমান, বেঙ্গ্ট্, কৃনুট, টর্স্টিন।

নৌকো গিয়ে ঘাটে লাগে।

আর তারপর সব যেন একখণ্ড সুরভিত স্বপ্ন। শব্দ, স্পর্শ, গন্ধময় জগতের ছায়া দিয়ে গড়া এক পুলকিত বিভোরতা শুধু।

ওঁদের আচ্ছন্ন অনুভূতিতে সব জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। যা কিছু মনে আছে আবছা। ওঁদের চেতনা দেহের আধার ছেড়ে কটা দিন যেন পলিনেশিয়ার আবেশের নরম বিছানায় পরম আলস্যে আশ্রয় নিয়েছিল।

মনে পড়ে ওঁরা নৌকো থেকে নামবার পর পলিনেশিয়ার সেইসব অক্ষুণ্ণযৌবনা সুরসুন্দরীরা তাঁদের সকলকে ঘিরে ধরেছিল। সুললিত বাহুর নির্মল আলিঙ্গনে পথশ্রম দূর করবার চেষ্টা করেছিল। গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল মালা। অজস্র ফুল ছড়িয়ে দিয়েছিল মাথায়। নিবিড় বন্ধুত্বের অক্ষয় বাঁধনে বেঁধে ফেলেছিল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

আর মনে আছে হাসির কথা। মনে আছে গানের কথা। হাসি আর গানের এমন অজস্র ফসল পলিনেশিয়া ছাড়া আর কোথাও এত অনায়াসে জন্মায় না। অন্তত এরিকের চোখে তো পড়েনি।

২৮

গোটা গ্রাম উত্তেজনায় চঞ্চল। উৎসবে মেতে উঠল রারোইয়ার প্রতিটি কুটির।

সমারোহ করে ওঁদের নিয়ে যাওয়া হল গ্রামের সামাজিক কুটিরে। বিরাট ভোজের আয়োজন হল। পুরোহিত এলেন। পলিনেশিয়ার প্রথামত ওঁদের ছ-জনের নতুন নামকরণ হবে।

পুরোহিত টুপুহোয়ে ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু হল। সমস্বর সঙ্গীত। গানের সুরটা, এরিকের মনে হল, একটা সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওদের জড়িয়ে ধরছে। ভাষাটার এক বর্ণও মগজে ঢুকল না। থর তার মানে করলেন :

স্বাগতম্, স্বাগতম্, সুস্বাগতম্ হে টেরাই মাটিয়াটা,
তোমার বীর সঙ্গীদেরও স্বাগতম্ জানাই।
রারোইয়ার চারধারে সমুদ্রের বেড়া হাজার যোজন,
ঝড়ের হুঙ্কার আর ঢেউয়ের দাপট
ভ্রূক্ষেপ করনি কেউ,
অক্লেশে সাঁতার কেটে তোমাদের পায়ে-পায়ে
দুর্জন সমুদ্র পার করে
বারোইয়ার স্নেহের মাটিতে
এনে দিল তোমাদের।
শুভদিন, কী শুভদিন।
এসো এসো, থাকো থাকো,
বহুকাল,
বহু বহুদিন,
রারোইয়ার স্নেহের ছায়ায়
স্বাগতম্, স্বাগতম্।

সারারাত ধরে উৎসব চলল। খানাপিনা। গান। তারপর শুরু হল নাচ। হুলা-হুলা নাচ। একের পর এক মদির নর্তকী উঠে এলো, (উর্বশী, মেনকা, রম্ভারা সব) বাকী সবাই গোল হয়ে ঘিরে বসল। বাদ্যকর বন্য এক তাল তুলল বাদ্যে। বাতাস উতরোল হয়ে উঠল গভীর রাতের উন্মাদনায়। সমস্ত পরিবেশ তীব্র এক পুলকের রেশে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

নর্তকীদের দেহ তীব্র বেগে নাচের তালে তালে তরঙ্গিত হতে থাকল। তারপর, এরিক দেখলেন, এক তরুণী নর্তকী বিদ্যুদ্বেগে নাচতে নাচতে হারমানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারপর যেন ছোঁ মেরেই তাঁকে তুলে নিল। হতভম্ব হারমান কিছু বোঝবার আগেই দেখলেন হুলা নাচের তীব্র আবর্তে তিনি চর্কির মত পাক খাচ্ছেন।

আর তাঁকে পাক খাওয়াচ্ছে যৌবন মদে মত্তা এক পলিনেশিয় তরুণী। সবাই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। বাজনা আরও উত্তেজনার সৃষ্টি করল। হারমান, কখনো সেই নর্তকীর সুবাসিত দেহের ঘ্রাণে, কখনো তার পরিপূর্ণ ওষ্ঠের স্পর্শে, উদ্দাম হয়ে নাচতে লাগলেন।

তার পর এরিক দেখলেন, একটির পর একটি বিদ্যুৎলতা ছুটে এল, ছোঁ মারল, তুলে নিল থরকে, বেঙ্গ্‌টকে, ক্নুটকে, টর্স্টেনকে আর, হ্যাঁ, তাঁকেও।

এরিকের বাতগ্রস্ত শরীর মড়মড় করতে লাগল, প্রচণ্ড বেদনায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠল কিন্তু নিস্তার পেলেন না তিনি। গোদা বাঁদরের মত থপথপ করে বেতালা লাফ দিতে লাগলেন। যেন সার্কাসের এক পুরান ক্লাউন। হাসতে হাসতে দর্শকরা সব গড়িয়ে পড়ল।

পরদিন এরিক ঘুম ভেঙেই টের পেলেন একটা মেয়ে তড়বড় করে কথা কইছে থরের সঙ্গে।

থর বললেন, ওর ছেলের মরণাপন্ন অসুখ। চিকিৎসার জন্য ডাকতে এসেছে। চল যাই।

সবাই মিলে গেলেন মেয়েটির বাড়িতে। দেখলেন, বছর ছয়েক বয়েসের একটি ছেলে জ্বরের ঘোরে ধুঁকছে। থার্মোমিটার দেওয়া হল। তাপ উঠল ১০৬°। ওঁরা দেখলেন, বিষাক্ত ফোঁড়ায় ছেয়ে গেছে ছেলেটির সর্বাঙ্গ। এবং জ্বরও হয়েছে এই ফোঁড়ার তাড়সেই।

কৃনুট বললেন, পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন্ দিলে বোধ হয় এ রোগ সারে। পেনিসিলিন সঙ্গেও আছে কিছু। কিন্তু তার মাত্রা তো জানিনে। না জেনে এসব ওষুধ ব্যবহার করলে হিতে যদি বিপরীত হয়ে যায়।

টর্স্টিন বললেন, আরে তার জন্যে কি, দাঁড়াও বন্ধুদের ডেকে বলি, ওরা একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে, মাত্রাটা জেনে দিক।

টর্স্টিন ছুটলেন তাঁর যন্ত্রের কাছে। বেতাবে যোগাযোগ করে পেনিসিলিনের মাত্রা জেনে নিলেন। দেওয়া হল ইন্‌জেক্‌শন। ছেলেটি বেঁচে উঠল। রারোইয়া যেন বুকে জড়িয়ে ধরল ওঁদের। আবার ফুর্তি জমে উঠল। আমোদ চলল ওঁদের ঘিরে।

তারপর একদিন বিদায়ের পালাও ঘনিয়ে এল ' ফরাসী সরকার তাহিতি থেকে জাহাজ পাঠিয়েছেন ওঁদের নিয়ে যেতে।

এই বিদায়ের দৃশ্যটির কথা যখনই মনে পড়ে এর্ম্নিকের তখনই তাঁর মন বেদনার শিনিশিনে অনুভূতিতে ভরে ওঠে।

চোখ বুঁজলে এখনও দৃশ্যটা দেখতে পান স্পষ্ট করে। রারোইয়ার সব লোক ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে। চোখের পাতাগুলো জলে ভারী।

নৌকো তৈরী। এই নৌকো তাঁদের জাহাজে তুলে দিয়ে আসবে। নৌকো ছাড়তেই পিছনের ভিড়ে করুণ কান্নার মত এক গান ভেসে উঠল। "যেখানেই যাও, এই স্মৃতিও সেখানে ভেসে

যাবে। তুমি থাকবে আমাদেরই মধ্যে। থাকবে চিরকাল। তাই বিদায় বলব না বন্ধু। বলব, ফিরে এসো। বলব, স্বাগতম্।"

এরিক দেখলেন, রারোইয়ার তীর এর মধ্যেই কতদূরে সরে গেছে। কিন্তু স্মৃতি আছে কাছে কাছে।

এরিক দেখলেন থর, হারমান, বেঙ্গ্‌ট্‌ এক দৃষ্টিতে রারোইয়ার দিকে চেয়ে আছেন। এরিকও চাইলেন। হাত নেড়ে অভ্যস্ত কায়দায় বলতে গেলেন, বিদায়, রারোইয়া, বিদায়।

অমনি বাতাস উঠল। তীর থেকে ভেসে এল একটানা গানের রেশটা। মানেটা মনে পড়ে গেল এরিকের, "তাই বিদায় বলি না বন্ধু, বলি এসো, আবার ফিরে এসো।"

আইয়া-ওরা-না।

